মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[তৃতীয় খণ্ড]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[তৃতীয় খণ্ড]

মূল

মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা | জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২ | ০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫ | ০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

[তৃতীয় খণ্ড]

মূল : মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ : মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

প্রকাশক : মাওলানা মুফতী ইসহাক
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২

পরিবেশক : অন্যরকম প্রকাশনী
রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ

মূল্য : ৬৬০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সমাজবিজ্ঞানের প্রবর্তক ইবনে খালদুন রহ. এর রফয়ে
দারাজাত কামনায়, ঐতিহাসিক তথ্যের পেছনে যিনি
তত্ত্ব খুঁজে ফিরতেন, মানবজাতিকে যিনি জগদ্বিখ্যাত
'আলমুকাদ্দিমা' উপহার দিয়েছেন।
স্বপ্ন দেখি—এ বঙ্গে একদিন খালদুনি মননশীলতার
উন্মেষ ঘটবে...

—অনুবাদক

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস হলো জাতির দর্পণ। এতে যেমন আলোচ্যজাতির পদরেখা ভেসে ওঠে তেমনই তাদের ভবিষ্যৎ-পথনির্দেশও দৃশ্যমান হয়। এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সময়ের ঝড়ে পিছিয়ে পড়া কোনো জাতি অগ্রসর হতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হবে। নির্মোহ দৃষ্টিতে তা পর্যালোচনা করতে হবে। যুগ ও সময়কে সামনে রেখে বিয়োগ ও ভাগের ঘরে উপযুক্ত ফল বসাতে হবে। সবশেষে এর তিক্ত পাঠককে বাস্তব-জীবনে চর্চার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাহলে একসময় হয়তো সেই জাতির ভাগ্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগবে।

ইতিহাসের এই নীতি ধর্মকর্ম ও রীতি-সংস্কৃতি নির্বিশেষ সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য। মুসলিমজাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অন্য যেকোনো জাতির তুলনায় ঢের বেশি। কেননা অন্য কোনো জাতি উঠে দাঁড়ালে এর ফায়দা ও উপকারিতা সেই জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও ঘুরে দাঁড়ানোটা কেবল মুসলিমদের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বের তাবৎ-জাতিগোষ্ঠীর জন্যই ফায়দাবহ ও কল্যাণপ্রসূ হবে।

তাই সময়ের ঝড়ে পিছিয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ইতিহাসচর্চার পথে এগিয়ে আসতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের বহু ধারা-উপধারা রয়েছে, রয়েছে এর বহু যুগ ও কাল, আর প্রতিটি যুগ ও কালই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারক; তাই ইতিহাসের সচেতন পাঠকের মাথায় বেশ গুরুত্বের সাথে একটি প্রশ্ন দোলা খায় যে, জাগরণ ও উত্থানের বিবেচনায় ইতিহাসের কোন যুগ ও ধারাটি

অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে? যদি আমরা ইতিহাস থেকে উত্থানের সূত্র খুঁজে পেতে চেষ্টা করি, তাহলে কোন যুগের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

স্বল্প অধ্যয়নের আলোকে আমি মনে করি, এ প্রশ্নের সরল উত্তর হলো, খেলাফতে রাশেদার সোনালিযুগের ইতিহাস সর্বাধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। আর কেনই-বা তা গুরুত্বপূর্ণ হবে না? তা তো ছিল 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, প্রতিটি কদমে; বরং অক্ষরে অক্ষরে যা নববি আদর্শ ও চেতনার ধারক ছিলো। আর আমরা তো এ মহান ব্যবস্থার আলোকেই খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। আরেকটু খোলাসা করে বললে, এ সোনালি যুগের ইতিহাসেই আমরা কুরআন ও সুন্নাহর রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, বিশেষত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও চেতনার প্রায়োগিক রূপ পরিলক্ষ করি।

তাই উম্মাহর উত্থানের স্বপ্নচাষী ইতিহাসপাঠকের সমীপে আমার নিবেদন থাকবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যধন্য উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদের হাতে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে রাশেদার ইতিহাস গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে অধ্যয়ন করা। লক্ষ রাখা যে, সংকটকালে ও বিজয়ক্ষণে তাদের কর্মপন্থা কী ছিল? তারা রুখসতের পথ অবলম্বন করেছেন নাকি আযিমতের? তারা কোন ক্ষেত্রে কতটুকু ছাড় দিয়েছেন এবং তা কেন? এ ছাড়া আরও কিছু সমীকরণ সামনে রেখে খেলাফতে রাশেদার সোনালি যুগ অধ্যয়ন করলে তা কেবল আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতই করবে না; পাশাপাশি আমাদের মধ্যে এক ভিন্ন চেতনা সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ।

এক্ষণে বই নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। আমি মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহর কেবল খেলাফতে রাশেদা অংশটুকুর অনুবাদ করেছি। একজন অনুবাদক নয়; বরং একজন পাঠক হিসেবে বলতে চাই, খেলাফতে রাশেদার উপর এ যাবৎকালে এতো তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ, এমন গোছালো ও চমৎকার আলোচনাসমৃদ্ধ দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ আমার নজরে

পড়েনি। ইতিহাসবিদ হিসেবে ইসমাইল রেহানের ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছে। তার আলোচনায় যেমন নির্ভুল তথ্যের সমাহার রয়েছে তেমনি রয়েছে সুদৃঢ় তত্ত্বের মিশেল। ফলে তার রচনা সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি চিন্তাশীল বোদ্ধামহলকেও আন্দোলিত করবে বলে আমি আশাবাদী।

ইসমাইল রেহান কেবল ঘটনার পর ঘটনাই বর্ণনা করে ক্ষান্ত হন না; বরং তৈরি করেন আলাদা এক বয়ান। এর মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের এমন বহু অধ্যায় থেকেও ধূলির আস্তরণ সরাবার প্রয়াস চালান, সহস্র বছরেও যেখানে কারো পদচারণা ঘটেনি। এতে যেমন ইতিহাসের এক নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হয় তেমনি প্রচলিত বহু ভুল অধ্যায়েরও নিরসন ঘটে। আর এটাকেই মাওলানা রেহানের বড় বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে।

এই অনবদ্য গ্রন্থের অনুবাদের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত; বরং গর্বিত। আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের এই খেদমতটুকু কবুল করে নেন এবং লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে নেন। আমিন।

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
কেরানিগঞ্জ, ঢাকা
২৫ জুমাদাল উখরা, ১৪৪২

'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'র স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান 'আল মানহাল পাবলিশার্স'-এর পক্ষ থেকে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ প্রকাশের

অনুমতিপত্র

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Juhar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

Ref: AMP-107

Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلادیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

Al Manhal Publisher
Block 1-A, Gulistan-e-Johar, Karachi
021-34612901 | 0321-3135009

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز کراچی

উমর ফারুক রা. এর খেলাফতকাল

উসমান বিন আফফান রা. এর খেলাফতকাল

খেলাফতে রাশেদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

নববি ও খেলাফতে রাশেদা-যুগের মহান ব্যক্তিবর্গ

খেলাফতে রাশেদা : উত্থান ও বিজয়কাল

১১-৩৪ হিজরি, ৬৩২-৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

خودکشی شیوہ تمہارا، وہ غیور و خوددار

تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار

আজ আত্মবলি বৈশিষ্ট্য তোমাদের, তারা ছিলেন আত্মমর্যাদাবান ও আত্মাভিমানী, তোমরা ভাতৃত্ব থেকে ছুটে পালাও, আর তারা ছিলেন ভাতৃত্বের জন্য জীবনদানী

تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار

تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بہ کنار

তোমরা তো আপাদমস্তক বাচাল, তারা ছিলেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত কর্মঠ, যেন তোমরা মরছ কলির জন্য, তারা ছিলেন নিজেরই নীরব ফুলবাগান।

اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی

نقش ہے صفحۂ ہستی پہ صداقت ان کی

পৃথিবীর বহু জাতি আজো স্মরণ রেখেছে তাদের গল্প, যাদের সততার চিহ্ন অঙ্কিত আছে আজো পৃথিবীর বুকে

আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতকাল

রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরি-জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি

৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

খেলাফতে রাশেদা দ্বারা কী উদ্দেশ্য

খেলাফতে রাশেদা দ্বারা সেই মহান শাসনকাল উদ্দেশ্য, যা হজরত আবু বকর রা. এর খেলাফতের মসনদে আরোহণ থেকে নিয়ে আলি রা. এর খেলাফতকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। হজরত হাসান বিন আলি রা. এর ছয় মাসের শাসনকালকে আলি রা. এর খেলাফতের পরিশিষ্ট ধরা হয়ে থাকে। এ হিসেবে খেলাফতে রাশেদার সময়কাল ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল থেকে নিয়ে ৪১ হিজরির রবিউল আওয়াল পর্যন্ত মোট ৩০ বছর পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময়ের শাসনকালকেই খেলাফতে রাশেদা বলা হয়।

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الخلافةُ في أمّتي ثلاثونَ سنةً، ثمّ ملكًا بعدَ ذلكَ

> আমার পর ৩০ বছর পর্যন্ত খেলাফত থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।[১]

মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের আকিদা এটাই যে, এই ৩০ বছরই হলো খেলাফতে রাশেদা। আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে—'আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর সিদ্দিক রা. কে উম্মতের সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করি। সর্বপ্রথম তিনি খেলাফত লাভ করেন। তারপর যথাক্রমে উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলি বিন আবু তালিব খেলাফত লাভ করেন। আমরা তাদেরকে খলিফা মান্য করে থাকি। তারাই হলেন খোলাফায়ে রাশেদিন এবং হেদায়েতের ইমাম।'[২]

এ শাসনকালকে খেলাফতে রাশেদা বলার কারণ হলো, এই সময়ে নববি-পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এই সময়ে মুসলিম উম্মাহর পরিচালনাভার সেসব

---

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২২২৬। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

[২] আল আকিদা আত-তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা ৮১

মহান সাহাবির হাতে ছিল, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সঙ্গ-সংশ্রব লাভ করেছিলেন। তারা এমন এক সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন যখন ইসলাম কবুলের কারণে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর কোরবানি এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তারা ইসলামের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রতি কদমে নিজেদের জীবন কোরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন। ইসলামের ভিত্তি তৈরি, তার প্রচারপ্রসার এবং তা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাদের প্রধান ভূমিকা ও অবদান ছিল।

উল্লিখিত চার মনীষী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় এবং সকল সাহাবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণেই নববি জবান থেকে তাদের নির্দেশাবলি অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> عليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ بعدي، عضُّوا عليها بالنَّواجذِ
>
> তোমরা আমার এবং আমার পরবর্তী হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে থাকবে।[৩]

এই কারণেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এই অধ্যায়কে অন্যসব অধ্যায় ও কাল থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালেও বহু ন্যায়পরায়ণ খলিফা এবং নেককার বাদশাহর আগমন ঘটেছে।

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তার কিতাব 'ইযালাতুল খফা'য় খেলাফতে রাশেদার ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং চমৎকার আলোচনা করেছেন। এর সারাংশ আমি সর্ববোধগম্য ভাষায় নিচে তুলে ধরলাম।

---

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৬০৭; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৬৭৬।
ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। আলবানি একে সহিহ বলেছেন।

১. একজন খলিফায়ে রাশেদের মধ্যে খেলাফতের অন্যান্য শর্তের পাশাপাশি আরেকটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। তা হলো, আচার, বৈশিষ্ট্য এবং কাজকর্মের দিক দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিশেষ মিল ও সামঞ্জস্য থাকবে। অর্থাৎ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির এক নমুনা এবং প্রতিবিম্ব হবেন। শুধু গুটিকয়েক গুণের ক্ষেত্রে মিল থাকাটা যথেষ্ট নয়। কেননা কিছু না কিছু মিল তো সকল মুসলমানের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা। পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য কেবল সেই সকল মহান ব্যক্তির অর্জিত হয়ে থাকে, যারা উম্মাহর সবচেয়ে উঁচু আসনে সমাসীন হয়ে থাকেন। মাঝামাঝি কিংবা নিম্নস্তরে অবস্থানকারীদের এই পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য অর্জিত হয় না।

২. নবীর খলিফা নবী বা রাসুল হন না; বরং তারা নবীর গুণাবলির নমুনা হয়ে থাকেন। অতএব খলিফায়ে রাশেদ হলেন তারা, যারা জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মপন্থায় নবীগণের বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মকাণ্ডের অনুরূপ হয়ে থাকেন। নবীগণ যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গতা এসব খলিফার হাতেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ নবী-রাসুলগণ যেই কাজ শুরু করেছেন, আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে নবীগণের বিশেষ বিশেষ খলিফার হাতেই সেই কাজ পূর্ণতা পেয়ে থাকে। তাই যে খলিফা নবীদের অবশিষ্ট বিষয়কে ইলমি এবং আমলি দিক থেকে পূর্ণতায় পৌছান, তারাই তার বিশেষ খলিফা এবং খলিফায়ে রাশেদ।

৩. কুরআন মাজিদের তালিম ও হেকমত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই পূর্ণতা পেয়েছে। তবু কিছু বিষয় অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, এগুলো খোলাফায়ে রাশেদিনের হাতে পূর্ণতা পাবে।

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. উপরোক্ত বিষয়ের নিম্নোক্ত উদাহরণ পেশ করেছেন।

- আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে কুরআন মাজিদ মুসহাফ আকারে একত্র করা।
- বিধান সংক্রান্ত হাদিসের তাহকিক এবং তার প্রচারপ্রসার।

- হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রতি গুরুত্বারোপ।
- মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল পরামর্শ এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করার মাধ্যমে ইজমার ভিত্তি স্থাপন।
- যেসব বিষয়ে কুরআন মাজিদের এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি, সেক্ষেত্রে ইজতিহাদের পদ্ধতি চালু করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিজয়-অভিযানের সুসংবাদ দিয়েছেন, কার্যত তার পূর্ণতা দান।

৪. অন্তর ও মস্তিষ্কের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক যেমন নিবিড়, নবী-রাসুলদের সাথে খলিফায়ে রাশেদের সম্পর্ক তেমন গভীর। যেমনভাবে অন্তর ও মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ এসে থাকে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে, তেমনিভাবে নবীগণের অনুসরণের ক্ষেত্রে খেলাফতে রাশেদার বিষয়টি তেমনই। নবুওয়াত এবং খেলাফতে রাশেদার মধ্যে শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে নবী নিজ জবানের মাধ্যমে নির্দেশ দিতেন; কিন্তু এখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদিন নবুওয়াতের প্রকৃতি ও চাহিদা বুঝে নবীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই কারণে খোলাফায়ে রাশেদিনের কাজকর্ম ও বক্তব্য শরিয়তের দলিল হওয়ার ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করে থাকে। যারা এসব মহান খলিফার মর্যাদা খাটো করে, সেটা তাদের বুঝের ত্রুটি।[৪]

---

[৪] বিস্তারিত জানতে 'ইযালাতুল খফা' দ্রষ্টব্য।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরপরই মুসলিম উম্মাহ তাকে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত তাকে খলিফা বানানোর পক্ষে থাকা সত্ত্বেও শুরা-ব্যবস্থার পূর্ণতাদানের জন্য সাবধানতাবশত তিনি তিনদিন খেলাফতের মসনদ থেকে দূরে ছিলেন। প্রতিদিন তিনি ঘোষণা করতেন, 'আমি তোমাদের বাইয়াত মাফ করে দিয়েছি। তোমরা যাকে চাও তার হাতে বাইয়াত হয়ে যাও।'

প্রতিবার হজরত আলি রা. দাঁড়িয়ে বলতেন, আমরা না বাইয়াত ভঙ্গ করব আর না আপনাকে নিষ্কৃতি দেব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমন কে আছে যে আপনাকে পেছনে রাখবে?[৫]

এর মাধ্যমে একদিকে হজরত আবু বকর রা. এর সতর্কতার বিষয়টি বুঝে আসে। তিনি মুসলমানদের সন্তুষ্টি এবং আগ্রহ ব্যতীত তাদের শাসনকার্য পরিচালনার কল্পনাই করতে পারছিলেন না। অপরদিকে হজরত আলি রা. এর ইখলাস এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ভালোবাসার বিষয়টি বুঝে আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে ইমাম বানিয়েছেন, তিনি তার মর্যাদা-স্বল্পতার চিন্তাই করতে পারছিলেন না।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত আবু বকর রা. এর মূল নাম আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। আবু বকর তার উপনাম। পিতার নাম উসমান বিন আমের। তবে তিনি আবু কুহাফা উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মায়ের নাম সালমা বিনতে সাখর। কিন্তু তিনিও আপন উপনাম উম্মুল খায়ের বলে পরিচিত ছিলেন।

---

[৫] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কৃত ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃষ্ঠা ১০২

তার বংশীয় সম্পর্ক কুরাইশের শাখা তামিমের সঙ্গে ছিল। বংশধারা হলো আবদুল্লাহ বিন আবু কুহাফা উসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন মুররা বিন কাব বিন লুয়াই। মুররার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বংশধারা মিলে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুররার ছেলে কিলাবের বংশধর আর আবু বকর রা. মুররার অপর ছেলে তাইমের বংশধর।[৬]

তিনি চারটি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়ে হয়েছিল কুতাইলা বিনতে আবদুল উযযার সাথে। এই ঘরে আবদুল্লাহ এবং আসমা রা. জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল উম্মে রুমান-এর সঙ্গে। এই ঘরে আবদুর রহমান এবং আয়েশা রা. জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় বিয়ে হয়েছে আসমা বিনতে উমাইস রা. এর সাথে। তিনি একসময় হজরত জাফর বিন আবু তালিব রা. এর স্ত্রী ছিলেন। এই ঘর থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ বিয়ে হয়েছে হাবিবা বিনতে খারিজা রা. এর সঙ্গে।

প্রথম দুটি বিয়ে ইসলামের পূর্বে এবং শেষ দুটি বিয়ে ইসলামগ্রহণের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৭]

তিনি ছোট থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী ছিলেন। মক্কানগরীর সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এর ফলে তার সাথে বহু মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ কারণেই আরবদের বংশধারা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে তার অনেক জানাশোনা ছিল। তিনি জাহেলিযুগে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। এর ফলে যৌবনকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল। তার এ বিস্তৃত জ্ঞান এবং বহু মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল।

পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দীনের

---

[৬] আল ইসাবা, ৪/১৪৪, ১৪৫

[৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/২৬৩; ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

খেদমতে নিজেকে ওয়াকফ করে দেন। অন্যান্য সাহাবির তুলনায় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক নৈকট্যভাজন ছিলেন। ইসলামগ্রহণের কারণে যাদের উপর অত্যন্ত দুর্বিসহ নির্যাতন করা হতো, তিনি এমন সতের ব্যক্তিকে কাফেরদের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ক্রয় করে আজাদ করেন।[৮]

হিজরতের নাজুকতম সময়ে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। সাওরপর্বতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারায় ছিলেন। বদরযুদ্ধে রিসালাতের আলোকবর্তিকা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহরক্ষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আপন কলিজার টুকরা হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. কে রিসালাতের সূর্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। সকল যুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খেলাফতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন,

اقتدوابالّذين من بعدي أبي بكرٍ وعمرَ

তোমরা আমার পর আবু বকর এবং উমরের অনুসরণ করবে।[৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষদিনগুলোতে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে আপন স্থানে ইমামতি করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, যা কার্যত এক নির্দেশনা ছিল যে, নবীর অনুপস্থিতিতে মুসলমানদেরকে আবু বকর রা. এর অনুসরণ করা উচিত।

কষ্ট-মুসিবত

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ষাট বছর বয়সে খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এসময় তিনি নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণ করেন। তিনি তাকে খলিফাতুল্লাহ বলে সম্বোধন করাটা পছন্দ করতেন না বরং খলিফাতুর রাসুল উপাধিকে উপযুক্ত মনে করতেন।

---

[৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/২৬৪, ২৬৫

[৯] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৬২; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৬৯০২

খলিফা হওয়ার পরও তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দেননি। এমনকি মুসলমানদের ফান্ড বাইতুল-মাল থেকে একটিমাত্র দিরহাম গ্রহণ করতেও তিনি রাজি ছিলেন না।

খেলাফতের দায়িত্ব লাভের পর পূর্বের ন্যায় প্রতিদিন সকালে বাজারে যেতেন। কাপড় বেচাকেনা করতেন। জোহরের পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতেন।

একদিন হজরত উমর এবং হজরত আবু উবাইদা রা. তাকে কাঁধে করে বাজারে কাপড় নিয়ে যেতে দেখলে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি বলেন, বাজারে যাচ্ছি।

তারা জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে মুসলমানদের সার্বিক বিষয়ের জিম্মাদার বানানো হয়েছে। এ জিম্মাদারি সত্ত্বেও আপনি কীভাবে ব্যবসা করেন?

তিনি উত্তর দেন, অন্যথায় আমি আমার সন্তানদের দেখভাল করব কীভাবে?

তারা উভয়ে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। এরপর তারা বাইতুল-মাল থেকে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ নেওয়ার জন্য হজরত আবু বকর রা. কে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, যাতে তিনি পূর্ণ সময় মুসলমানদের বিষয়াদি দেখাশোনার পেছনে ব্যয় করতে পারেন এজন্য তারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১০]

তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলামি শরিয়ত এবং খোদায়ি বিধান যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল ঠিক সেভাবে তা বাকি রাখা। শরিয়তের উৎসধারা কুরআন মাজিদ তার সামনে ছিল। কুরআনের ব্যাখ্যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এবং সুন্নাত তার নিকট বিদ্যমান ছিল। তিনি গোটা উম্মতকে কদমে কদমে এই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করতে প্রয়াসী ছিলেন।

---

[১০] জাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম, ৩/১১৩

নবীজির মিরাস... একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আবু বকর রা. এর দৃঢ়তা

ব্যক্তিগত রুচি ও চাহিদার উপর শরিয়তকে প্রাধান্য দেওয়া এক কঠিন পরীক্ষা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাসের প্রশ্নে হজরত আবু বকর রা. এ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মধ্যে শুধু ফাতেমা রা. জীবিত ছিলেন। স্বভাবগত জায়গা থেকে তার মাথায় চিন্তা আসে যে, পিতার সম্পত্তিতে যেহেতু সন্তানের অংশ সাব্যস্ত হয়ে থাকে; তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাসে আমার অধিকার থাকবে। এটি শুধু তার একক চিন্তা ছিল না; বরং অধিকাংশ উম্মুল মুমিনিন এই আশা পোষণ করতেন। গোটা জীবনের ন্যায় মৃত্যুর সময়ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোনো দিনার-দিরহাম বা সামানপত্র ছিল না। তবে তার পরিবারের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য তিন ধরনের সম্পদ ছিল।

১. মদিনার ইহুদিগোষ্ঠী বনু নাজিরের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত মালে-ফাইয়ের উৎপাদিত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ।[১১]

২. খাইবারের জিহাদ থেকে অর্জিত গনিমতের অংশ।

৩. খাইবারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ফাদাকের বাগানের উৎপন্ন ফসল।

খাইবারের গনিমত এবং ফাদাকের উৎপাদিত ফসলের অংশগুলো জিহাদে অংশগ্রহণকারী ১৪০০ সাহাবির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তার থেকে একটি অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লাভ করেন। জীবিকানির্বাহের এ তিন খাত থেকে অর্জিত অধিকাংশ সম্পদই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রয়োজনে ব্যয়

---

[১১] মালে ফাই (বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ)। ইমামুল মুসলিমিন তার এক-পঞ্চমাংশ যেখানে ভালো মনে করেন সেখানে খরচ করতে পারেন। রাসুল সা. যেখানে ভালো মনে করতেন সেখানেই তা ব্যয় করতেন।

'আল ফিকহুল মুয়াসসার' কিতাবে ১০৭ পৃষ্ঠা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা এমন সম্পদ, মুসলমানরা যা যুদ্ধ ব্যতীত অর্জন করে থাকে। যেমন, মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে কাফেররা নিজেদের সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। কাজি, মুয়াজ্জিন, ইমাম, ফকিহ, শিক্ষক প্রভৃতি খাতে ইমামুল মুসলিমিন এ সম্পদ খরচ করতে পারেন।

করতেন। সামান্য কিছু অংশ তিনি নিজ পরিবার-পরিজনের পেছনে খরচ করতেন।

হজরত ফাতেমা রা. এবং উম্মাহাতুল মুমিনিন এই সকল উপার্জন-মাধ্যমকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে করে আশা করেন যে, এগুলোর একটি অংশের মালিকানা তারা পাবেন। কিন্তু শরিয়তের মাসআলা কিছুটা ভিন্ন ছিল। বনু নাজির থেকে যেই জমিন অর্জিত হয়েছিল, সেটা মালে-ফাই ছিল, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না; বরং তিনি তার দেখাশোনা করতেন মাত্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর এই জমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুসলমানদের খলিফার দায়িত্বে চলে আসে। তিনি প্রয়োজন মনে করলে এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের পিছনে খরচ করতে পারেন। কিন্তু এটাকে কারও মালিকানায় দিয়ে দিতে পারেন না।

আর খাইবার ও ফাদাক যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল; কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন,

إنّا معشَرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركناهُ فهو صدَقَةٌ

> আমাদের নবীগণের জামাতের কেউ ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হয়ে যায়।[১২]

অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগের নবীদের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য ছিল যে, তারা যদি পার্থিব কোনো বস্তু রেখে যেতেন তা হলে মৃত্যুর পর সেগুলো তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতো না; বরং এটা সদকা খাতে খরচ করা হতো।

এ বিধানের পেছনে আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ হেকমত ছিল। তা হলো, যাতে করে নবীদের বিরোধীরা এটা বলতে না পারে যে, পরিবার-পরিজনকে অঢেল অর্থ-বিত্তের মালিক বানানোর জন্য নবুওয়াত এক মোক্ষম উপায়। কিন্তু হজরত ফাতেমা এবং অধিকাংশ উম্মুল মুমিনিন হয়তো শরিয়তের এ বিধান সম্পর্কে জানতেন না কিংবা এ আবেদনের পেছনে তাদের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু এটি একটি

---

[১২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭৬৭

ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেনের বিষয় ছিল, মুসলিম উম্মাহ সর্বপ্রথম যার সম্মুখীন হয়েছে, এই কারণে আবু বকর রা. এর মতো বড় বড় ব্যক্তিরই এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তেমনিভাবে অধিকাংশ উম্মুল মুমিনিনের এ বিষয়ে জ্ঞান না রাখা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিংবা এ সংক্রান্ত হাদিস শোনার পর তা ভুলে যাওয়া কিংবা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তার সঠিক উদ্দেশ্য না বুঝাটা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। মোটকথা, হজরত আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিষয়টি সমাধান করেন। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পদ যেভাবে খরচ করতেন, আল্লাহর শপথ, আমি সেই পদ্ধতি কখনোই ত্যাগ করব না।[১৩]

তাই তিনি খাইবারের সম্পদ এবং ফাদাকের বাগানকে মিরাস হিসেবে আহলে বাইতের মধ্যে বণ্টন করার পরিবর্তে মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণ এবং সফলতার জন্য ওয়াকফ করে দেন। অর্থাৎ তিনি সদকার সবচেয়ে উত্তম খাত সদকায়ে জারিয়াতে তা রূপান্তর করেন। অবশ্য তিনি এক্ষেত্রে আহলে বাইতকে সম্পূর্ণরূপে সহায়-সম্বলহীন করে দেননি; বরং তিনি বলেছেন আমার নিকটাত্মীয়ের তুলনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় আমার অধিক প্রিয়।[১৪]

তিনি যেহেতু ওই সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে দায়িত্ববান ছিলেন এজন্য এটা কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় না দিয়ে এর মাধ্যমে আহলে বাইতের খরচের ধারা অব্যাহত রাখেন। এতে আহলে বাইত এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ নিহিত ছিল। কেননা যদি এটা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মালিকানায় চলে যেত তা হলে কিছুকাল পর তার আমদানি বন্ধ হয়ে যেতে পারত। পরবর্তীরা এ থেকে কিছুই পেতেন না। আর এখন সম্পত্তিকে সরকারি দেখাশোনায় নিয়ে আসায় দেখা যায় প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত আহলে বাইতের সদস্যগণ এই সম্পত্তি দ্বারা লাভবান হয়েছেন। এর ফলে তারা জীবিকার প্রশ্নে নিশ্চিন্ত থেকে জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করেন।[১৫]

---

[১৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭২৬
[১৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪০৩৫
[১৫] সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হাদিস : ১২৭৩৪

মোটকথা, সম্পত্তিগুলো যখন আহলে বাইতের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি তখন মাসআলা সম্পর্কে না জানার কারণে হজরত ফাতিমা এবং অধিকাংশ উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে আপত্তি তৈরি হয়। তারা হজরত উসমান বিন আফফান রা. কে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট পাঠান। এক্ষেত্রে কেবল উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা. রাসুলের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন, যিনি এ পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনদের স্মরণ করিয়ে দেন 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা বলেননি যে, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হয়ে যায়?[১৬]

উম্মাহাতুল মুমিনিন যখন এ মাসআলা সম্পর্কে অবগত হন তখন তারা নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করেন। কিন্তু হজরত ফাতেমা রা. এর খেয়াল ছিল তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির একজন হকদার।

সম্ভবত তার এই খেয়ালের কারণেই হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, নবীদের পরিত্যক্ত দিনার-দিরহাম, স্বর্ণ-রূপা প্রভৃতি স্থানান্তরযোগ্য জিনিসে উত্তরাধিকার বিধান প্রয়োগ হয় না। কেননা কিছু হাদিসে এসেছে,

لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا

আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দিনার-দিরহাম বণ্টিত হবে না।[১৭]

তার মতে খেত, ভূমি, বাগান প্রভৃতি স্থানান্তর-অযোগ্য জিনিসের ক্ষেত্রে নবীর ওয়ারিসদের মধ্যে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টিত না হওয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে না। এই কারণে তার আপত্তি বহাল ছিল। আত্মপ্রশান্তির জন্য তিনি একবার হজরত আব্বাস রা. সাথে হজরত আবু বকর রা. এর নিকট গমন করেন। খলিফা তাকে ওই হাদিসের কথা বলেন, যাতে বলা হয়েছে, নবীগণ যা রেখে যান তা সদকা হয়ে যায়।[১৮]

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরো নিজের জ্ঞানগত আগ্রহের কারণে প্রশ্ন করেন যে, আপনার সন্তান যদি আপনার

---

[১৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭৩০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৬৭৯

[১৭] সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৭৭৬

[১৮] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭২৬

ওয়ারিস হতে পারে তা হলে আমি কেন আমার পিতার ওয়ারিস হতে পারব না?

হজরত আবু বকর রা. বলেন, হে রাসুলের কলিজার টুকরো, আপনার সম্মানিত পিতা ঘরবাড়ি, গোলাম-বাঁদি, ধনসম্পদ স্বর্ণ-রূপা কিছুই রেখে যাননি।

ফাতেমা তখন জিজ্ঞেস করেন, ফাদাকের সেই জমিনের অবস্থা কী, আল্লাহ তায়ালা যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন?

সাফিয়া[১৯] কোথায় ব্যয় করা হবে, আল্লাহ তায়ালা যা আমাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, যার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আপনার হাতে?

খলিফাতুর রাসুল তখন বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنما هي طُعمةٌ أطعمَنيها اللهُ عزَّ وجلَّ فإذا متُّ كانت بين المُسلمينَ

> এটি এক লোকমা রিজিক মাত্র। আল্লাহ আমাকে যা ভক্ষণ করিয়েছেন, আমি চলে যাওয়ার পর এটি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ হয়ে যাবে।[২০]

হজরত ফাতেমা এই হাদিসের সামনে নীরব হয়ে যান। এরপর হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত উসমান রা. এর খেলাফতকালে উপরোক্ত নির্দেশনা এভাবেই বহাল ছিল।

হজরত উমর রা. এর খেলাফতকালে হজরত আলি এবং আব্বাস রা. এ বিষয়ে তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলোচনা করেন। কিন্তু হজরত উমরের দলিল-প্রমাণের সামনে তারা উভয়ে নীরব হয়ে যান।[২১]

হজরত আবু বকর রা. এর সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়া এবং বনু হাশেমের এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ এটাই যে, হজরত ফাতেমা রা. বা তার সন্তানদের কেউ এ ব্যাপারে আর কখনো দাবি জানাননি। হজরত আলি আপন খেলাফতকালে এই বিষয়টিকে পূর্বের

---

[১৯] বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ।
[২০] শারহু মাআনিল আসার, হাদিস : ৫৪৩৭
[২১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭২৮

মতোই বাকি রাখেন। তিনি ফাদাকের বাগানগুলো আহলে বাইতের মালিকানায় প্রদান করেননি। যদি প্রকৃতপক্ষে এটা বনি হাশেমের অধিকার হতো তা হলে হজরত আলি রা. তার খেলাফতকালে এটাকে তার হকদারদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত এবং ক্ষমতাবান ছিলেন। যদি হজরত আবু বকর রা. এর এই সিদ্ধান্ত জুলুম হয়ে থাকে তা হলে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজরত আলি রা. এর উপর এই জুলুম সমর্থনের আপত্তি চলে আসে। নাউজুবিল্লাহ, তারা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

অনেকেই এই মিথ্যা দাবি করে থাকে যে, হজরত আবু বকর রা. হজরত উমর রা. এর সাথে মিলে আহলে বাইতকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করেছেন; অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার আলোকে এই মিরাস বণ্টিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর কথা যে, শুধু হজরত ফাতেমা রা. কে এটা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল! অথচ প্রকৃতপক্ষে উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস লাভ করেননি। যদি হজরত আবু বকর এবং উমর মিরাস বণ্টন করতেন তা হলে এতে উলটো তাদের লাভ ছিল। কেননা তাদের মেয়ে হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত হাফসা রা. এখান থেকে একটি অংশ লাভ করতেন। কিন্তু তারা সবধরনের স্বার্থের কথা বাদ দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছেন।

আবু বকর রা. এর প্রতি ফাতেমা রা. এর অসন্তোষের বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা

কিছু সহিহ রেওয়ায়েতের বাহ্যিক শব্দাবলির দ্বারা সন্দেহ হয় যে, আবু বকর রা. এর ফয়সালার কারণে হজরত ফাতেমা রা. এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, তিনি এরপর আবু বকর রা. এর সাথে আর কথাই বলেননি। অথচ;

১. এইসব বর্ণনার একেবারে স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হলো যে, তিনি মিরাসের ব্যাপারে তার সাথে আর আলোচনা করেননি।

২. যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হজরত ফাতেমা রা. আসলেই আন্তরিকভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন তা হলে এতে হজরত আবু বকর রা. এবং ফাতেমা রা. এর উপর কোনো ধরনের আপত্তির সুযোগ নেই। কেননা সবশেষে তো তারা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। এটাই স্বাভাবিক বিষয় যে, কেউ যদি কোনো জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়, কিন্তু পরবর্তীতে সে জানতে পারে যে, নিয়মকানুনের ভিত্তিতে এটি তার প্রাপ্য অধিকার নয়, তা হলে অন্তরে একধরনের অসন্তোষ তৈরি হয়ে থাকে।

৩. হতে পারে হজরত ফাতেমা রা. এটা মনে করেছিলেন যে, আবু বকর রা. খলিফা এবং রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার কারণে চাইলে ফাদাককে তার নামে বরাদ্দ করার অধিকার রাখতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর এই অধিকার ছিল না। শরিয়ত যেহেতু বিষয়টি অনুমোদন দেয় না এই কারণে তিনি যা করেছেন সেটার ভিন্ন কিছু করার সুযোগ ছিল না। যদি মানব-স্বভাবের কারণে হজরত ফাতেমা রা. কিছুটা মনোঃকষ্টবোধ করে থাকেন তা হলে এটি অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এই কারণে তিনি আবু বকর রা. এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন- এমনটি কখনোই হতে পারে না।

৪. নীরবতা অবলম্বন করা এক বিষয় আর সালাম ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া ভিন্ন বিষয়। যদি আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সঙ্গে হজরত ফাতেমা রা. এর আগে থেকেই অধিক ওঠাবসা হতো; কিন্তু উক্ত ঘটনা সামনে আসার পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে সালাম-কালাম বন্ধ করার বিষয়টি সাব্যস্ত হতো। প্রকৃত বিষয় তো এটা যে, আবু বকর রা. তার জন্য গায়রে মাহরাম ছিলেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন না। তা হলে এখন তিনি কেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন?!

৫. হজরত আবু বকর রা. এর সঙ্গে ফাতেমা রা. এর সাক্ষাৎ না করার একটি কারণ এটাও ছিল যে, হজরত ফাতেমা রা. পিতার মৃত্যুর পর দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত গিয়েছিলেন। এরই মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ছয় মাস পরই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

অপরদিকে ওই সময় আবু বকর সিদ্দিক রা. ধর্মদ্রোহী এবং খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি পারস্য এবং শামের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এত ব্যস্ততার ফাঁকে তিনি কীভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বের করবেন?

আবু বকর রা. এর প্রতি হজরত ফাতেমার সন্তুষ্টির প্রমাণ

এটা প্রমাণিত যে, হজরত ফাতেমা রা. অসুস্থ হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য হজরত আবু বকর তার ঘরে গিয়েছিলেন। হজরত আবু বকর রা. এর আগমন এবং তার খোঁজখবর নেওয়ার সংবাদ শুনে হজরত ফাতেমা রা. সান্ত্বনা লাভ করেন। পরবর্তীতেও তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।[২২]

আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর উপর ফাতেমার আস্থা

এটাও প্রমাণিত যে, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর সাথে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হজরত ফাতেমা রা. এর ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি তার সঙ্গে একান্ত আলাপ-আলোচনা করতেন। একবার উম্মুল মুমিনিন জিজ্ঞেস করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে কানে কানে কী বলেছিলেন যে, তুমি এই কারণে প্রথমে কেঁদে ফেললে এরপর আবার হেসে দিলে?

তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রথমে তার মৃত্যুর সংবাদ শোনান। এই কারণে আমার কান্না আসে। এরপর আমাকে তিনি বলেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে মিলিত হবে। এই কারণে আমি আনন্দিত হই।[২৩]

আবু বকর রা. এর প্রতি যদি ফাতেমা রা. অসন্তুষ্ট থাকতেন তা হলে তিনি কেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তার ঘরে আসা এবং তার মেয়ের সাথে একান্তে আলাপ করা পছন্দ করতেন?

---

[২২] আল ইতিকাদ লিল বাইহাকি, পৃষ্ঠা ৩৫৩। এটি শা'বি থেকে সহিহ মুরসালসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৪৬৬

আবু বকর রা. এর প্রতি আলি রা. এর মহব্বত প্রকাশ

তেমনিভাবে হজরত আলি রা. নিজের অপর স্ত্রী লায়লা বিনতে মাসউদ থেকে জন্ম-হওয়া সন্তানের নাম আবু বকর রেখেছিলেন।[২৪] হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যুর সময় তার ছেলে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের বয়স ছিল মাত্র আড়াই বছর।[২৫] তখন হজরত আলি রা. তাকে পালকপুত্র বানিয়ে লালন-পালন করেন।[২৬]

এটা কি হজরত আবু বকর রা. এর প্রতি হজরত আলি রা. এর ভালোবাসার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়? সঠিক বিষয় তো এটাই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরো এবং আহলে বাইতকে খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপনকারী লোকেরা তাদের সম্মান সম্পর্কে অবগত নয়।

হজরত ফাতিমা রা. এর মৃত্যু

আবু বকর রা. এর খেলাফতের ষষ্ঠ মাসে ৩রা রমজান ১১ হিজরিতে হজরত ফাতিমা রা. ইনতেকাল করেন।[২৭]

এক বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আলি রা. তার জানাজার নামাজ পড়ান। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আবু বকর রা. তার জানাজা পড়ান।[২৮]

---

[২৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২৫; আলি রা. এর এই পুত্র কারবালার ময়দানে শহিদ হন।

[২৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ বিন আবু বকরের জীবনী দ্রষ্টব্য।

[২৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৯;

[২৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৮;

[২৮] হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জানাজা কে পড়িয়েছিল? এ ব্যাপারে ইবনে সা'দ তিনটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তিনটিই ওয়াকিদি থেকে বর্ণিত।

১. আমরা বিনতে আবদুর রহমানের সূত্রে ওয়াকিদি বলেন, ফাতেমা রা. এর জানাজা হজরত আব্বাস রা. পড়িয়েছেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৮)

কিন্তু এই আমরা বিনতে আবদুর রহমান (মৃত্যু : ৯৮ হিজরি) ১১ হিজরিতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন না।

২. উরওয়া বিন জুবায়েরের সূত্রে ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, হজরত আলি রা. তার জানাজা পড়িয়েছেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৮)

এই সনদের সূত্রটি হলো মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদি তিনি মা'মার থেকে, তিনি যুহরি থেকে, তিনি উরওয়া থেকে। বলাবাহুল্য উরওয়া বিন জুবায়েরও এই ঘটনার→

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হজরত ফাতেমা রা. এর মনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে। এই কারণে তিনি অধিকাংশ সময় এই পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করতেন,

---

প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন না। কেননা তার জন্মই হয়েছে ২৩ হিজরিতে (তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ১৫৬)। অতএব এই বর্ণনাটি মুনকাতি। আর ওয়াকিদির কারণে তো এটি যয়িফই।

ইমাম মুসলিম রহ. সহিহ মুসলিমেও এটি উল্লেখ করেছেন। এর শুরু অংশ তো সুনিশ্চিতভাবেই হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত; কিন্তু এর পরবর্তী অংশ যুহরির পক্ষ থেকে যুক্ত করা হয়েছে। আর উরওয়া বিন জুবায়ের থেকে এটি মুনকাতিসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে এই রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত আলি রা. ছয় মাস পর্যন্ত আবু বকর রা. এর হাতে বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। ব্যাখ্যাকারগণ এটিকে ইদরাজ তথা পরবর্তীতে কারও পক্ষ থেকে যুক্তকৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব জানাজার নামাজের ঘটনাটিও কোনো এক বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে যুক্ত করা হয়েছে। আর তার সনদটি মুনকাতি।

৩. শা'বির সূত্রে ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, হজরত আবু বকর তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৯)

সনদটি হলো, মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, আমাদেরকে কায়েস বিন রাবি বলেছেন, তিনি মুজালিদ থেকে, তিনি শা'বি থেকে।

ওয়াকিদির যয়িফ হওয়া তো সুস্পষ্ট আর কায়েস বিন রাবি হলেন 'সদুক' (সত্যবাদী)। (তাকরিবুত তাহযিব, নং ৫৫৭৩)

মুজালিদ বিন সাঈদকে 'লাইয়িন' (শিথিল), 'তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই' বলা হয়েছে। (তাকরিবুত তাহযিব, নং ৬৪৭৮) কিন্তু ইমাম মুসলিম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সাধারণ পর্যায়ের যয়িফ রাবি।

ইমাম শা'বি যদিও সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য রাবি; কিন্তু সনদটি মুনকাতি। কেননা শা'বিও এ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন না। তবে সনদটির নিম্নযুক্ত মুতাবি (সহায়ক সনদ) রয়েছে।

صلى ابو بكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله فكبر عليها اربعا-

আবু বকর চার তাকবিরে রাসুল সা. এর মেয়ে ফাতেমার জানাজার নামাজ পড়ান। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২৯)

এই রেওয়ায়েতটির সনদে শাবাবা বিন সিওয়ার, আবদুল আ'লা বিন আবুল মুসাওইর, আবু হানিফা রহ.-এর শাইখ হাম্মাদ ও ইবরাহিম নাখায়ি রয়েছেন।

তবে এই সনদটিও মুনকাতি। তদুপরি আবদুল আলার কারণে এতে দুর্বলতা চলে এসেছে। কেননা তাকে 'মাতরূক' (পরিত্যাজ্য), "লাইছা বি শাইয়িন" (তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই) বলা হয়েছে। (মিযানুল ইতিদাল, ২/৫৩১)

এই বিষয়ের যাবতীয় বর্ণনা যয়িফ। তবে তৃতীয় মতটির পক্ষে মুতাবি' (সহায়ক সনদ) থাকায় তা তুলনামূলক শক্তিশালী।

صبت علي مصائب لو انها * صبت على الايام صرن لياليا

আমার উপরে এমন বিপদ আপতিত হয়েছে যে, যদি দিবসের উপর তা আপতিত হতো তা হলে তা রাত্রি হয়ে যেত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাকে কেউই হাসতে দেখেনি। ভেতরে ভেতরে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং বেদনা অনুভব করছিলেন। সঠিক বক্তব্য অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল আটাশ।[২৯] এক মত অনুযায়ী তার বয়স ছিল পঁচিশ। কিন্তু এটি নির্ভরযোগ্য নয়।

---

[২৯] আল মুজামুল কাবির, ২২/৩৯৭

তিন বড় ফেতনা

আবু বকর সিদ্দিক রা. খেলাফতের জিম্মাদারি নেওয়ার সাথে সাথে তাকে তিনটি বড় বড় ফেতনার মোকাবেলা করতে হয়। যদি তিনি আল্লাহপ্রদত্ত দৃঢ়তা এবং বিস্ময়কর ঈমানি শক্তির মাধ্যমে তা প্রতিহত না করতেন তা হলে শুরুতেই তা অত্যন্ত বিপজ্জনক সাব্যস্ত হতো।

প্রথম ফেতনা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষজীবনে কিছু মানুষ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছিল। তার মৃত্যুর পর আরবের বিভিন্ন স্থানে তারা এই মিথ্যা দাবি নিয়ে শোরগোল শুরু করে। হাজার হাজার মুসলিম এবং সরল সাধারণ লোক তাদের অনুসারী হয়ে যায়। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের মধ্যে ছিল আসওয়াদ আনাসি, তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ, মুসাইলামা কাজ্জাব এবং বনু তামিমের সাজাহ নামক এক মহিলা।

দ্বিতীয় ফেতনাটি হলো ইরতিদাদের। এই সময় নজদ, ইয়েমেন এবং অন্যান্য এলাকার হাজার হাজার লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ইসলামের বাতি নিভে গেছে মনে করে মুরতাদ হয়ে যায়।

তৃতীয় ফেতনা : কিছু লোকের জাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রকাশ।

জাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সঙ্গে আচরণ

জাকাত অস্বীকারকারীরা দরবারে খেলাফতে তাদের কিছু প্রতিনিধি পাঠিয়ে এই দাবি পেশ করে যে, তারা তাওহিদ, রিসালাতসহ ইসলামের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ বিধান মান্য করে থাকে। কিন্তু তারা জাকাত আদায় করবে না। যেন তাদের জিম্মা থেকে তা মাফ করে দেওয়া হয়। কিছু সাহাবি নাজুক পরিস্থিতি এবং সময়ের কল্যাণ বিবেচনায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে পরামর্শ দেন, আপাতত তাদের এই আবদার মেনে নেওয়া হোক এবং জাকাত আদায় না করার সুযোগ প্রদান করা

হোক। হজরত উমর ফারুক রা. এর মতো সাহসী এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও পরামর্শ দেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য তাদের এই শর্ত মেনে নেওয়া হোক। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কে বলেন, এই লোকগুলো তো কালিমা- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তবু আপনি কেন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন?

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রাজনৈতিক কল্যাণ এবং তৎকালীন সময়ের প্রয়োজন উপেক্ষা করে ইসলামকে তার মূল রূপে বাকি রাখতে প্রত্যয়ী হন। এই কারণে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি জাকাতকে নামাজের মতো গুরুত্ব না দেবে, আমি অবশ্যই তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় যে ব্যক্তি জাকাতের জন্য একটি বকরির বাচ্চা হলেও প্রদান করত, এখন যদি সে তা প্রদান না করে তা হলে আমি তার বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নিব।[৩০]

এটা নিছক তার ধারণা নয়; বরং হাদিসেই বিষয়টির উল্লেখ আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يقولوا لا إلهَ إلّا اللهُ ويُقيموا الصَّلَاةَ ويُؤتوا الزَّكَاةَ
>
> আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং তারা নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে।[৩১]

উসামার নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ

এসব বাতিলগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক ছিল; কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর মুজাহিদ বাহিনীকে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষসময়ে যা গঠন করেছিলেন; কিন্তু তার অসুস্থতা এবং পরবর্তীতে মৃত্যুর কারণে এই বাহিনী তখনও মদিনার বাইরে অবস্থান করছিল। তখন অধিকাংশ সাহাবির ধারণা ছিল, এ বাহিনী না পাঠিয়ে প্রথমে আরব ভূখণ্ডে প্রকাশ-পাওয়া বিভিন্ন ফেতনা মূলোৎপাটন

---

[৩০] সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩০৯১

[৩১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৩৮

করা উচিত হবে। অন্যথায় এতে মুসলমানদের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চতুর্মুখী পরীক্ষার মধ্যেও হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মনোবল অত্যন্ত মজবুত ছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনিই এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নবুওয়াতের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা রক্ষা করতে পারেন। তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার পাশাপাশি চেষ্টা চালিয়ে যান। এতদুভয়ের মাধ্যমে তিনি এমন খেদমত আঞ্জাম দেন যে, প্রবল তুফানকালীন অবস্থা মুসলমানরা অত্যন্ত কল্যাণের সাথে অতিক্রম করেন। এতে দীন ও শরিয়তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিধানে সামান্য শিথিলতার সুযোগ তৈরি হয়নি।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এই সময় দীনের দিক থেকে অত্যন্ত মজবুত অবস্থান গ্রহণ করেন। যদি তিনি ঈমানি দৃঢ়তায় সামান্য দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন তা হলে ইসলাম এক জীবনঘনিষ্ঠ চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থার পরিবর্তে নিছক দর্শন বনে যেত কিংবা তা নির্দিষ্ট কিছু সময় কিছু ধর্মীয় আচারপ্রথা পালনের নাম হয়ে যেত। তখন থেকেই মানুষ ভেবে বসত যে, এই ধর্ম রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও দুর্বল। তারা তখন বলে বসত অতএব আমাদের জীবনের ওঠাবসা ও চলাফেরার বিষয়াদি শরিয়তবিমুক্ত স্বাধীন বিবেক-বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিচক্ষণতা এবং গভীর দূরদর্শিতার মাধ্যমে বিপদটি আঁচ করতে পারেন। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর বাহিনী প্রেরণ করার বিষয়টি সামনে এলে হজরত উমর, উসমান, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. এর মতো বড় বড় সাহাবি আবু বকর রা. এর নিকট উপস্থিত হন। তারা সকলেই এই বাহিনী পরবর্তীতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন। তারা বলেন যে, আরবের চতুর্দিকে এখন বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে; তাই এই মুহূর্তে এই বাহিনী শামে পাঠানোটা কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না; বরং এর পরিবর্তে তাদেরকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হোক। উপরন্তু এই বাহিনী চলে গেলে মদিনা অরক্ষিত হয়ে যাবে। এখানে আমাদের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন

রয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মুরতাদ দমন না হয়ে যায় ততক্ষণ রোমকদের সঙ্গে জিহাদের বিষয়টি মুলতবি করা হোক।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. শান্তভাবে তাদের আলোচনা শ্রবণ করেন। এরপর তাদের বলেন, তোমাদের আরো কিছু বলার আছে? তারা বলেন, না, আমরা আমাদের কথা বলেছি।

খলিফা তৎক্ষণাৎ বলেন, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমার প্রবল ধারণা হয় যে, হিংস্র জন্তুরা মদিনায় প্রবেশ করে আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তবু আমি অবশ্যই এই বাহিনী প্রেরণ করব। আমি কীভাবে সে বাহিনী প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারি, যার ব্যাপারে যে-সত্তার উপর আকাশ থেকে অহি অবতীর্ণ হতো তিনি বলেছেন, তোমরা উসামার বাহিনী প্রেরণ করে দাও।[৩২]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অটল সিদ্ধান্তে সকলে নীরব হয়ে যান। কিন্তু তবু কিছু সাহাবি পরামর্শ দেন যে, উসামা বিন যায়েদের পরিবর্তে কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবিকে আমির নির্ধারণ করা হোক। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. একথা শুনে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে আমির বানিয়েছেন, তোমরা তাকে পদচ্যুত করার পরামর্শ দিচ্ছ!'

এই বাহিনী যখন সফরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের সাথে পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন; আর উসামা বিন যায়েদ তখন ঘোড়ার উপর ছিলেন। হজরত উসামা রা. ভদ্রতার প্রতি তাকিয়ে আবেদন করেন, হে রাসুলুল্লাহর খলিফা, আপনি সওয়ার হোন, অন্যথায় আমিও পায়ে হেঁটে চলব।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, না তোমার ঘোড়া থেকে নামার প্রয়োজন রয়েছে আর না আমার আরোহণ করার কোনো দরকার আছে। কী সমস্যা? আমার পায়ে আল্লাহর রাস্তার কিছু ধুলোবালি লাগুক-না! মুজাহিদদের প্রতিকদমে ৭০০ সাওয়াব লাভ হয়ে থাকে।

---

[৩২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ১০১; কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৩০২৬৬, ৩০২৬৭

আবু বকর রা. বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য হজরত উমর ফারুক রা. কে নিজের সাথে মদিনায় রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন উসামা রা. এর বাহিনীতে শামিল ছিলেন। তিনি সেসময় নিয়মকানুনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতঃ নিজেই হজরত উমর রা. কে মদিনায় রেখে দেওয়ার পরিবর্তে হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর নিকট উমর রা. কে নিজের কাছে রাখার অনুমতি গ্রহণ করেন। এর ফলে সকলের নিকট আমিরের মর্যাদা এবং নিয়ম-নীতি রক্ষা করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠানোর সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হজরত উসামাকে নিম্নোক্ত নসিহত করেন :

> খেয়ানত ও ওয়াদা ভঙ্গ করবে না। ছোট শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করবে না। খেজুর এবং ফলদার বৃক্ষ কাটবে না। তোমরা সেখানে বিভিন্ন উপাসনালয়ে পাদরি ও সন্ন্যাসী পাবে, তাদের কষ্ট দেবে না।[৩৩]

উসামা রা. এর বাহিনীতে দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যত ছিল মৃত্যুর পর তা কমেনি।[৩৪]

উসামার বাহিনী চলে যাওয়ার পর মদিনার প্রতিরক্ষা

হজরত উসামা বিন যায়েদের বাহিনী চলে যাওয়ার পর মদিনার সামরিক শক্তি কমে যায়। একারণে মুরতাদগোষ্ঠী মদিনার আশপাশে একত্র হওয়া শুরু করে। মদিনার উত্তর দিক থেকে আবস ও জুবইয়ান, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বনু ফাযারা, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বনু গাতফানের মুরতাদরা প্রবল বেগে আসতে থাকে। শহরকে বিপজ্জনক অবস্থায় চলে যেতে দেখে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তখন শহর প্রতিরক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। শহরের সকল প্রবেশপথ এবং রাস্তা বন্ধ করে দেন। মদিনাবাসীদের সবসময় প্রস্তুত এবং সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন।[৩৫]

---

[৩৩] আল কামিল ফিত তারিখ; ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৪] ওয়াকিদি কৃত আল মাগাজি, ১/৪৭০

[৩৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

ওইদিকে হজরত উসামা রা. এর বাহিনী শামের সীমান্তে যাওয়ার পথিমধ্যে এমন কিছু গোত্রের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, যারা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার এবং বিদ্রোহের চিন্তাভাবনা করছিল। তারা এই ইসলামি বাহিনীকে ধীরে-সুস্থে নির্ভয়ে অতিক্রম করতে দেখে ভীত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহের পরিকল্পনা মুলতবি করে। হজরত উসামার বাহিনী শামের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 'বালকা' ও 'দারুম' এলাকায় রোমকদের সাথে লড়াই শুরু করে এবং তাদের পরাজিত করে ফেলে।[৩৬]

উসামার বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ শুনে মদিনার উত্তর এবং পূর্ব দিকে সামান্য কিছু মাইল দূরত্বে অবস্থান-করা বিদ্রোহীরা বলতে থাকে, যদি মদিনাবাসীদের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য না থাকতো তা হলে তারা এ পরিস্থিতিতে এই বাহিনী প্রেরণ করত না।[৩৭]

তাই তারা মদিনায় আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখায়নি। হজরত আবু বকর সিদ্দিকও উসামার বাহিনীর আসা পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে তিনি মদিনার প্রতিরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন বেশি।

বিদ্রোহীদের দমন

৪০ দিন পর হজরত উসামা যখন বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে ফিরে আসেন তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাকে মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। এরপর তিনি নিজেই মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমনে বের হন। সাহাবায়ে কেরাম তার জন্য দারুল খিলাফায় থাকার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তবু তিনি বিরত হননি। সৈন্য নিয়ে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদিনার আশপাশে অভিযান পরিচালনা করেন। এটা ছিল জুমাদাল উখরার শেষদিকের কথা। আবস, জুবইয়ান, বনু মুররা, বনু কিনানার কারণে মদিনার আশপাশ তখন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাদের উপর আকস্মিক হামলা করেন। একদিন ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই তিনি তাদের সম্মুখে হাজির হন।

---

[৩৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৪২৪

[৩৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্রোহীরা তাকে হঠাৎ সামনে উপস্থিত দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করতে থাকে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই বিশাল স্তূপ পড়ে যায় লাশের। অবশিষ্টরা পলায়ন করে। বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় এটিই ছিল প্রথম বিজয়।[৩৮] এভাবেই তিনি বিদ্রোহীদের উপর ত্রাস সৃষ্টি করে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেন।

নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ

এরপর তিনি মদিনা থেকে ১২ মাইল (২০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত যিলকাসসা নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেন। মুজাহিদ বাহিনীকে এগারভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগে অভিজ্ঞ সাহাবিদেরকে আমির হিসেবে নিয়োগ করেন। এরপর তিনি যুদ্ধের নকশা তৈরি করেন। সে নকশা অনুযায়ী তিনি এগার বাহিনীকে গোটা আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে দেন। এর দ্বারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদের দমন করাই তার মূল লক্ষ্য ছিল।

ইতিপূর্বে তিনি মুরতাদ-সরদার এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের অনুসারীদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পুনরায় ইসলামের প্রতি ফিরে আসার দাওয়াত প্রদান করেন। তার স্থলাভিষিক্তগণ তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যান। তারা ফেতনায় এতটাই নিমজ্জিত ছিল যে, তাদের খুব কম সংখ্যক লোকই এই দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছিল। এ কারণে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. পূর্ণ শক্তি, সাহসিকতা এবং ঈমানি বলে বলীয়ান হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে আসেন।[৩৯]

তুলাইহা আসাদিকে দমন

বনু আসাদ গোত্রের সরদার তুলাইহা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে এক বড় সংখ্যক অনুসারী তৈরি করে ফেলেছিল। সে দাবি করত যে, জিবরাইল আ. তার নিকট আয়াত অবতীর্ণ করেন। তার মনগড়া আয়াত নিম্নোক্ত টাইপের ছিল।

---

[৩৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৪৪৩

[৩৯] তারিখুত তাবারি, ৩/২৪৮, ২৪৯

والحمام واليمام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا بالشام

শপথ শহুরে এবং জংলি কবুতর এবং রোজাদার শিকারি পাখির। তারা তোমাদের কয়েক বছর পূর্বেই রোজা রেখেছে। আমাদের রাজত্ব শাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।[৪০]

মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য সে বিভিন্ন ধরনের ভেলকিবাজি প্রদর্শন করত। একবার সে মরুভূমিতে পানির বড় বড় মটকা লুকিয়ে রাখে। যখন তার অনুসারীদের পানি-স্বল্পতা দেখা দেয় তখন সে বলে 'ঘোড়ায় আরোহণ করে তোমরা ঐদিকে কিছু মাইল অতিক্রম করো তা হলে তোমরা সেখানে পানির মটকা দেখতে পাবে। লোকেরা সেখানে গিয়ে পানি পেলে এটাকে তুলাইহার মুজিজা ভেবে বসে।'

সে এসব ভেল্কিবাজির মাধ্যমে বনু আসাদ, বনু গাতফান এবং বনু তায়িকে নিজের অনুসারী করে তোলে। মোটকথা, এটা এক ধ্বংসাত্মক ফেতনা ছিল, যা মদিনার পূর্ব দিক বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল।[৪১]

তুলাইহাকে দমন করার জন্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে নির্বাচন করেন। তুলাইহা তখন তার বাহিনীর সঙ্গে বুযাখ নামক স্থানে অবস্থান করছিল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠানোর সময় এ নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তুমি প্রথমে তায়ি গোত্রের নিকট যাবে এরপর বুযাখের দিকে যাত্রা করবে। এই দায়িত্ব শেষ করার পর বিতাহে বনু তামিমের মালেক বিন নুয়াইরার খবর নিবে। এরপর আমার নির্দেশ আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে।

তার এই নির্দেশনাগুলোয় গভীর হেকমত নিহিত ছিল। হজরত খালিদ এ নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম তায়ি গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা তুলাইহাকে সহযোগিতা করলেও তখন পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বনু তায়ি-এর সরদার আদি বিন হাতেমের সাক্ষাৎ হলে তিনি তিন দিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। এ সময় তিনি তার

---

[৪০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৪১] সিরাতে ইবনে হিব্বান, ২/৪৩১

গোত্রের লোকদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করবেন। হজরত খালিদ তার প্রস্তাব মেনে নেন। হজরত আদি বিন হাতেম নিজ প্রচেষ্টায় সফল হন। তার গোত্রের লোকেরা তুলাইহার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে খালিদ রা. এর বাহিনীতে যোগদান করেন।[৪২]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার ফল ছিল এটা। দেখা যায় যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে শত্রুসারিতে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। মুসলমানদের বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এরপর হজরত খালিদ তুলাইহার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন। বুযাখা নামক স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। জায়গাটি ছিল মদিনা থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে। তুলাইহা তখন চাদর মুড়ি দিয়ে মুরাকাবার সুরতে এমনভাবে বসে যায়, যেন তার উপর এখন অহি অবতীর্ণ হবে। তার বাহিনীর সিপাহসালার ছিল উয়াইনা বিন হিসিন। তার অধীনে বনু ফাযারার ৭০০ যোদ্ধা ছিল। মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয়। ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে যায়। উয়াইনা খুব দ্রুতই বুঝতে পারে, খালিদ বিন ওয়ালিদকে পরাজিত করা বেশ কঠিন। সে তখন তুলাইহাকে এসে জিজ্ঞেস করে জিবরাইল কি কোনো বার্তা নিয়ে এসেছে?

তুলাইহা উত্তর দেয় এখনো আসেনি। যুদ্ধ যখন দীর্ঘায়িত হয়, উয়াইনা ধীরে ধীরে নিজের পরাজয় দেখতে থাকে। তখন সে তুলাইহাকে এসে বলে, তোর বাপ মরে যাক! জিবরাইল এখনো কোনো বিধান নিয়ে আসেনি? তুলাইহা বলে, না, এখনো আসেনি।

উয়াইনা এরপর তার বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখেন। কিন্তু যখন তার সঙ্গীদের পা পিছলে যায় তখন সে দৌড়ে আসে এবং বলে জিবরাইল কি এখনো আসেনি? তুলাইহা উত্তর দেয়, হ্যাঁ, এসেছিল। তুলাইহা আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, তিনি কী নির্দেশ নিয়ে এসেছেন? তুলাইহা তখন একটি মনগড়া আয়াত পড়ে দেয়,

ان لك رحا كرحاه . و حديثا لا تنساه

> তোমার ভাগ্যে তার মতো একটি চাক্কি নসিব হবে, তোমার অবস্থা এমন হবে যে তুমি চিরকাল তা স্মরণ রাখবে।

---

[৪২] তারিখুত তাবারি, ৩/২৫৩

এই উলটাপালটা কথা শুনে উয়াইনা বুঝে যায় তুলাইহা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার। তখন সে তার বাহিনীর মধ্যে গিয়ে ঘোষণা দেয়, লোকসকল, তোমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও। এই লোক একটা মিথ্যুক এবং ধোঁকাবাজ।

উয়াইনা ও তার গোত্রের লোকজন পলায়ন শুরু করে। মুরতাদদের পা উপড়ে যায়। উয়াইনাকে পাকড়াও করা হয়। কিন্তু নবুওয়াতের দাবিদার তুলাইহা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাতে চড়ে বসে। আর এ কথা বলতে বলতে পলায়ন করে যে, লোকসকল, যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিয়ে পালাতে পারবে, তোমরা পালিয়ে যাও।

সে প্রাণ নিয়ে শামে চলে যায়। এরপর কিছুকাল এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। একসময় সে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর দরবারে ক্ষমার আবেদন করে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মুরতাদদের তাওবার বিষয়ে শিথিল মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি তার এই আবেদন কবুল করেন। পরবর্তীতে সে ইরাকের যুদ্ধে মুসলমানদের সর্বোত্তম সৈনিকের ভূমিকা পালন করে। ওইদিকে উয়াইনাও ইসলাম কবুল করে নেয়। তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

উম্মে যিমিলকে দমন

তুলাইহার বাহিনী দমন করার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ আবু বকর রা. এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ এলাকাতেই অবস্থান করেন। এর ফলে আশপাশে ইরতিদাদের যে সামান্য কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল এজন্য তাকে পুনরায় কোনো বড় ধরনের কষ্ট করতে হয়নি।

তারপর বনু গাতফান, হাওয়াযিন এবং বনু সুলাইমের মুরতাদরা উম্মে যিমিল (সালমা বিনতে মালিক) এর নেতৃত্বে একত্র হয়। ইতিপূর্বে এই মহিলাটি এক জিহাদে বন্দি হয়ে হজরত আয়েশা সিদ্দিকার বাঁদি হিসেবে ছিল। তিনি অনুগ্রহ করে তাকে আজাদ করে দেন। তার মা উম্মে কিরাফা নিজ গোত্রের সরদার ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। মায়ের মৃত্যুতে উম্মে যিমিল ক্রোধান্বিত হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে নিজের আশপাশে জড়ো করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উত্তেজিত করে তোলে।

তার এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ সেনাবাহিনী নিয়ে সে দিকে অগ্রসর হন। উম্মে যিমিল একটি উটে চড়ে তার অনুসারীদের নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এক ঘোরতর যুদ্ধের পর মুসলমানগণ সেই উটটি ধরাশায়ী করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। এই যুদ্ধে উম্মে যিমিলকে রক্ষা করতে গিয়ে একশত মুরতাদ নিহত হয়।[৪৩]

আসওয়াদ আনাসির ফেতনা

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের মধ্যে আসওয়াদ আনাসি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই ফেতনা শুরু করেছিল। হাজার হাজার বেদুইন তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। তার শক্তি-সামর্থ্যের কারণে গোটা ইয়েমেনবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তার জুলুম-নির্যাতন এতটাই মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল যে, সে ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আবু মুসলিম খাওলানিকে (তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন; কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়নি) তার নবুওয়াত প্রকাশ্যে অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ গ্রেফতার করে জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু মুসলিম সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তার একটি পশমও পোড়েনি। এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আসওয়াদ আনাসির চেলারা বলে, তাকে এই এলাকা থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলুন। অন্যথায় লোকেরা আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আনাসি আবু মুসলিমকে ইয়েমেন থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি নিজেই এই পাপাচারীদের থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি ইয়েমেন ছেড়ে চলে যান। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকালীন ঘটনা।[৪৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বিশৃঙ্খলার খবর শুনে সেখানকার গভর্নরদের চিঠি লিখে আসওয়াদের ফেতনা দমন করার নির্দেশ দেন। তখন ইয়েমেনে ফিরোজ দাইলামি রা. থাকতেন। তিনি একরাতে সন্তর্পণে আসওয়াদ আনাসির থাকার ঘরে গিয়ে তাকে হত্যা

---

[৪৩] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।
[৪৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৩২৯

করে ফেলেন। এইভাবে এই ফেতনাটি সাময়িকের জন্য স্তিমিত হয়ে যায়।[৪৫] কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে তার অনুসারীরা ইয়েমেনে পুনরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরিশেষে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হজরত মুহাজির বিন উমাইয়াকে একদল মুজাহিদসহ ইয়েমেনে পাঠান। তারা ফেতনাবাজ লোকদেরকে পরাজিত করে ইয়েমেনে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ কায়েম করেন।[৪৬] সেইদিন আবু মুসলিম খাওলানি মদিনা এসে উপস্থিত হন। হজরত উমর ফারুক রা. তাকে মসজিদে নববিতে নামাজ পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোন এলাকার বাসিন্দা?

তিনি বলেন ইয়েমেনের।

তিনি জিজ্ঞেস করেন ওই লোক কে, যাকে মিথ্যুক আসওয়াদ আগুনে নিক্ষেপ করেছিল?

তিনি বলেন, সে হলো আবদুল্লাহ বিন সাউব (তার মূল নাম এটাই ছিল)। হজরত উমর তখন তাকে শপথ করে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি সেই ব্যক্তি নন?

তিনি বলেন, জি, হ্যাঁ। হজরত উমর তখন তাকে গলার সঙ্গে জড়িয়ে কেঁদে ফেলেন। এরপর নিজেই তাকে আবু বকর সিদ্দিক-এর নিকট নিয়ে যান। যা ঘটেছে তা শোনান। আবু বকর রা. বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পূর্বেই আমাকে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন, যার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আ. মতো আচরণ করেছেন।[৪৭]

মালেক বিন নুয়াইরাকে হত্যা করা হলো

বিতাহে বনু তামিমের গোত্রপতি মালিক বিন নুয়াইরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জীবনের শেষ দিকে ছিলেন। জাকাত উসুল করার জন্য তার নিকট আমিল পাঠান।

---

[৪৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/১৯৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৪৩৫, ৪৩৬

[৪৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/২২৭-২২৯,

[৪৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৩২৬

এরই মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুসংবাদ চলে আসে। তখন মালেক বেঁকে বসে। সে বলে, এই জাকাত এখন মদিনায় যাবে না; বরং এখানকার অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এটা ব্যয় করা হবে। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমিলগণ তাকে জাকাতের অর্থ মদিনায় পাঠানোর জন্য বারবার বলতে থাকেন তখন মালেক লড়াইয়ের পথে হাঁটে।

সেদিনই ইরাকের সীমান্ত এলাকা আলজাজিরার মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার নারী সাজাহ সেখানে পৌঁছে। তার সঙ্গে শক্তিশালী বাহিনী ছিল। এদের মধ্যে বনু তাগলিবের খ্রিষ্টানরাও ছিল, যারা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছিল।

সাজাহ এই বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে বনু তামিমকে নিজের সহযোগী হিসাবে পাওয়ার জন্য এর গোত্রপতি মালেক বিন নুয়াইরার সঙ্গে আলোচনা করে। মালিক তাকে বুঝায় যে, এখন মদিনা আক্রমণ করার পরিবর্তে নিজের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করাটাই উত্তম হবে। পরামর্শটি সাজাহর পছন্দ হয়। সেসময় ইয়ামামাতে মুসাইলামা কাজ্জাবের প্রবল শক্তি-সামর্থ্যের বিষয়টি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাজাহ তখন ইয়ামামার দিকে রওনা হয়। মালেক বিন নুয়াইরা পরামর্শ দিয়ে সে নিজেই পেছনে রয়ে যায়।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এ সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে মদিনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় বিতাহের খোঁজখবর নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। খালিদ রা. তুলাইহার অনুসারীদের দমন করে আকস্মিকভাবে বিতাহে আক্রমণ করেন। সেখানে গিয়ে মালেক বিন নুওয়াইরাকে তার চেলাচামুণ্ডাসহ গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। সে জাকাত বা ইসলামের কোনো রুকন অস্বীকার করেনি। কিন্তু সে ইসলামি খেলাফতের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। তা সত্ত্বেও হজরত খালিদ রা. তাকে হত্যা করতে চাননি। কেননা তার ভদ্রতা, দানশীলতা, বীরত্ব প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভাগ্যের লিখন অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। মালেক গ্রেফতার হওয়ার পর ভুলক্রমে একজন সৈনিকের হাতে নিহত হয়ে যায়।

মালিকের ভাই মুতমিম এক বড় কবি ছিল। সে ভাইয়ের শোকে এক কবিতা রচনা করে, যা আরবিসাহিত্যের অংশ হয়ে যায়। সে বলে :

وكنا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

وعشنا بخيرٍ في الحياة وقبلنا * أصابَ المنايا رهطَ كسرى وتبّعا

فلما تفرقنا كأني ومالكاً * لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً

জাজিমার বাদশাহর দুই উজিরের মতো আমরা দীর্ঘকাল একসঙ্গে ছিলাম। মানুষ তখন এটা বলতে লাগলো, তারা কখনোই পৃথক হবে না। আমরা সুখে-শান্তিতে আনন্দময় জীবনযাপন করছিলাম। আমাদের পূর্বে কিসরা এবং তুব্বার মতো বাদশাহদের মৃত্যু এসেছিল। এরপর যখন আমরা পৃথক হয়েছি তখন মনে হয়েছে আমি এবং মালেক একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যেন এক রাতও একসঙ্গে কাটাইনি।[৪৮]

এমনিভাবে তার নিম্নোক্ত কবিতাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে

لقد لامني عند القبور على البكا * رفيقي لتَذراف الدموع السوافك

فقال: أتبكي كل قبر رأيته * لقبر ثوى بين اللوى والدكادك؟

فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا * فدعني، فهذا كله قبر مالك

কবরের নিকট আমাকে অঝোরধারায় কাঁদতে দেখে আমার বন্ধু তিরস্কার করে বলে, ছাওয়া থেকে দাকাদিক পর্যন্ত যত কবর আছে, সব দেখেই কি তুমি এভাবে বিলাপ করবে? আমি বলি দুঃখ-বেদনা আমার বিরহ বাড়িয়ে দেয়। অতএব আমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দাও আমার জন্য প্রতিটি কবর মালেকেরই কবর।[৪৯]

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং তার জবাব

এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বোঝা উচিত যে, মালেক বিন নুয়াইরাকে হত্যার ক্ষেত্রে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর কোনো ধরনের

---

[৪৮] আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, ১/১৫৮, তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, পৃষ্ঠা ১০৫, ১০৬

[৪৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৪৬২

ভূমিকা ছিল না। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. প্রচণ্ড শীতের রাতে বন্দিদের ব্যাপারে সিপাহিদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, বন্দিদের গরমের ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ তাদেরকে শীতবস্ত্র এবং মোটা লেপের ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু ওই এলাকা তথা বনু কিনানার ভাষায় এটি মেরে ফেলার অর্থে ব্যবহৃত হতো। এজন্য কিছু সৈনিক ভুল বুঝে বন্দিদের হত্যা করা শুরু করে দেয়। মালিক বিন নুয়াইরা এই সময় সৈনিকদের হাতে নিহত হয়ে যান। হজরত খালিদ রা. এ ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন অবশ্যই তা সংঘটিত হয়।

হজরত খালিদ রা. তখন মালিকের বিধবা স্ত্রী উম্মে তামিমের শোক লাঘব করা এবং তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে বিয়ে করে নিলেন।[৫০]

লক্ষ করে দেখুন, হজরত খালিদ রা. মালিককে হত্যা করতে চাইতেন তা হলে তিনি উম্মে তামিমকে বিয়ে করার প্রশ্নই উঠত না। বরং আরবদের স্বভাবপ্রকৃতি অনুযায়ী নিহত স্বামীর হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য তার স্ত্রী উঠে পড়ে লাগতেন। এমনকি উম্মে তামিম হজরত খালিদ রা. এর উপর দিয়তের বোঝা আরোপ করেননি। এর দ্বারা এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে যে, খালিদ রা. তার নিকট নির্দোষ ছিলেন।

অসতর্ক ইতিহাস লেখকগণ ঘটনাকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন, যদি সেটাই বাস্তব হতো অর্থাৎ হজরত খালিদ রা. মালিককে ইচ্ছা করে হত্যা করতেন এরপর তার স্ত্রীকে বাধ্য করে বিয়ে করতেন তা হলে আবু বকর সিদ্দিক রা. এই জুলুম কখনোই মেনে নিতে পারতেন না।

মুসাইলামা কাজ্জাবের ফেতনা

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের মধ্যে মুসাইলামা কাজ্জাব সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। আরব ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চল নজদ থেকে এ ফেতনার উদ্ভব ঘটেছিল। সে চরম ধোঁকাবাজ এবং প্রতারক ছিল। মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং

---

[৫০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষের মন জয় করাটা তার বাম হাতের খেলা ছিল। সে তার অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে আজান এবং নামাজের ব্যবস্থা করেছিল। বনু হানিফার সকল গোত্র তার অনুসারী হয়ে যায়। সে ইয়ামামাকে নিজের হেডকোয়ার্টার নির্ধারণ করে। একে সে মক্কার ন্যায় হারাম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা করে।[৫১]

মুসাইলামা কুরআন মাজিদের শৈলীতে বিভিন্ন মনগড়া আয়াত বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালাত। তার মনগড়া অহির কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

والشاء وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المَذق، فما لكم لا تمجعون.

শপথ বকরি এবং তার রংয়ের। তারমধ্যে কালো বকরি এবং তার দুধ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। বকরি কালো কিন্তু তার দুধ সাদা, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। দুধের সাথে পানি মেশানো হারাম করা হয়েছে। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা দুধের সাথে খেজুর খাও না?

يَا ضِفْدَعُ ابنة ضفدع، نِقِّي مَا تَنِقِّينَ، أَعْلَاكِ فِي الْمَاءِ وَأَسْفَلُكِ فِي الطِّينِ، لَا الشَّارِبَ تَمْنَعِينَ، وَلَا الْمَاءَ تُكَدِّرِينَ.

হে ব্যাঙ, ব্যাঙের বাচ্চা, তুমি যাকে পরিষ্কার রাখ তা পরিষ্কার থাকে। তোমার উপরাংশ পানিতে আর নিম্নাংশ মাটিতে। তুমি পানকারীকে বাধা দাও না আবার পানি বিনষ্ট করো না।

والمُبذرات زرعًا، والحاصدات حصدًا، والذاريات قمحًا، والطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثردًا، واللاقمات لقمًا، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ربفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه.

শপথ সেই নারীদের, যারা ক্ষেতে বীজ বপন করে, যারা ফসল কাটে, যারা গমের দানা ঝেড়ে ফেলে, যারা আটা পিষে, যারা রুটি পাকায়, যারা সারিদ তৈরি করে, যারা তরকারি ও চর্বি দিয়ে লোকমা বানায়, নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে শহুরে লোকদের উপর

---

[৫১] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, বেদুইনরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী নয়, তোমাদের শষ্যক্ষেত্র রক্ষা করো, ভিক্ষুকদের আশ্রয় দাও।[৫২]

মুসাইলামা কাজ্জাবের অনুসারীরা এই ধরনের অদ্ভুত আয়াত অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে শ্রবণ করত। তাদের অধিকাংশ জানত যে, এই ব্যক্তি একটা মিথ্যা নবী দাবিদার; কিন্তু বংশীয় অন্যায় পক্ষপাতিত্ব তাদেরকে গোমরাহ বানিয়ে ফেলে। তারা আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র রবিয়ার অন্তর্গত ছিল। যারা দীর্ঘকাল যাবৎ মুদার গোত্রের বিরোধী ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরাইশ বংশ মুদার গোত্রের একটি শাখা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুদার গোত্রে জন্মগ্রহণ করাটা রবিয়া গোত্রের হিংসার কারণ ছিল। এখন যখন তাদের গোত্রের এক ব্যক্তি নবুওয়াত দাবি করে তখন তারা এটাকে প্রতিশোধ নেওয়ার একটি বাহানা বানিয়ে নেয়।

তাদের গোত্রপ্রীতি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, যখন মুসাইলামার কোনো এক অনুসারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি কি প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করো যে, মুসাইলামা একজন নবী? তখন সে উত্তর দেয় আমি এটা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যনবী এবং মুসাইলামা মিথ্যুক। তবে ইয়ামামার মিথ্যুক নবী আমার নিকট মদিনার সত্যনবীর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।[৫৩]

এই গোত্রীয় দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আঞ্চলিক রাজনৈতিক কিছু স্বার্থ নিহিত ছিল। যার ফলে হাজার হাজার মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়। যখন অপর মিথ্যা নবী দাবিদার সাজাহ আপন লোক-লশকরসহ ইয়ামামা পৌঁছে এবং তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে মুসাইলামা তখন তাকে উভয়ে মিলে আরব জয় করার স্বপ্ন দেখায়। সাজাহ শুধু এ ব্যাপারে আগ্রহীই হয়নি; বরং ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্য সে মুসাইলামার পক্ষ থেকে আত্মীয়তার প্রস্তাব কবুল করে নেয়।

বিয়ের পর সাজাহ যখন আপনজনদের নিকট ফিরে আসে তখন তার অনুসারীরা তাকে জিজ্ঞেস করে মোহর হিসেবে আপনাকে কী দেওয়া

---

[৫২] তারিখে তাবারি, ৩/২৮৪

[৫৩] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

হয়েছে? সে বলে, কিছুই নয়। তারা তখন বলে আপনি ফিরে গিয়ে কিছু মোহর নিয়ে আসুন।

সাজাহ এই দাবি নিয়ে যখন নিজ ধোঁকাবাজ স্বামীর নিকট যায় তখন সে অত্যন্ত গা-ছাড়া ভঙ্গিতে বলে তোমার সম্প্রদায়ে ঘোষণা করে দাও যে, মুসাইলামা তার জিম্মা থেকে ফজর ও ইশা এ দুই ওয়াক্ত নামাজ মাফ করে দিয়েছে।

সাজাহর অনুসারীরা এই অভিনব মোহর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায়। তারা ভাবতে থাকে, এর ফলে দুই ওয়াক্ত নামাজ তো মাফ হলো! তখন তারা মনেপ্রাণে সাজাহর সাথে সাথে মুসাইলামার গুনগান গাইতে থাকে।[৫৪]

মুসাইলামা মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। ইসলামের প্রতি তার শত্রুতা এতটাই মারাত্মক ছিল যে, তার আশপাশ দিয়ে কিংবা তার পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে কোনো মুসলমান অতিক্রম করলে সে তাদেরকে পাকড়াও করত। নিজের কালিমা পড়তে তাদেরকে বাধ্য করত। যে ব্যক্তি তার কথা না মানত, সে তাকে হত্যা করে ফেলত।

সাহাবি আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব রা. একবার তার আশপাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মুসাইলামা কাজ্জাব তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। তাকে নিজের কালিমা পড়তে বাধ্য করে। হজরত আবদুল্লাহ তখন কুরআন মাজিদে প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করেন, যাতে বলা হয়েছে, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত।[৫৫]

তিনি উক্ত আয়াতে প্রদত্ত সুযোগের ভিত্তিতে শুধু মুখে মুখে তার কালিমা উচ্চারণ করেন। মুসাইলামা তখন তাকে হত্যা না করে বন্দি করে রেখে দেয়।[৫৬]

---

[৫৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

[৫৫] সুরা নাহল, আয়াত ১০৬

[৫৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৪/৩১৬

প্রসিদ্ধ সাহসী নারী সাহাবি হজরত উম্মে উমারা রা. এর ছেলে হজরত হাবিব বিন যায়েদ রা. কে মুসাইলামা গ্রেফতার করে। মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল? তিনি বলেন অবশ্যই। মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তিনি তখন না বোঝার ভান ধরে বলেন, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। মুসাইলামা তার একটি অঙ্গ কর্তন করে ফেলে। কিন্তু তবু তিনি খতমে নবুওয়াতের বিষয়টি বলা থেকে বিরত থাকেননি। এভাবে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে দিতে শহিদ করে ফেলা হয়।[৫৭]

মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গঠন

এই অত্যাচারী বর্বর শত্রুর ফেতনা দমনের জন্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. দুটি বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রথমটি হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেল রা. এর নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়টি হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. এর নেতৃত্বে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ইকরিমাকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুরাহবিল বিন হাসানার বাহিনী না পৌছবে ততক্ষণ তোমরা মুসাইলামার অনুসারীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবে না। কিন্তু হজরত ইকরিমা রা. এই বিষয়ে তেমন মনোযোগ প্রদান করেননি। নজদে পৌছামাত্র তিনি শত্রুর উপর হামলা করে বসেন। মুসাইলামার বাহিনী ভীষণ যুদ্ধবাজ ছিল। তারা ইসলামি বাহিনীকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দেয়। হজরত ইকরিমা তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. কে পরাজয়ের সংবাদ পাঠান। এ সংবাদ পেয়ে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অপর যে বাহিনী যাচ্ছিল, আবু বকর রা. তা থামিয়ে দেন এবং নির্দেশ পাঠান যে, খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনী আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করবে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মুসাইলামার শক্তি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন। এই কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বড় শক্তিশালী বাহিনী বিন্যস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তুলাইহাকে দমন করে মদিনায় আসেন। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তৎক্ষণাৎ তাকে

---

[৫৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৪১৮

নির্দেশনা প্রদান করে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাপতি হিসেবে পাঠান। তিনি বলেন রাস্তায় শুরাহবিল বিন হাসানার বাহিনীকে তোমার সাথে নিয়ে অগ্রসর হবে। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সে নির্দেশ অনুযায়ী শুরাহবিল রা. এর বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার দিকে রওনা হন।[৫৮]

চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র

মুসাইলামার হাতে শহিদ হওয়া হাবিব বিন যায়েদের মাতা উম্মে উমারা নিজের আরেক সন্তান- আবদুল্লাহ বিন যায়েদের সাথে এই বাহিনীতে শরিক ছিলেন।[৫৯]

মুসলিমবাহিনীর আগমনসংবাদ শুনে বনু হানিফার ৪০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা আকরাবা ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। মুসলমানরা পৌছামাত্র তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বনু হানিফার লোকেরা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার কারণে মিথ্যুক নবীর জন্য অসম্ভব আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে লড়াই করতে থাকে। মুসলমানগণ ইতিপূর্বে এমন মারাত্মক আক্রমণের শিকার হননি। কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহাবি একের পর এক শহিদ হয়ে যান। মুহাজিরদের পতাকাবাহী হজরত আবদুল্লাহ বিন হাফস রা. শহিদ হয়ে গেলে হজরত আবু হুজাইফা রা. এর আজাদকৃত গোলাম সালেম ঝান্ডা বহন করেন। তার তেলাওয়াত অত্যন্ত সুন্দর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার তেলাওয়াতের প্রশংসা করেছেন। যুদ্ধের নাজুক অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি তাকে বলে আপনার কি নিজের প্রাণের কোনো পরোয়া নেই?

তিনি উত্তর দেন, যদি আমি আমার প্রাণের ভয় করি তা হলে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট হাফেজে কুরআন আর কে হতে পারে?!

তার মনিব হুযাইফা রা. প্রবল বীরত্বের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলেন আর প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বলছিলেন, হে কুরআনের কারীরা, কুরআন মাজিদকে নিজেদের জীবনের সৌন্দর্য বানিয়ে রাখো।

---

[৫৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৫৯] সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/৪৬৬

হজরত উমর রা. এর বড়ভাই হজরত যায়েদ বিন খাত্তাব রা. সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, হে লোকসকল, তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আগে বেড়ে যুদ্ধ করতে থাকো।

লড়াইয়ের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। একবার মুসলমানরা বিজয়ী হতো, আরেকবার কাফেররা। একবার মুসলমানদের পা উপড়ে যায়। শত্রুরা তাদেরকে তাড়াতে তাড়াতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌছে যায়।

হজরত সাবেত বিন কায়েস রা. মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহ, আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি... এটা বলেই তিনি ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

হজরত সালেম, হজরত আবু হুজাইফা, হজরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রত্যেকেই নিজেকে কোরবান করে দেন।

এরপর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলমানদেরকে বিন্যস্ত করে এক প্রবল আক্রমণ করেন। এতে শত্রুদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারী সম্প্রদায় তখন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করতে থাকে। যুদ্ধের ময়দান থেকে অল্প কিছু দূরেই উঁচু দেয়াল-ঘেরা এক বাগান ছিল, যাকে হাদিকাতুর রহমান বলা হতো। তারা পলায়ন করে সেই বাগানে মোর্চা গাড়ে। মুসলমানরা সেখানে পৌছলে তারা দরজা বন্ধ করে দেয়। ভেতরে প্রবেশ করার কোনো পথ ছিল না। হজরত আনাস বিন মালিক রা. এর ভাই হজরত বারা রা. এ দৃশ্য দেখে বারবার বলতে থাকেন, যেন তাকে বাগানে নিক্ষেপ করা হয়। যাতে তিনি সেখানে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা খুলে দিতে পারেন। প্রথম দিকে মুসলমানরা তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কিন্তু বারবার আবেদনের কারণে তাকে ভেতরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তিনি সেখানে লড়াই করতে করতে একসময় দরজা খুলতে সক্ষম হন। এ সময়ের মধ্যেই তার শরীরে আশির অধিক আঘাত লাগে। এরপর মুসলমানরা স্রোতের ন্যায় সেখানে প্রবেশ করতে থাকেন।[৬০]

---

[৬০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

শত্রুরা মুসলমানদের প্রতিহত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই অবস্থায় আবু দুজানা রা. বাগানের দরজায় শহিদ হয়ে যান। উম্মে উমারা এবং তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন যায়েদ মুসাইলামার অনুসন্ধানে শত্রুসারির ভেতরে প্রবেশ করতে থাকেন। এক ব্যক্তি উম্মে উমারার হাত কেটে ফেলে। ইতিমধ্যেই তলোয়ার এবং বর্শার ন'টি আঘাতে তার হাত জখমি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সামনে বাড়তে থাকেন।[৬১]

বনু হানিফার সিপাহসালার মুরতাদদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করতে থাকে। হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. তার দিকে তির ছুড়ে মারেন। এটা তার গলায় বিদ্ধ হয়। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এতে শত্রুসেনাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। মুসলমানরা তাকে তরবারির মাথায় বিদ্ধ করে উঁচু করে তুলে ধরে। শত্রুরা তখন নিরাশ হয়ে বাগান থেকে পলায়ন করতে থাকে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মুসাইলামা কাজ্জাব তাদের সাথে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু ওয়াহশি বিন হারব রা. তার জন্য ওত পেতে ছিলেন। উহুদযুদ্ধে হজরত হামজা রা. এর মতো মহান সাহাবিকে হত্যার বদলাস্বরূপ পুণ্যের কাজ হিসেবে এই নিকৃষ্ট লোকটাকে তিনি হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে তার দিকে এমনভাবে বর্শা ছুড়ে মারেন যে, নরাধম এতেই ঘায়েল হয়ে সেখানে পড়ে যায়।[৬২]

এই সময় উম্মে উমারার ছেলে আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. তরবারির মাধ্যমে তার খেলা খতম করে দেন। এদিকে উম্মে উমারা ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে যান। নিজ ছেলেকে এই নরাধমের রক্তে রঞ্জিত তলোয়ার মুছতে দেখে আনন্দে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।[৬৩]

এই প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধে মদিনার মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে ৩৬০ জন সাহাবি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন, যাদের মধ্যে কুরআন মাজিদের প্রসিদ্ধ ৩৫ জন হাফেজ ছিলেন।

---

[৬১] ওয়াকিদি কৃত মাগাজি, ১/২৬৯; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৬৫

[৬২] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৬৩] ওয়াকিদি কৃত আল মাগাজি, ১/২৬৯, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৬৫

প্রতিপক্ষের সাত হাজার সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে, সাত হাজার বাগানে এবং প্রায় সমসংখ্যক পলায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করে।[৬৪]

ইয়ামামার যুদ্ধটি ১১ হিজরির শেষদিকে সংঘটিত হয়েছে। এটা আরব ভূখণ্ডে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলার সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় ফেতনা ছিল। এরপর মুরতাদদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সেনাপতিগণ আরবের সকল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দমন করেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. এর গভীর চিন্তাভাবনা, দৃঢ়তা এবং সঠিক পদক্ষেপের ফলে এক বছরের মধ্যেই গোটা রাজ্যে পূর্ণ শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৫]

কুরআন মাজিদের হেফাজত

ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেজ এবং কারি শহিদ হয়ে যাওয়াতে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যান। তখন পর্যন্ত কুরআন মাজিদ লিখে সংরক্ষণের ধারা চালু হয়নি। বরং অধিকাংশ সময়ই মানুষ তা শুনে শুনে মুখস্থ করত। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এতসংখ্যক হাফেজের বিদায়ের কারণে কুরআন মাজিদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেন। এজন্য তিনি কুরআন মাজিদকে লিখিত আকারে একত্র করার ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রথমে তিনি হজরত উমর রা. এর নিকট নিজের মত প্রকাশ করেন। তারা উভয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

আনসারদের মধ্য থেকে যায়েদ বিন সাবেত রা. কে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি একজন কাতিবে অহি ছিলেন। পাশাপাশি জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তিনি নওজোয়ান সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি দিনরাত এক করে এই মহান দায়িত্ব পালন করেন। যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অহি অবতীর্ণ হয়েছে, এ কারণে পূর্ণ কুরআন মাজিদ ধারাবাহিকভাবে লেখাটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ছিল। কেননা কুরআন মাজিদ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, তার পরিবর্তে জিবরাইল আ. যে তারতিব দিয়েছিলেন সেই

---

[৬৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।
[৬৫] জাহাবি কৃত আল ইবার, ১২ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

অনুযায়ী তাকে রূপ দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেই তারতিব কী হতে পারে সর্বশেষ আয়াত ও সর্বশেষ সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব ছিল না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আয়াত এবং সুরাসমূহ চামড়া, গাছের ছাল, হাড়সহ বিভিন্ন মাধ্যমে সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তখন শুনে শুনে মুখস্থ করার রীতিটিই ব্যাপক ছিল। কুরআন মাজিদ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে নয়, বরং লাওহে মাহফুজে যেভাবে রয়েছে সেভাবে তারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন; এবং এভাবেই তারা একে-অপরকে শোনাতেন। তাদের জানা ছিল যে, কোন আয়াতের পর কোন আয়াত হবে।

হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. এই সকল লিখিত উপকরণ এবং হাফেজদের স্মৃতি কাজে লাগিয়ে কুরআন মাজিদের পূর্ণাঙ্গ কপি তৈরি করেন। এটা পরবর্তীতে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট সংরক্ষণ করা হয়।[৬৬]

এই কপিটি পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রা. এবং তার শাহাদাতের পর তার মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা. এর নিকট সংরক্ষিত থাকে। হজরত উসমান রা. এর জমানায় অভিযোগ আসে যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ কুরআন মাজিদের ব্যাপারে মতানৈক্যের শিকার হচ্ছে। তখন সেই কপিটি পুনরায় হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. এর নিকট সোপর্দ করা হয়। তিনি কুরআন মাজিদের ব্যাপারে দক্ষ সাহাবিদের নিয়ে এই মূল কপি থেকে আরো কয়েকটি কপি তৈরি করেন, যা গোটা মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

নববি, সিদ্দিকী ও উসমানী যুগে কুরআন মাজিদ একত্র করার মধ্যকার পার্থক্য এটা ছিল যে,

১. রাসুলুল্লাহর জমানায় লিখিত আয়াতগুলো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

২. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জমানায় প্রত্যেক সুরাকে পৃথক পৃথক সহিফায় লিখে তা একত্র করা হয়। এটি তখন থেকে কুরআন

---

[৬৬] সহিহ বুখারি, ৪৯৮৬, ৪৯৮৭

মাজিদের মূল কপির মর্যাদা লাভ করে। একে আল উম্ম (বা মূল কপি) বলা হয়।

৩. হজরত উসমান রা. এর জমানায় এই 'উম'কে সামনে রেখে পৃথক পৃথক সহিফাকে একটি বড় সহিফায় স্থানান্তর করা হয়। এরপর এর কয়েকটি কপি তৈরি করা হয়।[৬৭]

বাহরাইনের রণাঙ্গনে হজরত আলা বিন হাদরামি রা.

মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে বাহরাইনের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। হজরত আলা আল হাদরামি রা. এক্ষেত্রে মুরতাদদের দমনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভর্নর মুনজির বিন সাওয়া রা. এর মৃত্যু হলে বহু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। হজরত আলা বিন হাদরামি রা. এর বাহিনীতে হজরত আবু হুরাইরা রা. এবং বনু হানিফার সুমামা বিন উসাল রা. শামিল ছিলেন। পথিমধ্যে এক বিশাল মরুভূমিতে তারা রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু এরই মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। খাবার এবং পানীয় বহনকারী সকল উট গায়েব হয়ে যায়। মুসলমানরা জাগ্রত হয়ে এই দৃশ্য দেখে

---

[৬৭] ফাতহুল বারি, ৯/ ১১-২১

কুরআনুল কারিম একত্র করাটা এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইদানীং কিছু মানুষের জানাশোনার পরিধি বেশ বিস্তৃত; কিন্তু তাদের বিবেক অত্যন্ত কাঁচা। তারা তিন খলিফার যুগে কুরআনুল কারিম একত্র করার উপর রাফেজি এবং প্রাচ্যবিদদের আপত্তির একটি উত্তর বের করেছে। তারা এই ক্ষেত্রে যেই উত্তরটি দিয়ে থাকে- সহিহ বুখারিতে ইবনে শিহাব যুহরির পক্ষ থেকে কুরআনুল কারিম একত্র করার ব্যাপারে যে বর্ণনা রয়েছে, এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। এবং ইবনে শিহাব যুহরি ইসলামের মুখোশধারী দুশমন ছিল। আবু বকর সিদ্দিক ও উসমানি যুগে কুরআনুল কারিম একত্র করার কোনো কাজ হয়নি; বরং পুরো কুরআন রাসুল সা. এর জীবদ্দশায় বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

তাদের উক্ত জবাবের মাধ্যমে একটি আপত্তি দূর হয়ে গেলেও অন্যদিকে হাদিস অস্বীকার এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বহু গোমরাহির দরজা খুলে যায়। পাঠকগণ এ বিষয়ে ড. আলি বিন সুলাইমান আল আবিদের 'জামউল কুরআন হিফজান ওয়া কিতাবাতান' এবং মুফতি তাকী উসমানি হাফি. এর 'উলুমুল কুরআন' অধ্যয়ন করতে পারেন। এই কিতাবদ্বয়ে এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ইনকারে হাদিস (হাদিস অস্বীকারের) সুযোগও তৈরি হয় না আবার এর পাশাপাশি প্রাচ্যবিদ এবং রাফেজিদের আপত্তিও খণ্ডিত হয়ে যায়।

অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন। তখন প্রচণ্ড গরম চলছিল। মরুভূমিতে পানি ব্যতীত সফর করাটা মৃত্যুতুল্য ছিল। একে অপরকে তখন অন্তিম মুহূর্তের অসিয়ত করা শুরু করেন। তা সত্ত্বেও হজরত আলা বিন হাদরামি রা. সামান্য ঘাবড়াননি। বরং তিনি বলেন পেরেশান হবেন না। আপনারা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের একাকী ছেড়ে দেবেন না।

ফজর নামাজের পর তিনি অঝোরধারায় ক্রন্দন করে দোয়া করেন। মুসলমানরা সকলেই দোয়ায় শরিক ছিলেন। দোয়া শেষ হতেই দূরে এক জায়গায় পানি চমকাতে দেখা যায়। এমনকি সূর্য উপরে না উঠতেই হারিয়ে যাওয়া সব উট দ্রব্যসামগ্রীসহ ফিরে আসে।

তারা সফর শুরু করেন। যখন তারা সামনে চলতে থাকেন তখন আবু হুরাইরা রা. এর স্মরণ হয়ে যায় যে, তিনি পানিভর্তি একটি মশক একটি কূপের কিনারায় রেখে এসেছেন। তিনি পুনরায় পেছনে চলা শুরু করেন। এসে দেখেন ওই স্থানটি একটি ছোট পুকুরের রূপ নিয়েছে। আর মশক পূর্বের মতোই পানি ভর্তি অবস্থায় কিনারে পড়ে রয়েছে। হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

আলা বিন হাদরামি হাজার নামক স্থানে মুরতাদদের পরাজিত করেন। অবশিষ্ট যারা ছিল, তারা সকলে পলায়ন করে দারিন এর দিকে চলে যায়। 'দারিন' পারস্যের উপকূলবর্তী দেয়াল-ঘেরা একটি শহর। তারা জাহাজে আরোহণ করে পলায়ন করে। আলা বিন হাদরামি তখন সাথি-সঙ্গীদের বলেন, আল্লাহ তায়ালা মরুভূমিতে তার সাহায্যের নমুনা দেখিয়েছেন, যাতে তোমরা সমুদ্রে তার সাহায্যের জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারো। অতএব এখন তোমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

সকলেই তখন দ্রুতগতিতে উপকূলে পৌছান। জাহাজের মাধ্যমে ওই পাড়ে পৌছতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মুরতাদরা মুসলমানদের জন্য কোনো জাহাজ অবশিষ্ট রেখে যায়নি। আলা বিন হাদরামি তখন দোয়া করেন,

يا ارحم الراحمين يا كريم يا حليم يا احد يا صمد يا حي يا محيي الموتى
يا حي يا قيوم لا اله الا انت يا ربنا

হে পরম দয়ালু, মহান দাতা, হে করুণাময়, হে একক অমুখাপেক্ষী সত্তা, হে মৃতকে জীবনদানকারী চিরঞ্জীব, হে সদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, আপনি ব্যতীত আমাদের কোনো মাবুদ নেই, হে আমাদের রব।

এই দোয়া করে তিনি সমুদ্রে ঘোড়া চালিয়ে দেন। উট, ঘোড়া, গাধায় আরোহী মুজাহিদরাও এই দোয়া পড়তে পড়তে নিশ্চিন্তে নিজেদের আমিরের পিছু পিছু পানিতে নেমে পড়েন। এভাবে তারা এই পানিভর্তি বিশাল সমুদ্র নির্বিঘ্নে পাড়ি দেন। তাদের কেউই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাননি। দারিনে আত্মগোপনকারী মুরতাদরা এটা দেখে হতবাক হয়ে যায়। আলা বিন হাদরামি তাদেরকে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে ঘিরে ধরেন। তাদের শক্তি-সামর্থ্য চূর্ণ করে ফেলেন।

ঘোড়ায় আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দেওয়াটা সাহাবায়ে কেরামের কারামত ছিল, যা গোটা দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়েছে। এটা দেখে ইসলাম কবুলকারী এক খ্রিষ্টান পাদরি বলেছে, আমি যদি এই কারামত দেখেও ইসলাম কবুল না করতাম তা হলে আমার আশংকা হচ্ছিল যে, আল্লাহ আমার আকৃতি বিকৃত করে দেবেন।[৬৮]

---

৬৮ আল কামিল ফিত তারিখ, ১১ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ... পারস্য ও রোম

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বহির্বিশ্বের সমস্যাবলির প্রতি মনোনিবেশ করেন। সে সময় আরব ভূখণ্ড দুনিয়ার দুই পরাশক্তির দৃষ্টিতে কাটার মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। পূর্ব দিকে ছিল পারসিক সাসানি সাম্রাজ্য আর পশ্চিমে ছিল রোমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। আরবদের সঙ্গে উভয় সাম্রাজ্যের পূর্ব থেকেই শত্রুতা ছিল। কয়েকবার তাদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল।

পারসিকরা আরবদের প্রতি বিশেষ ধরনের শত্রুতা পোষণ করত। শুধু কৃষ্টি-সভ্যতা রাজনৈতিক-সামরিক দিক দিয়েই তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলতো না; বরং নিজেদের বংশকে দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। এই কারণে আরবদের তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। তাদেরকে মূর্খ ও নিঃস্ব মনে করত। তাদের চালচলন, পোশাকআশাক এবং রীতিনীতি নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

ইসলাম আসার পূর্বে যেহেতু আরবদের শক্তিশালী কোনো ক্ষমতা ছিল না; বরং বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আমিরের জায়গির-ব্যবস্থা কায়েম ছিল এই কারণে তাদের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থার দ্বারা ফায়দা উঠিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য আরবের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাক গলাতো। কোনো কোনো সময় আরবদের এসকল সরদারকে পারস্য নিজের অধীনস্থ করে ফেলত। তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করত। কিন্তু আরবদের স্বাধীনচেতা মনোভাব তাদেরকে বেশিদিন অন্যকারো গোলামিতে থাকার সুযোগ প্রদান করত না। এই কারণে তারা বারবার বিদ্রোহ করে পারসিকদের থাবা থেকে স্বাধীন হয়ে যেত।

ইসলাম আসার পর আরবের সকল গোত্র এক পতাকাতলে একত্র হয়। এর মাধ্যমে তারা একটি শক্তিশালী মজবুত ক্ষমতায় পরিণত হয়ে যায়। এই কারণে পারসিক সাম্রাজ্য আরবদের প্রতি একটু বেশি শঙ্কাবোধ করতে থাকে। আরবদের কিছু খ্রিষ্টান গোত্র ইরাকের সীমান্ত এলাকায়

বসবাস করত, তারা পারস্যের রাজদরবারে মুসলমানদেরকে একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে তুলে ধরতে থাকে। এই কারণে পারস্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুসলমানদের শক্তি টুকরো টুকরো করে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু সেসময় পারস্য সাম্রাজ্যকে চরম সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। এই কারণে পারস্যের সাংসদদের কারো বহির্বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ হচ্ছিল না।

পারস্যের বাদশাহ পারভেজের মৃত্যুর ফলে রাজনৈতিক চরম সংকট তৈরি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি ছিঁড়ে ফেলার কিছুদিন পর সে আপন ছেলে শেরওয়াইয়ের হাতে মৃত্যুবরণ করে। বিদ্রোহের আশংকা থেকে বাঁচার জন্য শেরওয়াই তার ভাইদেরও হত্যা করে ফেলে। এর ফলে সাসানি সাম্রাজ্য একচ্ছত্র উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নিঃস্ব হয়ে যায়। নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে এতসব প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই হতভাগা শেরওয়াইহ মাত্র আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় সে মাত্র সাত বছর বয়সি ছেলে আরদশির ব্যতীত কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেনি। তখন তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বয়স-স্বল্পতার কারণে সে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছিল না। এমনকি রাষ্ট্রের অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে গিয়েছিল যে, বিভিন্ন সময়ে হেরেমের নারীদের রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা করতে হচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষবছর থেকে নিয়ে সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিক রা. এর শাসনকাল পর্যন্ত পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভঙ্গুর ও করুণ ছিল। এসময় 'বুরান দুখত' এবং 'আরযামি দুখত' নামক দুই শাহজাদি রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থা এই ভঙ্গুর দশা থেকে আর বের হতে পারেনি।[৬৯]

মোটকথা, এসব কারণে পারস্য তখন পর্যন্ত আরব ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না। উপরন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মনে করতেন, যে শক্তি পারস্যের অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে তার গোটা আরবের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে বেশি

---

[৬৯] আখবারুত তিউয়াল, পৃষ্ঠা ১১১

বিলম্ব হবে না। এজন্য তিনি পূর্ব-সীমান্তের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন।

পারস্যের উপর আক্রমণের সুযোগ

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এ সময়ে ইরানে আপনা-আপনি এমন এক অবস্থা তৈরি হয়ে যায়, যার ফলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. প্রথমবারের মতো পারস্য-সীমান্তে আক্রমণের দ্বিধাহীন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিষয়টি হলো ইরাকের সীমান্ত এলাকায় কিছু আরবগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। শত শত বছর ধরে তারা পারসিকদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। তারা পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে পারসিকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এসব গোত্র ধর্মপরিচয়ে খ্রিষ্টান ছিল; কিন্তু তারা নিজেদের জন্মভূমিগত ব্যক্তিত্ববোধের কারণে পারসিকদের গোলামের জিঞ্জির চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। তারা আরবের সাথে মিলিত পারস্যের সীমান্তপ্রদেশ সাওয়াদে (ইরাক) বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিল। এসব গোত্রের মধ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে ওয়ায়েল গোত্রের নেতৃস্থানীয় মুসান্না বিন হারিসা শায়বানির প্রধান ভূমিকা ছিল। নবম হিজরিতে মদিনায় এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে পারসিকদের চৌকিতে গেরিলা হামলা করতে থাকেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তার এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত হলে তার খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করেন। লোকেরা বলে উনি হলেন মুসান্না বিন হারিসা। তিনি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং একজন প্রসিদ্ধ পরিচিত এবং উঁচুমাপের মানুষ।[৭০]

মুসান্না বিন হারিসা ভালোভাবেই জানতেন যে, পারস্যের সেনাবাহিনীতে এখন আগের মতো শৌর্য-বীর্য নেই। তিনি চিন্তা করলেন, যদি মদিনা থেকে মুজাহিদ বাহিনীর ব্যবস্থা হয় তা হলে পারস্য জয় করাটা বেশি কঠিন কিছু নয়। তাই তিনি নিজেই মদিনায় আসেন এবং খেলাফতের পক্ষ থেকে ইরাকে আক্রমণের অনুমতি গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তাকে সাহায্য করার জন্য কিছু মুজাহিদ পাঠানোর অনুরোধ করেন। হজরত

---

[৭০] ফুতুহুল বুলদান, ২৩৮; আল ইসতিয়াব, ৪/১৪৫৬, ১৪৫৭

আবু বকর সিদ্দিক রা. তার সাহায্যে ৮ হাজার মুজাহিদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি অনুভব করতে থাকেন যে, পারস্যের মতো এমন বিশাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একজন অসাধারণ সেনাপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন। তখন তার দৃষ্টি পুনরায় হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর উপর পড়ে। ইতিপূর্বে তিনি খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে অসাধারণ সফলতা অর্জন করে যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তখন তাকে ইরাকের দিকে মার্চ করার এবং মুসান্না বিন হারিসা রা. এর লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেন। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখন নিজের সাহায্যে কাউকে পাঠানোর আবেদন জানান। আবু বকর সিদ্দিক রা. তখন কা'কা বিন আমর রা. কে প্রেরণ করেন, যিনি যুদ্ধ এবং দূতালির ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তহীন ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা তখন আপত্তি জানালো যে, শুধু একজনকে পাঠালে কী লাভ হবে? আবু বকর সিদ্দিক রা. উত্তরে বলেন, 'তার মতো এক ব্যক্তি যেই বাহিনীতে থাকবে, সে বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।'[৭১]

ইরাকের উপর প্রথম আক্রমণেই সফলতার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনীর প্রয়োজন ছিল, যার দ্বারা মুসলমানদের শক্তির বিষয়টি তাদের জানা হয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আপন সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে যুদ্ধের একটি নকশা তৈরি করেন। পাশাপাশি তিনি ইয়াজ বিন গনাম রা. কে সৈন্যবাহিনী নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।[৭২]

পারসিকদের প্রতি পয়গাম

হেকমতে আমলি (তথা কৌশলগত দিক) বিবেচনায় এই সেনাদল পারস্যের উপসাগরের তীরবর্তী স্থান 'উবুল্লাহ'র নিকটে একত্র হন। তাদের একদিকে ছিল পারস্য, অপরদিকে ছিল আরব ভূখণ্ড আর

---

[৭১] আল কামিল ফিত তারিখ, ১২ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৭২] প্রাগুক্ত

তৃতীয়দিকে ছিল পারস্য উপসাগরের গভীর জল। উক্ত স্থান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেখানে অবস্থানকারী সৈন্যবাহিনী একইসঙ্গে ইরাক ও আরব-সীমান্তে আধিপত্য কায়েম করার পাশাপাশি চাইলে সমুদ্রপথে বিনাবাধায় হিন্দুস্থান যেতে পারে।

ইরাকের এই পয়েন্টটি পারস্যের গভর্নর হরমুজের শাসনাধীন ছিল, যার জুলুম-নির্যাতনের কারণে জনগণ অত্যন্ত পেরেশান ছিল। তারা এই কারণে তার উপর বিভিন্নভাবে বদদোয়া করত। মানুষের মধ্যে হরমুজ নামটি একটি গালির রূপ ধারণ করেছিল। 'হরমুজের চেয়ে বড় কাফের' শব্দটি কাউকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রবাদ হয়ে গিয়েছিল।[৭৩]

হজরত খালিদ রা. আসামাত্রই হরমুজকে চিঠি-মারফত জানিয়ে দেন যে, হয়তো তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে কিংবা জিজিয়া প্রদান করে আমাদের নিরাপত্তায় চলে আসতে হবে। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এমন এক সম্প্রদায় আসছে, যারা আল্লাহর পথে নিহত হতে এতটাই ভালোবাসে যেমনভাবে তোমরা মদ পান করতে ভালোবাসো।[৭৪]

অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ... যাতুস সালাসিল

হরমুজ এই চিঠিটি পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে পারস্য সম্রাট আরদশিরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এরপর সে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হয়। তার সাথে অত্যন্ত নামকরা প্রসিদ্ধ শাহজাদা ও পাহলোয়ান ছিল। যাতে করে পরাজিত হয়ে পলায়নের কোনো চিন্তা মাথায় না আসে এজন্য তারা সৈনিকদের সারিগুলোকে শেকল দ্বারা বেঁধে দেয়। এই কারণে যুদ্ধটিকে জাতুস সালাসিল তথা শেকলের যুদ্ধ বলা হয়।

যেহেতু এটি আরবের মুসলমান এবং অনারবের অগ্নিপূজকদের মধ্যে রীতিমতো প্রথম যুদ্ধ ছিল এজন্য বেশ ঘটা করে যুদ্ধের দামামা বাজানো হয়। তখন হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শত্রুর মনোবল চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য তরবারি কোষমুক্ত করে উভয় বাহিনীর মাঝখানে এসে

---

[৭৩] প্রাগুক্ত

[৭৪] তারিখুত তাবারি, ৩/৩৭০

দাঁড়ান। এরপর তিনি তাদেরকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকেন। মুসলমানদের প্রধান সেনাপতিকে তরবারি কোষমুক্ত করে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের সেনাপতি হরমুজ নিজের সম্প্রদায়ের সাহস ও উদ্দীপনা বাকি রাখার জন্য বাধ্য হয়ে ময়দানে নেমে আসে। কিন্তু সে নিজের সাথি-সঙ্গীদের বলে আসে যে, তারা সুযোগ পেলে সারি থেকে বের হয়ে যেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর উপর আক্রমণ করে বসে।

লড়াই শুরু হয়ে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এবং হরমুজ প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ঘোড়া চালিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। উভয়ের মধ্যে তরবারির মাধ্যমে তুমুল লড়াই চলে। একসময় হজরত খালিদ রা. হরমুজকে আয়ত্তে নিয়ে আসেন। এটা দেখামাত্র হরমুজের সাথিরা খালিদ রা. এর দিকে আক্রমণ করতে চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে ওই দিক থেকে কা'কা বিন আমর রা. আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেন। এর মধ্যেই হজরত খালিদ রা. হরমুজের খেল খতম করে দেন। ফলে পারসিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তাদের পাহলোয়ানরা নিজেদের শেকলগুলো ভেঙ্গে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে অসংখ্য সৈনিককে হত্যা করেন।

এটা ১২ হিজরির শুরুর দিকের ঘটনা। অনারব সীমান্তে অর্জিত এই প্রথম বিজয়ের সংবাদ ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ দরবারে খেলাফতে পাঠানো হয়।

ছান্নির যুদ্ধক্ষেত্র

এরই মধ্যে পারস্যের রাজদরবার থেকে নামকরা জেনারেল কারিন-এর কমান্ডে হরমুজের সাহায্যে একদল সেনা পাঠানো হয়। এই বাহিনী তখনও রাস্তায় ছিল। পথিমধ্যে তারা হরমুজের পরাজিত বাহিনীকে ফিরে আসতে দেখে। তারা তখন নিজেদের উপর আপতিত মহাবিপদের সংবাদ প্রদান করে। কারিন এটা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। সে ছান্নি নামক স্থানে ছাউনি স্থাপন করে। ওইদিকে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. নিজের বাহিনীকে অগ্রসর করে পারসিকদের উপর প্রবল আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ বাহিনী এক্ষেত্রেও ভালো করে

লড়াই করতে পারেনি। কারিন এতে নিহত হয়। তার ত্রিশ হাজার সৈন্য মৃত্যুর মুখে উপনীত হয়।[৭৫]

অলাজার যুদ্ধ

পারস্যের রাজদরবারে এ লজ্জাজনক পরাজয়ের সংবাদ পৌছলে আন্দারযাগর ও বাহমান জাদাবিয়া বিশাল সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধের জন্য বের হয়।

১২ হিজরির সফর মাসে অলাজা নামক স্থানে মুসলমান এবং অগ্নিপূজকদের মধ্যে প্রলয়ংকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. নিজ বাহিনীর কিছু অংশ রণাঙ্গনের পাশেই এক স্থানে লুকিয়ে রাখেন। যখন উভয়পক্ষ লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন মুসলমানদের আত্মগোপনে থাকা সেই তরতাজা বাহিনী হঠাৎ করে এসে পারসিকদের উপর প্রবল আক্রমণ করে বসে। পারসিকরা এ অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্‌বিদিক পলায়ন করতে থাকে। তাদের লিডার আন্দারযাগর পলায়ন করতে গিয়ে পিপাসার প্রচণ্ডতায় মৃত্যুবরণ করে।[৭৬]

আমগিশিয়ার গনিমত

ইরাক-সীমান্তে বসবাসকারী বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র ছিল আরব খ্রিষ্টান। তারা পারস্য সাম্রাজ্যের সমর্থক ছিল। অলাজার যুদ্ধে তারা পারসিকদের সাহায্য করেছিল। হজরত খালিদ রা. তাদেরকে উচিতশিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ফুরাত নদীর দিকে অগ্রসর হন। এসব আরব খ্রিষ্টান পারস্যের সিপাহসালার জাবানের বাহিনীতে যোগদান করে লড়াইয়ের জন্য বের হয়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শত্রুদের মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন। প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান যোদ্ধা মালেক বিন কায়েস তার মোকাবেলার জন্য বের হয়। সে হজরত খালিদ রা. এর হাতে মৃত্যুবরণ করে। এরপর ব্যাপক আকারে যুদ্ধ শুরু হয়। এতে ৭০ হাজার পারসিক এবং আরব খ্রিষ্টান নিহত হয়। তারা আমগিশিয়ায় তাঁবু গেড়েছিল। এখানেই তাদের রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্র,

---

[৭৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ১২ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৭৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১২ হিজরির অধীনে এ আলোচনাটি করা হয়েছে।

ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি ছিল। তারা সবকিছু রেখেই পলায়ন করে। হজরত খালিদ রা. তখন গনিমতের সম্পদ আয়ত্তে এনে তার এক-পঞ্চমাংশ মদিনায় পাঠিয়ে দেন। লোকেরা ধনসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার দেখে পেরেশান হয়ে যায়। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. অনায়াসেই বলে ওঠেন, কোনো মা খালিদের মতো বীর সন্তান জন্ম দিতে পারে না।[৭৭]

হিরা বিজয়

ফুরাত নদীর নিকটে আরব খ্রিষ্টানদের পুরাতন একটা কেন্দ্র ছিল। মুসলিমবাহিনী অগ্রসর হয় সেটা ঘেরাও করে। শহরের বাসিন্দারা তাদের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে যায়। তখন তারা নেতৃস্থানীয় আমর বিন আবদুল মাসিহকে সন্ধি বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য পাঠায়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাকে জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধ চাও নাকি শান্তি? সে বলল, শান্তি চাই।

আমর বিন আবদুল মাসিহের খাদেম নিজের সাথে কিছু বিষ নিয়ে এসেছিল। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা এনেছো কেন? সে উত্তর দেয়, যদি সন্ধির আলোচনায় আমি ব্যর্থ হয়ে যাই তা হলে আমি নিজ সম্প্রদায়কে কীভাবে মুখ দেখাবো? তার চেয়ে বিষ পান করে মরে যাওয়াই ভালো!

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সেই থলের বিষ নিজের হাতে ঢেলে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সময় না হবে ততক্ষণ মৃত্যু হবে না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে সেই বিষ পান করে ফেলেন। কিন্তু এতে তার কোনোই ক্ষতি হয়নি।

> بسم الله خير الأسماء، رب الارض والسماء، الذي ليس يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم
>
> সর্বোত্তম নামের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার নামে পান করছি, যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, যার অনুমতি ব্যতীত কোনো রোগ ক্ষতি করতে পারে না, যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

---

[৭৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ১২ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে। তারিখে ইবনে খালদুন, ২/৫১০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫২২

আমর বিন আবদুল মাসিহ এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। সে বলে ওঠে, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে তোমার মতো ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবে ততদিন তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

মোটকথা হিরাবাসী বার্ষিক ১ লক্ষ ৯০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

এটি ১২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। মুসলমানরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে অত্যন্ত উদার ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করেন। মুসলমানদের আচার-ব্যবহার দেখে আশপাশের জমিদার এবং নেতৃস্থানীয়রা জিজিয়া দিয়ে মুসলমানদের অধীনে থাকার পথ গ্রহণ করে নেয়।[৭৮]

আইনে তামারের যুদ্ধক্ষেত্র

গৃহযুদ্ধে লিপ্ত পারসিক রাজনীতিকরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত থাকলেও মুসলমানদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সকলেই একজোট ছিল। সাম্রাজ্য সংরক্ষণের জন্য তারা অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তারা নিজেদের সিপাহসালার বাহমান জাদাবিয়াকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অযোগ্য মনে করে তাকে বরখাস্ত করে। তার পরিবর্তে বিহরাম চোবিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেহরাম চোবিঁ মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আপন ছেলে মিহরানকে সৈন্য দিয়ে পাঠায়। সে ইরাকের উত্তর দিকে আইনে তামারে শিবির স্থাপন করে। তার সাহায্যের জন্য খ্রিষ্টান আরব সরদার উকবা বিন আবু উকবা আপন গোত্রের সৈন্যদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখন উত্তর দিকে অগ্রসর হন। তিনি বিশাল রাস্তা অতিক্রম করে শত্রুর মোকাবেলায় আইনে তামারে পৌঁছেন।

যুদ্ধ শুরু হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. নিজেই খ্রিষ্টান সরদার উকবাকে আক্রমণ করেন। তখনই তার খেল খতম করে দেন। এটা দেখে শত্রুরা স্থির থাকতে পারেনি। তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য পালিয়ে একটি দুর্গে

---

[৭৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫২২, ৫২৩

আশ্রয় নেয়। তাদের সেনাপতি মিহরান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। হজরত খালিদ রা. তখন দুর্গটি অবরোধ করেন। শক্তি ব্যয় করে তা জয় করে নেন। শত্রুদের পরাজিত করেন।[৭৯]

দাওমাতুল জানদালে খালিদ বিন ওয়ালিদ

এরই মধ্যে আরব ভূখণ্ডের উত্তর দিকে দাওমাতুল জানদালে আরব খ্রিষ্টান গোত্র বনু গাসসান, বনু তানুখ, বনু কালব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাকে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাদের দমন করার জন্য হজরত ইয়াজ বিন গনাম রা. কে পাঠান। তিনি একা যখন তাদের কাবু করতে পারছিলেন না তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন।

হজরত খালিদ রা. কালক্ষেপণ না করে সেখানে পৌঁছে যান। খ্রিষ্টান আরবরা তাকে আসতে দেখে ঘাবড়ে যায়। তাদের সরদার উকাইদির বিন মালিক তাবুকের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করেছিল; তাই সে নিজ সম্প্রদায়কে সন্ধি করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু খ্রিষ্টান গোত্রগুলো লড়াই করেই মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী ছিল।

উকাইদির বিন মালিক তার সম্প্রদায়ের এই অবস্থা দেখে একাকী একদিকে চলে যেতে শুরু করে। কিন্তু রাস্তায় এক মুসলমানের হাতে সে মারা যায়। ওইদিকে আরব খ্রিষ্টান সরদার জুদি বিন রবিয়া এ সকল সম্প্রদায়কে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এবং ইয়াজ বিন গনামের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে বের হয়।

ঘোরতর যুদ্ধের পর খ্রিষ্টানদের উভয় দল পরাজিত হয়। জুদি গ্রেফতার হয়। অবশিষ্ট খ্রিষ্টান পিছু হটে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। হজরত খালিদ রা. তরবারির মাধ্যমে এই দুর্গ বিজয় করে দম নেন। এর মাধ্যমে তিনি আরব খ্রিষ্টানদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।[৮০]

---

[৭৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ১২ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৮০] তারিখে ইবনে খালদুন, ২/৫১২

ফিরাজের যুদ্ধ

এরপর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. পুনরায় হিরায় চলে আসেন। সেখানে অনারব রাজনীতিক এবং আরব খ্রিষ্টান সরদাররা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে তোলে। হজরত খালিদ রা. মুসাইয়া, ছান্নি ও যুমাইলের ময়দানে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন।

ফিরাজ অঞ্চলটি শাম, ইরাক এবং হিরার মিলনস্থল হওয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তা বিজয় করার জন্য ১২ হিজরির জিলকদ মাসে হজরত খালিদ রা. সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। শামের রোমান, ইরাকের অনারব এবং হিরার খ্রিষ্টান গোত্রগুলো কেউই এই অঞ্চলটি মুসলমানদের কব্জায় চলে যাওয়াটা সহ্য করতে পারছিল না। এই কারণে ইসলামি বাহিনী এসে পৌঁছলে পারস্য এবং আরব খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। উভয় বাহিনীর মধ্যে শুধু ফুরাত নদী প্রতিবন্ধক ছিল।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. প্রতিপক্ষকে নদী পার হওয়ার সুযোগ প্রদান করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী মনোবল হারিয়ে ফেলে। পলায়নের সময় তাদের সামনে ফুরাত নদীর ঢেউ ব্যতীত কোনো রাস্তা ছিল না। ফলে সম্মিলিত বাহিনীর প্রায় সকলেই মারা যায়। সংখ্যাটা ছিল প্রায় ১ লক্ষ।[৮১]

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর হজ এবং আবু বকর রা. এর সতর্কবার্তা

এই বিশাল বিজয় অর্জনের পর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর মনে হঠাৎ বাইতুল্লাহ হজের আগ্রহ প্রবল রূপ ধারণ করে। এতে শুধু দুই সপ্তাহ কাটান। তার অনুপস্থিতিতে যেহেতু সৈন্যদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে এই কারণে তিনি কারো নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি বরং বেশ গোপনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আরব মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মক্কা পৌঁছে যান। এরপর তিনি হজ সম্পন্ন করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইরাক এসে পৌঁছেন। কেউই তার এই হজযাত্রার কথা জানতে পারেনি।

---

[৮১] তারিখে ইবনে খালদুন, ২/৫১৩, ৫১৪

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. নিজেও এ বছর হজে গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনিও খালিদ রা. এর আগমন সম্পর্কে জানতেন না। মদিনায় পৌঁছে যখন তিনি বিষয়টি জানতে পারেন তখন খালিদ রা. কে এক চিঠিতে বলেন, 'সাবধান ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো ঝুঁকি না নেওয়া উচিত। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তোমার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রবৃত্তি সৃষ্টি না হয়। অন্যথায় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। নিজের কোনো কীর্তির ব্যাপারে গর্ব না করা উচিত। কেননা এগুলো আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। তিনিই সর্বোত্তম প্রতিদান দানকারী।'

এরপর তিনি হজরত খালিদ রা. কে তৎক্ষণাৎ ইরাক ছেড়ে শামের সীমান্তে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা এখন সেখানে তুমুল যুদ্ধের সময় চলে এসেছে। এখন তার সেখানে ভীষণ প্রয়োজন।[৮২]

---

[৮২] আল মুনতাযাম, ৪/১১১

রোমান সাম্রাজ্য

শাম রোমক বাদশাহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ ছিল। এখানে খ্রিষ্টানদের স্থাপনা ছিল। পারসিকদের মতো রোমানরাও আরবদের প্রতি প্রচণ্ড দুশমনি রাখত। তবে শত্রুতার ক্ষেত্রে পারসিকদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান অধিক ছিল। পক্ষান্তরে রোমানদের শত্রুতায় ধর্মীয় অনুভূতির পরিমাণ বেশি ছিল। ইসলামের পূর্বে ইয়েমেনের খ্রিষ্টান শাসক আবরাহা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তি বলেই কাবার পরিবর্তে একটি গির্জা নির্মাণ করেছিল। সেখানে আরবদের হজ করতে আসার প্রতি সে আহ্বান জানিয়েছিল। আরবরা এটাকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো।

আরবরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে একটি শক্তিশালী সুশৃঙ্খল শক্তির রূপ ধারণ করে তখন বাইজেন্টাইন রোমানদের প্রবল আশঙ্কা হতে থাকে যে, ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণের সামনে খ্রিষ্টবাদের কৃত্রিম চমক উবে যেতে পারে। আশঙ্কা হচ্ছিল যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা বিশ্বে যেকোনো সময় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন খ্রিষ্টবাদ একটি বিস্মৃত দাস্তানে পরিণত হয়ে যাবে। এ কারণেই শামের খ্রিষ্টানরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছিল। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হজরত হারিস বিন আমর রা. কে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এই বাহিনী মুতায় পৌছে মাথায় কাপড় বেঁধে পাষাণ-দিল রোমানদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। পরবর্তীতে এ বিষয়টির পূর্ণতাদানের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষদিকে এসে হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন।

এ ছাড়াও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরিতে রোমানদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বশেষ জিহাদি সফর করেছিলেন। তিনি আরব এবং শামের সীমান্ত এলাকা তাবুকে ইসলামি ঝান্ডা গেড়ে রেখেছিলেন।

রোমানরা ইসলামকে নিজেদের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে আরবদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শুধু ধারাবাহিক প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি; বরং সে সময়ে ইরাক-সীমান্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইকারী আরব খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রোমানরা ফিরাজের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিল।

এসব পরিস্থিতির কারণে রোমানদের শক্তিমত্তার অহমিকা সর্বদার জন্য চূর্ণ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার মাধ্যমে এশিয়ার লক্ষ লক্ষ অসহায় এবং নিগৃহীত মানুষকে তাদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করা যাবে। ইনসাফপূর্ণ ধর্ম—ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো এই অত্যাচারী সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তা চূর্ণ করে দেওয়া যাবে।

রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ

এত বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. শামের দিকে প্রেরিত বাহিনীগুলোকে বেশিদূর পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেননি। শামের সীমান্তে হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আবু বকর রা. তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করলেও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অবিবেচনাপ্রসূত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. সে নির্দেশনা অনুযায়ী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। রোমানরা ইতিপূর্বে

বাহানের নেতৃত্বে প্রস্তুতি নিয়ে চলে এসেছিল। হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেন। কিন্তু রোমানদের সামরিক শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এজন্য হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. দরবারে খেলাফতে আরো অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করার আবেদন করেন।[৮৩]

নতুন বাহিনী বিন্যস্তকরণ

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিষয়টিকে অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করেন। তিনি তখন ইয়েমেন, তিহামা, ওমান, বাহরাইন থেকে স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদেরকে হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেলের নেতৃত্বে একত্র করে তৎক্ষণাৎ শামের দিকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এতেই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়নি। সেখানে একটি বিশাল বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। যার প্রস্তুতি এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামই একমাত্র উপযুক্ত ছিলেন। তাই হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে জাকাতের দায়িত্ব পালনকারী হজরত আমর ইবনুল আসকে এই জাকাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বলেন। হজরত আমর ইবনুল আস রা. প্রতিউত্তরে বলেন, 'আমি হলাম ইসলামের জন্য নিবেদিত একটি তির, যার পরিচালনাকারী আপনি। যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক ক্ষেত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেখানে অধিক সাওয়াব ও পুণ্য অর্জনের আশা রয়েছে, আপনি আমাকে সেখানে নিয়োগ করুন।'

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তার এই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। একটি নতুন বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য তাকে স্বেচ্ছাসেবক তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করেন। একটি বিশাল বাহিনী তৈরি হলে তাকে তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত করেন। একটির সিপাহসালার বানানো হয় হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে। তাকে ফিলিস্তিন অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়

---

[৮৩] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয় হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে। তাকে জর্দান-অভিমুখে পাঠানো হয়।[৮৪]

ঐতিহাসিক অসিয়ত

তৃতীয় বাহিনীটি ছিল সবচেয়ে বড়। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বড় ভাই হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর নেতৃত্বে তা সোপর্দ করা হয়। এই বাহিনীকে আবু বকর রা. অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিদায় জানান। বিদায় দেওয়ার জন্য তিনি তাদের সাথে পায়ে হেঁটে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এই বাহিনীর আমিরকে তিনি ঐতিহাসিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বলেন, 'আমি তোমাকে এজন্য নেতৃত্ব প্রদান করেছি, যাতে তোমার পরীক্ষা হতে পারে এবং তোমার যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। যদি তুমি সাফল্য প্রদর্শন করতে পারো তা হলে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে আর যদি ভালোভাবে দায়িত্ব পালন না করো, তা হলে তোমাকে পদচ্যুত করা হবে। আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। তিনি তোমার বাহ্যিক বিষয় যেমন জানেন, তেমনি গোপন বিষয়সমূহ জানেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক রাখে, সেই আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি নিজের আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বেশি থেকে বেশি নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম। সাবধান! জাহেলি গোত্রপ্রীতি থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের গোত্রপ্রীতি ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব অপছন্দ করেন। সৈনিকদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। তাদেরকে ভালো আশা প্রদান করবে। যখন তাদেরকে উপদেশ দেবে তখন অল্প কথায় তা শেষ করে দেবে। কেননা দীর্ঘ আলোচনার খুব সামান্য অংশই স্মরণ থাকে। নিজেকে ভালো মানিয়ে নাও তা হলে লোকেরাও তোমার সাথে ভালো আচরণ করবে। ওয়াক্ত মতো পূর্ণ আদব বজায়ে রেখে খুশুর মাধ্যমে নামাজ আদায় করবে। প্রতিপক্ষের দূতদের সম্মান করবে। তাদেরকে দীর্ঘ সময় তোমার নিকট অবস্থানের সুযোগ দেবে না। অন্যথায় তারা তোমার ভেদ জেনে যাবে।

---

[৮৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

নিজের গোপন বিষয় প্রকাশ হতে দেবে না। অন্যথায় গোটা ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। পরামর্শের সময় সত্য বলবে। যাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে তাদের নিকট কোনো বিষয় গোপন রাখবে না। পাহারাদারির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করবে। সৈন্যদের অবস্থাদি থেকে কখনো উদাসীন থাকবে না। কিন্তু তাদের গোপন বিষয় তালাশের পেছনে পড়বে না। সত্য, কল্যাণকামী ও বিশ্বস্ত মানুষদের সাথে ওঠাবসা করবে। কখনো ভীরুতা প্রদর্শন করবে না। অন্যথায় তোমার সৈনিকরা ভীরু হয়ে যাবে। শত্রু-শিবিরের যেসব লোক উপাসনালয়ে নিজেদের ওঠাবসা সীমাবদ্ধ রাখবে, তাদের উপর আক্রমণ করবে না।[৮৫]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর উপদেশসমূহ যেকোনো দীনি দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার মর্যাদার রাখে।

পরাজয় এবং নতুন কর্মপন্থা

হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. সীমান্তে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখনই তিনি ইসলামি বাহিনীর রওনা হওয়ার সংবাদ জানতে পারেন তখন তিনি শামের সীমান্তে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেন। তিনি ফিলিস্তিনের 'মারজুস সুফফার' নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে রোমান জেনারেল বাহান এক শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে প্রস্তুত ছিল। সে তার বাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদের ঘেরাও করে তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। ফলে হজরত খালিদ বিন সাইদ রা. এর বাহিনী বড়ধরনের পরাজয়ের সম্মুখীন হন। তার ছেলেসহ বহু সংখ্যক মুসলমান শহিদ হয়ে যান। হজরত সাঈদ রা. কিছু সংখ্যক সাথিসহ নিরাপদে প্রাণ নিয়ে বের হতে সক্ষম হন। তারা সোজা মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাকে মদিনায় রেখে শুরাহবিল বিন হাসানা, আবু সুফিয়ান এবং হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো অভিজ্ঞ সাহাবিকে শামের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে তিনি হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেল রা. এবং হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর নেতৃত্বে সাহায্যকারী বাহিনী

---

[৮৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠিয়েছিলেন। তারা ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।[৮৬] যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী এই তরতাজা উদ্যমী বাহিনী শামের সীমান্ত অতিক্রম করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকে। হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. জাবিয়া নামক স্থানে, এবং হজরত আবু ইয়াজিদ বিন সুফিয়ান বালকা নামক স্থানে, হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা জর্দানে শিবির স্থাপন করেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাত হাজার করে সৈন্য ছিল। এভাবে মুসলিমবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একুশ হাজার।

রোমান বাদশাহ হিরাক্লিয়াস যখন মুসলমানদের এই সুবিন্যস্ত অভিযান সম্পর্কে অবগত হয়, তৎক্ষণাৎ সে মার্চ করে রাজধানী হিমসে পৌঁছে যায়। এখান থেকে সে প্রত্যেক মুসলিমবাহিনীর মোকাবেলায় ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠায়, যাতে করে মুসলমানরা একস্থানে একত্র হয়ে হামলা করতে না পারে, এজন্য সে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এর মোকাবেলায় আসা রোমান সেনাবাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ছিল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল ফাইকার নামের এক সেনা-অফিসার। অন্যদিকে হিরাক্লিয়াসের দুধভাই তাজারিক ৯০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মোকাবেলায় এগিয়ে যায়।

মুসলমান সেনাপতিগণ এই অবস্থা দেখে চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরস্পর পরামর্শ করেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, মুসলমানরা সকলেই একস্থানে একত্র হয়ে যাবেন এবং দরবারে খেলাফত থেকে অধিক সাহায্যের আবেদন করবেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাদেরকে পিছু এসে ইয়ারমুকের কিনারায় পানিপূর্ণ জায়গায় শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন।[৮৭]

শাম অভিমুখে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.

এই সময় খলিফার পক্ষ থেকে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে ইরাকের দায়িত্ব মুসান্না বিন হারিসার নিকট সোপর্দ করে অতি দ্রুত অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শামে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৮৮]

---

[৮৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

[৮৭] তারিখুত তাবারি, ৩/৩৯২

[৮৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

শাম-সীমান্ত তখন যুদ্ধের কালো মেঘমালায় ছেয়ে গিয়েছিল। রোমান সৈন্যরা প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করছিল। এই অবস্থায় হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর জন্য তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে শামে পৌঁছা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তলোয়ার ছিলেন। উদ্দেশ্য অর্জনে বিমুখ হতে জানতেন না। ইরাকের অর্ধেক সৈন্য— ৯ হাজার মুজাহিদ নিয়ে হিরা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে মার্চ করেন। পানি, গাছপালা ও তরুলতাবিহীন মরুভূমিতে পথচলা শুরু করেন, যা অতিক্রম করা ছিল কল্পনা এবং ধারণার বাইরে। এই মরুভূমিটি কুরাকির থেকে সুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে রোমান সৈন্যরা বিন্যস্ত হয়ে অবস্থান করছিল। মরুভূমিতে কোনো ধরনের ঝরনা বা বৃক্ষ কিছুই ছিল না।

বনু তায়ি গোত্রের হজরত রাফে বিন উমাইরা রা. কে খালিদ বিন ওয়ালিদ পথপ্রদর্শক বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী একাকী চলেও এই মরুভূমি সহজে পাড়ি দিতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে বিশাল বাহিনী নিয়ে এই পথ অতিক্রম করবেন?!

হজরত খালিদ বলেন, আমাকে এই পথ দিয়েই অতিক্রম করতে হবে। রোমানদের আক্রমণের মুখে সাহায্যের জন্য অপেক্ষমাণ মুসলমানদের নিকট পৌঁছতে এর বিকল্প নেই।[৮৯]

মরুভূমি : পিপাসা এবং একটি ঝরনা

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বাহনজন্তুগুলোকে ভালো করে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করে নেওয়ার এবং যথাসম্ভব নিজেদের সাথে পানি নিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মরুভূমির কষ্টদায়ক সফর শুরু হয়ে যায়। ভীষণ গরম এবং প্রচণ্ড পিপাসায় এক সময় পানি শেষ হয়ে আসে। পিপাসায় কাতর হয়ে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উটগুলো জবাই করে তাদের কুঁজে বিদ্যমান পানি ঘোড়াগুলোকে পান করানো হয়। পঞ্চম দিনে কাফেলাবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়। রাহবার হজরত রাফে বিন উমাইরা অসুস্থতার কারণে

---

[৮৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

চোখে যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। কিন্তু তবু তিনি কষ্ট করে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে রাস্তা খুঁজে ফিরছিলেন। পরিশেষে তিনি কাফেলাকে এক দিকে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ তো কোথাও এমন কোনো গাছ দেখা যায় কিনা, যা দেখতে একজন উপবিষ্ট মানুষের মতো মনে হয়? তারা উত্তর দেন, না, এমন কিছু দেখা যায় না।

তিনি তখন বলেন, তা হলে তো তোমরাও খতম হয়ে যাবে আমিও খতম হয়ে যাবো। দেখো, তোমরা পুনরায় বেশ মনোযোগের সাথে একটু দেখো।

তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে ওঠে, হ্যাঁ, এখানে একটি কর্তিত গাছ দেখা যাচ্ছে।

তখন হজরত রাফে রা. সেখানে গিয়ে বলেন, গাছের গোড়ায় তোমরা গর্ত খনন করো।

গর্ত করলে একটি প্রবাহিত ঝরনা বের হয়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যান। অবাক হন যে, রাফে কীভাবে এখানে পানি থাকার অনুমান করতে পারলো?!

জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি শুধু একবার সেই ছোট্ট কালে মাতা-পিতার সাথে এ রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম। তখন এই গাছের নিকট একটি প্রবাহিত ঝরনা ছিল।

কাফেলাবাসী পরিতৃপ্তি সহকারে পানি পান করে সামনে পথ চলতে থাকেন। পঞ্চম দিন তারা সহিহ সালামতে মৃত্যুর উপত্যকা থেকে বের হয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে শামের সীমান্তে প্রবেশ করেন। শত্রুরা তাদের আগমনের ব্যাপারে মোটেই টের পায়নি।[৯০]

বুসরা বিজয়

শামে পৌঁছা মাত্রই হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলমানদের বড় ধরনের দুর্বলতা অনুভব করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, এখন পর্যন্ত তারা কোনো শহর বা দুর্গ জয় করেনি। তিনি বুঝতে পারলেন যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কোনো দেয়াল-ঘেরা শহর

[৯০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

আয়ত্তে না আসবে ততক্ষণ শামে পা স্থির করাটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি যাত্রাপথে অবস্থিত প্রথম শহর- বুসরায় শিবির স্থাপন করেন। এরই মধ্যে অন্যান্য মুসলিমবাহিনীর সেনাপতিগণ সাহায্য নিয়ে পৌঁছে যান। শহরবাসীরা জিজিয়া দেওয়ার শর্তে তরবারি ফেলে দেয়। এভাবে শহরটি সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়।[৯১]

আজনাদাইনের যুদ্ধ

এরপর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ-সহ অন্যান্য মুসলিম আমিরগণ আজনাদাইন-অভিমুখে যাত্রা করেন, যেখানে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মোকাবেলার জন্য হিরাক্লিয়াসের ভাই ৯০ হাজার যোদ্ধার সাথে অবস্থান করছিল। এই স্থানটি ফিলিস্তিনের রামাল্লা এবং বাইতে জিবরিনের মাঝামাঝি অবস্থিত।

যুদ্ধের পূর্বে রোমান সিপাহসালার এক আরব গুপ্তচরকে মুসলমানদের শিবিরে পাঠায়। ফিরে এসে সে রিপোর্ট পেশ করে,

بالليل رهبان وبالنهار فرسان

> তারা রাত কাটায় ইবাদত-উপাসনা করে আর দিন গুজরান করে অশ্বপিঠে যুদ্ধ করে।

পাশাপাশি সে এটাও বলে যে, তারা নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতি এতটাই যত্নবান যে, যদি তাদের শাসকের ছেলেও চুরি করে তবু তার হাত কেটে ফেলা হয়। যদি সে অপকর্ম করে, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

এটা শুনে রোমান সেনাপতি বলে, 'তা হলে তো তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে জমিনে জিন্দা দাফন হয়ে যাওয়াটাই উত্তম। হায়, যদি আমাকে তাদের সাথে লড়াই করতে না হতো!'

অবশেষে ১৩ হিজরির সাতাইশে জুমাদাল উলা আজনাদাইনের ময়দানে এক প্রলয়ংকরী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম আমিরগণ একমত হয়ে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করেন। হজরত আমর ইবনুল আস, হজরত ইয়াজিদ বিন সুফিয়ান, হজরত

---

[৯১] তারিখুত তাবারি, ২/৪১৭

শুরাহবিল বিন হাসানা, হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ-সহ সকলেই তার কমান্ডে থেকে যুদ্ধ করছিলেন।[৯২]

পরিশেষে রোমানরা পরাজিত হয়। হিরাক্লিয়াসের ভাই তাজারিক নিহত হয়। যুদ্ধের ময়দান মুসলমানদের হাতে থাকে।[৯৩]

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রোমানদেরকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেননি। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গোটা বাহিনী নিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। এভাবে তিনি ইয়ারমুক পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখানে হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত ছিল, যাদের সাথে লড়াই করাটা ছিল অসম্ভবপ্রায়।[৯৪]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যু

ইয়ারমুকের ময়দানে দুই বাহিনীর মধ্যকার তুমুল লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বেই মদিনায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ইনতেকাল হয়ে যায়। তিনি ৬৩ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এর ঠিক এক বছর পূর্বে তিনি এবং আরবের প্রসিদ্ধ ডাক্তার হারিস বিন কালাদা একসঙ্গে খানা খেতে বসেছিলেন। দস্তরখানে খানা প্রস্তুত ছিল। হারিস এক লোকমা গেলামাত্রই বলে ওঠে, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, খাবার থেকে হাত উঠিয়ে ফেলুন। এতে বিশেষ ধরনের বিষ মেশানো আছে, ঠিক এক বছর পর যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়।

ইতিহাসে এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, কে এই বিষ মেশানোর দুরভিসন্ধি এঁটেছিল। আল্লামা ইবনুল আসির বলেন, ইহুদিরা বিষ মিশিয়েছিল। কিন্তু এটা জানা যায় না যে, কবে কীভাবে তারা খলিফাতুল মুসলিমিনের খাবারে বিষ মেশালো? আর কীভাবেই-বা তারা সফল হলো? আর এই দুরভিসন্ধিকারী ইহুদির পরিচয়ই-বা কী? এখানে এসব

---

[৯২] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছ। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৫২

[৯৩] তারিখে ইবনে খালদুন, ২/৫১৭

[৯৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। যাই হোক, যেসব ইহুদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষযুক্ত খাবার খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিল, তারা কীভাবে আল্লাহর রাসুলের খলিফার ক্ষেত্রে এ ধরনের দুরভিসন্ধি আঁটতে পিছিয়ে যাবে?!

বিষের ক্রিয়ায় হারিস বিন কালাদা এক বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। এবং ঠিক সেদিনই হজরত আবু বকর রা. এর ইনতেকাল হয়।[৯৫]

স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ নিয়ে পরামর্শ

নিজের মৃত্যুর বিষয়টি অতি নিকটে অনুভব করার পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ ও উসমান রা. কে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন। তিনি স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তার মাথায় পূর্ব থেকেই হজরত উমর রা. এর নাম ছিল। আর হজরত উমর রা. নিঃসন্দেহে এই দায়িত্বের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন উমরের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী?

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. উত্তর দেন, তার ফজিলত এবং যোগ্যতার ব্যাপারে তো কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার স্বভাব কিছুটা রুক্ষ।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, যেহেতু আমি নরম এজন্য তার মধ্যে কঠোরতা রয়েছে। যখন তার কাঁধে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তখন সে নিজে নিজেই নরম হয়ে যাবে। আমি কয়েকবার দেখেছি, যখন আমি কারো প্রতি রাগান্বিত হই তখন সে আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে তোলে আর যখন আমি কোনো বিষয়ে নম্রতার পথ অবলম্বন করি তখন তাকে কঠোর স্বভাবে অবতীর্ণ হতে দেখি।

হজরত তালহা রা. নিজের মত প্রকাশ করে বলেন, এখন হজরত উমরকে খলিফা বানানো হচ্ছে; অথচ লোকদের সাথে তার আচার-আচরণের কঠোরতার ব্যাপারে আপনার জানা রয়েছে।

---

[৯৫] তারিখুল খুলাফা, ৬৫

আবু বকর সিদ্দিক রা. তখন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেন, হ্যাঁ, যখন আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তখন বলতে পারব আমি আপনার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে খলিফা বানিয়ে এসেছি।

উসমান রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তার মতো উত্তম ব্যক্তি আমাদের মধ্যে কেউ নেই।

তাদের সাথে আলোচনার পর তিনি হজরত উসমান রা. কে অসিয়তনামা লেখার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি ততক্ষণে শুধু এতটুকই লিখেছেন যে, 'আবু বকর বিন কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অসিয়ত'। এটা লেখামাত্রই হজরত আবু বকর রা. অজ্ঞান হয়ে যান।

হজরত উসমান রা. জানতেন যে, আবু বকর রা. হজরত উমর রা. কে খলিফা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তিনি হয়রান হয়ে যাচ্ছিলেন যে, না জানি অজ্ঞান অবস্থায়ই খলিফার মৃত্যু হয়ে যায়! তখন অসিয়তনামা অপূর্ণ থেকে যাওয়ার কারণে খেলাফতের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে যেতে পারে। তাই তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকেই সামনের অংশটুকু লিখে দেন-'আমি তোমাদের জন্য উমরকে খলিফা হিসাবে নির্ধারণ করেছি। আমি তোমাদের কল্যাণে কোনো ধরনের ক্রুটি করিনি।'

কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী লিখেছ?

হজরত উসমান রা. লিখিত অংশটুকু পড়ে শোনান। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, আল্লাহু আকবার।

এরপর তার বিচক্ষণতার প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।[৯৬]

হজরত উমর ফারুক রা. কে বিশেষ অসিয়ত

এরপর তিনি হজরত উমর ফারুক রা. কে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে রাসুল সা. এর সাহাবিদের জন্য খলিফা বানিয়ে যাচ্ছি।

---

[৯৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর তিনি তাকে খেলাফতের দায়িত্বের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, হে উমর, আল্লাহর কিছু হক রাতে আদায় করতে হয় আর কিছু হক দিনে আদায় করতে হয়। রাতের হকসমূহ তিনি দিনে কবুল করেন না আর দিনেরটা রাতে কবুল করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আদায় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নফল কবুল করেন না।

যেহেতু উমর রা. এর গাম্ভীর্যের কারণে কতক সাহাবি অনুপযুক্ত স্থানে তার কঠোরতার আশঙ্কা করতেন এজন্য তিনি তাকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে বিশেষভাবে অসিয়ত করে বলেন, 'উমর, তুমি কি লক্ষ করোনি যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে কঠোরতার সাথে নম্রতার, আজাবের সাথে রহমতের আলোচনা করেছেন? তিনি এমন করেছেন, যাতে করে বান্দারা রহমতের প্রতি আশাবাদী হওয়ার পাশাপাশি শাস্তির কারণে ভীত থাকে। এবং যাতে করে কেউ আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণবশত নিজের হকের চেয়ে বেশি আশা পোষণ না করে। আবার সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যেন ধ্বংস না হয়ে যায়।'

এরপর নিজের অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'উমর, তুমি কি লক্ষ করে দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা মন্দ আমলের পাশাপাশি জাহান্নামিদের আলোচনা করেছেন। এগুলো তেলাওয়াত করে আমার ভয় হয়, না জানি আমি তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাই। আবার আল্লাহ তায়ালা উত্তম আমলের সাথে জান্নাতিদের আলোচনা করেছেন। সেগুলো পড়ে আমি কল্পনা করি কীভাবে তাদের সঙ্গে আমি আনন্দ করতে থাকবো! উমর তুমি যদি আমার এই কথাগুলো স্মরণ রাখো, তা হলে এই দৃশ্যমান জগতের পরিবর্তে অদৃশ্য জগৎ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয় হবে এবং নিশ্চিতভাবেই তুমি এটি করতে পারবে।'[৯৭]

এই সকল নসিহত ও অসিয়ত করার পর মঙ্গলবার ২২ জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরিতে মুসলিম উম্মাহর এই হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক—যার অন্তরের প্রতিটি নড়াচড়া পরম প্রিয় বন্ধুর দীনের মর্যাদা উঁচু করার জন্য

---

[৯৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ওয়াকফ ছিল—মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে সমাহিত হন।[৯৮]

আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ব্যক্তিত্বের এক ঝলক

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত নিকটবর্তী ছিলেন। এটি একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্য কেউ এক্ষেত্রে তার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু দানশীল এবং নিষ্কলুষ মেজাজের অধিকারী ছিলেন।

ইবরাহিম নাখায়ি তার ব্যাপারে বলেন, হজরত আবু বকর রা. কে নম্রতা ও কোমল হৃদয়ের কারণে তাকে 'আউওয়াহ' (বেশি আহাজারিকারী) বলা হতো।[৯৯]

তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত। জাহিলি যুগে তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। কখনো মদ স্পর্শ করেননি।[১০০]

গরমের দিন তিনি বেশি বেশি রোজা রাখতেন।[১০১]

এই কারণে তার দেহে চর্বির নামনিশানা পর্যন্ত ছিল না। তিনি বেশ শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন।[১০২]

পেশায় তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলামের জন্য অনেক বেশি পরিমাণে ব্যয় করতেন। খলিফা হওয়ার পর সমস্ত টাকা বাইতুল-মালে জমা করে দেন।[১০৩]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কিছু ফজিলত

নিম্নোক্ত কথার মাধ্যমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মর্যাদা অনুমান করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

---

[৯৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

[৯৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৭১

[১০০] তারিখুল খুলাফা, ২৯

[১০১] আহমদ বিন হামবল কৃত আয-যুহদ, হাদিস নং ৫৮৫

[১০২] তারিখুত তাবারি, ৩/৪২৪

[১০৩] জাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম, ৩/১১৩

ما لِأَحَدٍ عندنا يدٌ إلا وقد كافَيْناه ما خلا أبا بكرٍ فإن له عندَنا يدًا يُكافِيهِ اللهُ بها يومَ القيامةِ

আমি আবু বকর ব্যতীত প্রত্যেকের সদাচরণের প্রতিদান আদায় করে দিয়েছি। আমার উপর তার এত বেশি এহসান যে, তার বদলা আল্লাহ তায়ালা নিজেই কেয়ামতের দিন প্রদান করবেন।[১০৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? তিনি বলেন, আয়েশাকে। এরপর জিজ্ঞেস করা হয় পুরুষদের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন, আয়েশার পিতা আবু বকর।[১০৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

ولو كنتُ مُتَخِذًا خليلًا لاتخَذْتُ أبا بكرٍ خليلًا

যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম, আবু বকরকেই বানাতাম।[১০৬]

একবার তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আমার সঙ্গে থেকেছে এবং আমার জন্য সবচেয়ে বেশি নিজের সম্পদ ব্যয় করেছে, সে আবু বকর। যদি আমি কাউকে মাহবুব বানাতাম তা হলে অবশ্যই আবু বকরকে বানাতাম। তবে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধই যথেষ্ট।[১০৭]

সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হলেন গোটা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, আমরা সাহাবিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাউকে আবু বকর রা. এর সমকক্ষ মনে করতাম না।[১০৮]

হজরত আলি রা. কে তার ছেলে মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া জিজ্ঞেস করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি তখন কোনো ধরনের সংকোচ ছাড়াই বলেন, হজরত আবু বকর রা.।[১০৯]

---

[১০৪] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৬১
[১০৫] সহিহ মুসলিম, ৬৩২৮
[১০৬] সহিহ মুসলিম, ৬৩২৭
[১০৭] সহিহ মুসলিম, ৬৩২০
[১০৮] সহিহ বুখারি, ৩৬৯৭
[১০৯] সহিহ বুখারি, ৩৬৭১

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. কে বলেন, তুমি সাওরপর্বতে আমার সঙ্গী হয়েছিলে। এবং হাউজে কাউসারেও আমার সঙ্গে থাকবে।[১১০]

একবার হজরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে হজরত আবু বকর রা. এর প্রতি কিছুটা তিক্ত আচরণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই উমর রা. এজন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় কষ্ট পান। তিনি কেয়ামত পর্যন্ত আগত লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন, তোমরা আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছো আর আবু বকর আমাকে সত্যায়ন করেছে। সে নিজের জানমালের মাধ্যমে আমার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তোমরা কি আমার প্রতি লক্ষ করে আমার বন্ধুকে ক্ষমা করে দিতে পারো না?'[১১১]

হজরত উমর ফারুক রা. বলেন, আবু বকর আমাদের সরদার। আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।[১১২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একবার জিবরাইল এসে আমাকে জান্নাতের একটি দরজা দেখান। সেই দরজা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হজরত আবু বকর রা. তখন বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আমি সে-সময় আপনার সাথে থাকতাম তা হলে জান্নাতের দরজা দেখার সৌভাগ্য হতো! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي

আবু বকর, তুমি কি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি নও?[১১৩]

---

[১১০] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৭০

[১১১] সহিহ বুখারি, ৩৬৬৮

[১১২] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৫৬

[১১৩] সুনানে আবু দাউদ, ৪৬৫২

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ইসলামগ্রহণের সময় বেশ অর্থশালী ছিলেন। মালিক ছিলেন ৪০ হাজার দিরহামের। তিনি সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেন।[১১৪]

এই কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

وما نفعني مالُ أحدٍ قطُّ ما نفعني مالُ أبي بكرٍ

আবু বকরের সম্পদ আমাকে যে পরিমাণ উপকৃত করেছে, অন্য কারো সম্পদ আমাকে সেই পরিমাণ উপকার করেনি।[১১৫]

তাবুকযুদ্ধের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. নিজ ঘরের সকল মাল-সামানা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন,

ما ابقيت لاهلك؟

পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি কী রেখে এসেছো?

তিনি বলেন,

ابقيت لهم الله و رسوله

তাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রেখে এসেছি।[১১৬]

খলিফা হওয়ার পরও তার বিনয়-নম্রতায় কোনো ধরনের পার্থক্য আসেনি। তিনি নিজেই গরিব-মিসকিন, বিধবা ও প্রয়োজনগ্রস্তদের সেবা করতে আনন্দ বোধ করতেন। মানুষের বকরির দুধ দোহন করে দিতেন। কারো উট চড়িয়ে দিতেন। বিভিন্ন মানুষের ঘরে গিয়ে তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দিতেন।[১১৭]

তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন। সবসময় তার চিন্তা-চেতনায় এবং অন্তরে আখেরাতের ভয় জাগরূক থাকত। কখনো বলতেন, হায়, যদি আমি একটি গাছ হতাম, যাকে কেটে ফেলা হতো![১১৮]

---

[১১৪] তারিখুল খুলাফা, ৩৪
[১১৫] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৬১
[১১৬] সুনানে আবু দাউদ, ১৬৭৮
[১১৭] তারিখুল খুলাফা, ৬৪, ৬৫
[১১৮] তারিখুল খুলাফা, ৮৬

কখনো বলতেন, আহা, আমি যদি কোনো মুমিনের দেহের পশম হতাম! কখনো বলতেন, যদি আমি কোনো ঘাস হতাম, প্রাণীরা যা খেয়ে ফেলে।[১১৯]

রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা

এই খোদাভীতি পরহেজগারি বিনয়-নম্রতা সত্ত্বেও হজরত আবু বকর রা. রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতেন। সতর্কতা ও বিচক্ষণতার দিক থেকে তিনি সর্বোচ্চ পন্থা অবলম্বন করতেন। মদিনায় বসে তিনি দূরদূরান্ত এলাকার বিষয়াদি পরিচালনা করতেন। গোটা আরব-উপদ্বীপ, ইরাক ও শাম তার নখদর্পণে ছিল। পারস্য থেকে শাম পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তাঘাট ও জনপদ তার দৃষ্টির মধ্যেই ছিল। সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল কে? এখন সে কোন দিকে আছে? কী পরিমাণ সৈন্য কোন স্থান থেকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে প্রভৃতি বিষয় তার মাথায় সবসময় বিদ্যমান থাকতো।

হাজার হাজার মাইল দূরত্বে যেসব যুদ্ধ পরিচালিত হতো তার মূল কমান্ড তার হাতে থাকতো।

যুদ্ধের অধিনায়কদেরকে তিনি দ্রুতগামী সংবাদ-বাহকের মাধ্যমে সামনে অগ্রসর করতেন, পেছনে নিয়ে যেতেন। দাবার ঘুঁটি যেভাবে স্থানান্তর করা হয়, সেভাবেই তিনি তাদেরকে স্থানান্তর করতেন। তার নির্দেশে যুদ্ধের ময়দানের চিত্রপট পালটে যেত। আরব, অনারব, শাম এবং রোমের বড় বড় যুদ্ধবিশেষজ্ঞ মিলে তার দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার মোকাবেলা করতে পারত না। ইতিমধ্যে আমরা সে ইতিহাস উল্লেখ করেছি।

বিপদ ও পরীক্ষার মোকাবেলা

আবু বকর সিদ্দিক রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সমাধান করা কারো সাধ্যের মধ্যে ছিল না। এটা কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অর্জিত বিশেষ নুরের প্রভাব ছিল। এর ফলে তিনি এইসব বড় বড় বিপদে অবিচল ছিলেন।

---

[১১৯] আহমদ বিন হামবল কৃত আয-যুহদ, হাদিস নং ৫০৬, ৫৮৩

মদিনা ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি চলছিল, জাকাত অস্বীকার করা হচ্ছিল, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদাররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল, অনেক গোত্র মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল, রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের নিষ্পেষিত করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ঈমানি শক্তি, চমৎকার পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টা সকল ফেতনা দমন করে দিয়েছিল। মুরতাদ, খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী, পারসিক, আরবগোত্র এবং রোমান সকলেই তার প্রতিপক্ষ ছিল। কিন্তু তার রাজনৈতিক ও সামরিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সামনে সকলেই শিশুর মতো আনাড়ী প্রমাণিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এই অসাধারণ যোগ্যতা সেই নবুওয়াতের নুরের প্রভাব ছিল, যা গোটা উম্মতের মধ্যে আবু বকর রা. সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তা সুদৃঢ় করেছেন। এটা তার অবদান। তিনি আরব-উপদ্বীপ এবং নতুন বিজিত এলাকাসমূহকে দশ ভাগ করে প্রত্যেক অংশে নিজের পক্ষ থেকে একজন আমির নির্ধারণ করেন, যারা ওইসব এলাকার শাসক হওয়ার পাশাপাশি বিচারকের মর্যাদায় ভূষিত ছিল।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. মুসলিমবাহিনীকে অত্যন্ত উত্তম উপায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন। যেকোনো রণাঙ্গনের সৈন্যদেরকে তিনি ছোট ছোট বিভিন্ন ফ্রন্টে বিভক্ত করতেন। এরপর তাদের সকলকে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনে দিয়ে দিতেন। এর ফলে যেমন ঐক্য সুদৃঢ় থাকত তেমনিভাবে বিভিন্ন পয়েন্টে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়ে উঠতো।[১২০]

সৈন্যদেরকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন, যাতে তারা কোনো ফসলি জমি ও ফলের বাগান বিরান না করে। নারী, বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বলদের যাতে কোনো ধরনের কষ্ট না পৌঁছানো হয়। তাদের উপর যেন কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করা হয়। ধোঁকা-প্রতারণার পথ অবলম্বন না করে

---

[১২০] ড. আকরাম জিয়া উমারি কৃত আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৬। এ ছাড়াও সেনা সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপ জানার জন্য তারিখে তাবারি এবং ওয়াকিদিকৃত মাগাজি দ্রষ্টব্য।

যারা জিজিয়া আদায় করে তাদের নিরাপত্তার প্রতি যেন ভালোভাবে লক্ষ রাখা হয়।[১২১]

এসব উন্নত চরিত্র ও গুণাবলির অধিকারী মুসলিম সেনাবাহিনী যেখানেই পা রেখেছে সেখানকার সাধারণ জনগণ তাদের অনুসারী হয়ে গেছে।

প্রথমে ইসলাম পরে মুসলমান

আবু বকর সিদ্দিক রা. আপন খেলাফতকালে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হয়ে যাননি; বরং খেলাফত এবং তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে একটি আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি মুরতাদদের ফেতনা, খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের ফেতনা ও জাকাত অস্বীকারকারীদের ফেতনা মোকাবেলায় ঐতিহাসিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন।

এর মাধ্যমে তিনি সকল খলিফা এবং মুসলিম অধিনায়কের জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, বিপদ সকল সীমারেখা অতিক্রম করলেও কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস এবং ফিকহি বিধিবিধানে কোনো ধরনের পরিবর্তন সাধন এবং তার মূলনীতি নিয়ে কোনো ধরনের সওদাবাজি চলবে না।

মোটকথা তিনি ভবিষ্যৎপ্রজন্মের জন্য 'প্রথমে ইসলাম এবং পরে মুসলমান'-এর এক অনন্য চিত্র অংকন করেছেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত ইসলাম সঠিক অবস্থায় জীবন্ত এবং চলমান রয়েছে।

---

[১২১] মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদিস নং, ১৬২৭

উমর ফারুক রা. এর খেলাফতকাল

২৩ জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি-১ম মহররম ২৪ হিজরি

৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

হজরত উমর ফারুক রা.

হজরত উমর ফারুক রা. কুরাইশ গোত্রের শাখা বনু আদির অন্তর্গত ছিলেন। তার পিতার নাম খাত্তাব বিন নুফাইল। মায়ের নাম হানতামা বিনতে হাশেম। তার পিতা আদাবি বংশের ছেলে আর মা ছিলেন মাখযুমি বংশের। তার বংশধারা হলো উমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আবদুল উযযা বিন রিয়াহ বিন কুরাত বিন রযাখ বিন আদি বিন কাব বিন লুয়াই। কাবের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বংশধারা মিলে যায়। কাবের ছেলে মুররার বংশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাবের অপর ছেলে আদির বংশে হজরত উমর ফারুক রা. জন্মগ্রহণ করেন।[১২২]

ফিজার যুদ্ধের চার বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপনাম দিয়েছিলেন আবু হাফস। হাফস অর্থ বাঘ। অর্থাৎ বাঘের মতো সাহসী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফারুক উপাধি দিয়েছেন। ফারুক শব্দের অর্থ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।[১২৩]

যদিও পিতা তাকে শৈশবে উট চড়ানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। অথচ তখন মক্কার খুব কমসংখ্যক লোকই লেখাপড়া জানত। যৌবনের শুরুদিকে তিনি ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। আরবের বাইরেও তিনি সফর করেছেন। এজন্য পৃথিবীর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং তাদের জীবন, চালচলন ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তার ভালো জানাশোনা ছিল। জাহেলি যুগে তিনি দূতালির দায়িত্ব পালন করতেন। কুরাইশের লোকেরা তার সাহসিকতা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যুদ্ধ-সক্ষমতা,

---

[১২২] জাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম, ৩/২৫৩
[১২৩] আল ইসতিয়াব, ৩/১১৪৫

বিভিন্ন বিষয় অতি দ্রুত বুঝে ফেলা এবং তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল।

তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তার স্বভাবে আত্মমর্যাদা এবং আবেগের উপাদান বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তার শরীর অত্যন্ত শুকনো এবং দীর্ঘকায় ছিল। যৌবনের শুরুতে তিনি ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গ্রহণযোগ্যতা এবং উত্তম গুণাবলির কারণে তার হেদায়েতের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন,

> اللهم أعِزَّ الإسلامَ بأحَبِّ هذين الرجُلَيْنِ إليك بأبي جهلٍ أو بعمرَ بنِ الخطابِ قال وكان أحَبَّهُما إليه عمرُ
>
> হে আল্লাহ, আবু জাহেল এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন আর উমর তার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন।[১২৪]

তার এ দোয়াটি কবুল হয়েছিল। তখন উমর রা. এর বয়স ছিল আনুমানিক আটাশ বছর। তিনি নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২৫]

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ৫৮ বা ৫৯ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।[১২৬] এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর তার বয়স হয়েছিল আটাশ। এ ছাড়াও তার ইসলাম গ্রহণকালীন বয়সের ব্যাপারে ২৬ বা ৩৩ বছরের মতও রয়েছে। তেমনিভাবে এক মত অনুযায়ী তিনি তেষট্টি বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু এটি অনির্ভরযোগ্য কথা।

সে-সময় মাত্র ৪০ জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলমানরা প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারত না। কিন্তু তিনি ইসলাম কবুল করামাত্র মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্যে মসজিদুল হারামে নামাজ আদায়

---

[১২৪] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৮১

[১২৫] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৩৭০

[১২৬] তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৪৪১

করেন। কেউ তাদের বাধা দেওয়ার সাহস করেনি। হিজরতের সময় কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের ভয়ে সকল মুসলমান যখন লুকিয়ে লুকিয়ে মদিনায় হিজরত করছিলেন, হজরত উমর রা. তখন রীতিমতো কাফেরদের বিশাল সংখ্যক লোকের সামনে দিয়ে মক্কা থেকে বের হন। তিনি ঘোষণা করেন, কারো সাহস থাকলে আমার রাস্তায় বাধা প্রদান করে দেখুক।[১২৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রা. এর ঈমানি সাহসিকতার প্রশংসা করে বলতেন, নিঃসন্দেহে শয়তান উমরকে ভয় পায়।[১২৮]

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমরকে বলেন,

> والذي نَفْسِي بيَدِهِ، ما لَقِيَكَ الشَّيْطانُ قَطُّ سالِكًا فَجًّا إلَّا سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ.
>
> যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, শয়তান যদি তোমাকে কোনো রাস্তায় চলতে দেখে তা হলে সেই রাস্তা পরিহার করে সে অন্য রাস্তা গ্রহণ করে।[১২৯]

হজরত উমর রা. এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করেন। তার মেয়ে হজরত হাফসা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। শ্বশুর হওয়ার সুবাদে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব ছিল অনেক।

হজরত উমর রা. এর জমানার সকল যুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সামনের কাতারে থাকতেন। হজরত আবু বকর রা. এর শাসনকালে তিনি খলিফার ডান হাত এবং সবচেয়ে নিকটবর্তী পরামর্শদাতা ছিলেন।

---

[১২৭] তারিখুল খুলাফা, ৯৪

[১২৮] মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং, ২২৯৮৯

[১২৯] সহিহ বুখারি, ৩৬৮৩; সহিহ মুসলিম, ৬৩৫৫

আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে নেতৃত্বদানের এমন উন্নত গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যা আর কারো ভাগ্যে জোটেনি।[১৩০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার ব্যাপারে বলেন,

لَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ

আমি কোনো মহান ব্যক্তিকে উমরের মতো অভিজ্ঞ ও কর্মঠ দেখিনি।[১৩১]

ধর্মীয় জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও গভীর ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে উমর রা. উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসের সংখ্যা হলো ৫৩৭। তিনি সর্বপ্রথম খলিফা, যিনি আমিরুল মুমিনিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তার আংটিতে নকশা করা ছিল-

كفى بالموت واعظا

উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।[১৩২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি বিচারকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আপন গভীর জ্ঞান, দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার পাশাপাশি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। তিনিই একমাত্র সাহাবি, যার অনুমোদন এবং পরামর্শকে আল্লাহ তায়ালা কয়েকবার অহির মাধ্যমে সমর্থন করেন। এমনও হয়েছে যে, তার মাথায় যা এসেছে কুরআন মাজিদে সেই অনুযায়ী আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উম্মতের সেসব নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করেছিলেন, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে সঠিক বিষয় ঢেলে দিয়ে থাকেন।[১৩৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّ اللهَ جعلَ الحقَّ على لسانِ عُمرَ وقلبِهِ

---

[১৩০] তারিখুল খুলাফা, ৯৫-১০১

[১৩১] সহিহ মুসলিম, ৬৩৪৩, ৬৩৪৭

[১৩২] আল ইসাবা, ২/৩০৭

[১৩৩] আল ইসতিয়াব, ৩/১১৪৫

আল্লাহ তায়ালা উমরের জবান এবং অন্তরকে হক এবং সত্যের অনুকূল বানিয়ে দিয়েছেন।[১৩৪]

তিনি একবার বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فإنْ يَكُ في أُمَّتِي أحَدٌ، فإنَّه عُمَرُ

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিতে মুহাদ্দাস লোক থাকত; যদি আমার উম্মতের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি থাকে তা হলে উমর সেই ব্যক্তি।[১৩৫]

মুহাদ্দাস হলো সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাদের অন্তরে সঠিক বিষয় ঢেলে দেন আর তারা সেটা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয়। এই গুণটি উমর ফারুক রা. কে আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেছিলেন। এই কারণে তার বিভিন্ন মত ও সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[১৩৬]

তার মাহাত্ম্য বোঝার জন্য নিম্নোক্ত হাদিসটিই যথেষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لو كان بعدي نبيٌّ لكان عمرَ بنَ الخطّابِ

আমার পর যদি কেউ নবী হতো, তা হলে উমর ইবনুল খাত্তাবই হতো।[১৩৭]

এসব উত্তম গুণের অধিকারী হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন তখন থেকে ইসলামের বিজয়ের ধারা শুরু হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল শহর-নগর-বন্দর ইসলামের অধীনে চলে আসতে থাকে।

---

[১৩৪] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৮২

[১৩৫] সহিহ বুখারি, ৩৬৮৯

[১৩৬] ইমাম সুয়ুতি 'মুআফাকাতে উমর' (যেসব বিষয়ে ওহির মাধ্যমে উমরের সমর্থন করা হয়েছে) শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বিশটি উদাহরণ তুলে ধরেন। (তারিখুল খুলাফা, ৯৯-১০২)

[১৩৭] সুনানে তিরমিজি, ৩৬৮৬

ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ

উমর ফারুক রা. এর খেলাফতের শুরুতে বৃহৎ যুদ্ধসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয় ইয়ারমুকের যুদ্ধ। এর মাধ্যমে রোমানদের প্রতিরক্ষা দেয়ালে ফাঁটল ধরে যায়। তাদের রাজধানী হিমস পর্যন্ত বিজয়ের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যুর মাত্র ছয়দিন পর ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন পর্যন্ত তার মৃত্যুর সংবাদ এই সকল মুসলমানের নিকট পৌঁছেনি।[১৩৮]

---

[১৩৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৭০

নিরীক্ষণ-১ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত যুদ্ধের ব্যাপারে কারো কারো সন্দেহ হয়েছে যে, সেটি এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধ একই যুদ্ধ কি না? কেননা উভয় যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সমান ছিল। উভয় যুদ্ধে খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. সেনাপতি ছিলেন। এবং উভয় যুদ্ধেই রোমানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সঠিক বিষয় হলো আজনাদাইনের যুদ্ধ ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ-দুটি ভিন্ন ভিন্ন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জীবনের শেষদিকে আজনাদাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর ইয়ারমুকের যুদ্ধ তার মৃত্যুর কিছুদিন পর হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালে সংঘটিত হয়েছে। উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষণ-২ ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতভিন্নতা রয়েছে। তাবারি, ইবনুল আসির জাযারি, হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, এ যুদ্ধটি ১৩ হিজরির জুমাদাল উখরায় আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যুর পরপরই সংঘটিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবনে আসাকির, ইবনে ইসহাক এবং খলিফা ইবনে খাইয়াত বলেছেন, এটি ১৫ হিজরির রজব মাসে সংঘটিত হয়েছে।

এ ছাড়াও কিছু মতভিন্নতা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় করা হয়নি। উদাহরণত, কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে যুদ্ধটি আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। কেন্দ্র থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা বা সাহায্য পাঠানো হয়নি। পক্ষান্তরে অপর কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে কেন্দ্র থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং উভয়পক্ষ থেকে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, এই যুদ্ধটি শামের সীমান্তবর্তী দুর্গ বিজয়ের পর শুরু হয়েছে। অপর কিছু বর্ণনা অনুযায়ী এটি দামেশক এবং রোমানদের শাম-কেন্দ্রিক রাজধানী হিমস বিজয় হওয়ার পর→

ইয়ারমুকের যুদ্ধে শামে অবস্থানরত সকল মুসলমান একত্র হয়ে যান। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার। তাদের মধ্যে হজরত আমর ইবনুল আস, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সকলের নিকট ৭ হাজার করে সৈন্য ছিল। হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেল রা. এর নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্য শামের রাজপথে নিযুক্ত ছিলেন। সেখান থেকে যেকোনো সময় রোমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আসার আশঙ্কা ছিল। তিনিও তখন এখানে চলে আসেন। ২৭ হাজর সৈন্যের বাহিনীর সাথে হজরত খালিদ রা. এর ৯ হাজার মুজাহিদ যুক্ত হওয়ায় সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজার। অন্যদিকে রোমানরা ২ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হয়। তারা গভীর গর্ত খুঁড়ে আগেভাগেই নিজেদের শিবিরকে নিরাপদ বানিয়ে নিয়েছিল।

তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সকল বাহিনীর আমিরগণ সৈন্যদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে এভাবেই

সংঘটিত হয়েছে। কিছু বর্ণনায় আছে, বড় বড় যে সকল সাহাবি প্রথম দিকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছিলেন, তারা নিজেদের বাহিনী একত্র করে যুদ্ধ করেন। কিন্তু খেলাফতের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনো আমির নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এজন্য তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. কে আমির নির্ধারণ করে নেন। তার নেতৃত্বেই যুদ্ধ করা হয়। অপর কিছু বর্ণনা আছে, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহহ রা. কে খেলাফতের পক্ষ থেকে আমির নির্ধারণ করা হয়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তার অনুগত ছিলেন। মোটকথা, এই যুদ্ধের বর্ণনার খুঁটিনাটি ভিন্নতা বাদ দিলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতভিন্নতা রয়ে যায়। এগুলো অবশ্যই তাহকিকের দাবি রাখে। প্রাচীন যুগের ইতিহাসপ্রণেতাগণ যেহেতু শুধু বর্ণনাসমূহ একত্র করে দিয়েছেন, মূল বিষয়ের শুদ্ধতা যাচাই ও সমন্বয় তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; এজন্য এ বিষয়টি আজ অবধি নিরসন হয়নি। মরহুম আল্লামা শিবলি নোমানি তার কিতাব আলফারুককে ১৫ হিজরির বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। একাধিক মত থাকার বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। অথচ এ বিষয়টি সমাধান করা আবশ্যক ছিল। আমি যতদূর চিন্তাভাবনা করেছি, আমার নিকট মনে হয়েছে, ইয়ারমুকের মাঠে বড় ধরনের দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। উভয়টির প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটি যুদ্ধ ১৩ হিজরিতে এবং অপরটি ১৫ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। প্রথম যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর নেতৃত্বে, দ্বিতীয়টি হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহহ রা. এর নেতৃত্বে। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এ মতভিন্নতা নিরসন হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে যুদ্ধাবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

প্রত্যেকে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বহাল রেখে লড়াই করে যাবেন। কিন্তু হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই কারণে তিনি পরামর্শসভায় সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন, 'রোমানদের সুবিন্যস্ত এবং ঐক্যবদ্ধ বাহিনীর মোকাবেলায় এভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে লড়াই করা ঠিক হবে না। আল্লাহর রাসুলের খলিফা আবু বকর শুধু এ কারণেই আমাদেরকে এভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন, যাতে আমরা সহজেই বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে রণাঙ্গনে যেতে পারি। যদি তিনি আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতেন তা হলে তিনি আমাদেরকে একই বাহিনীতে জড়ো হতে বলতেন। আমাদের এরকম বিন্যস্তকরণ শত্রুদের কাজ সহজ করে দেবে। আমাদেরকে এটা মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তা হলে আপনি বলুন, এখন কী করা উচিত?

হজরত খালিদ রা. তখন বলেন, আমাদের সবাইকে একটি বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে একজন আমিরের নেতৃত্বে লড়াই করতে হবে। প্রত্যেককেই সেনাবাহিনী পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে। একদিন একজন আমির হবেন। পরদিন আরেকজন হবেন। যদি আপনারা অনুমতি দেন তা হলে প্রথম দিন আমাকে আমির নির্ধারণ করুন।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রোমানদের যুদ্ধের শ্রেণিবিন্যাস বুঝতে পেরেছিলেন এজন্য তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্বেই চিন্তাভাবনা করে রেখেছেন। তাই তিনি এ আবেদন করেন। সকলেই তখন আনন্দচিত্তে তাকে নেতৃত্বগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।

পরদিন উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। রোমানরা বিরল প্রক্রিয়ায় সৈন্যদের শ্রেণিবিন্যাস করে, যা দেখে যেকেউই হতবাক হয়ে যাবে। কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের শ্রেণিবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে চোখে দেখে এটা বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে, তারা আরব-উপদ্বীপের সেনাদল।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. আল্লাহপ্রদত্ত সামরিক যোগ্যতার মাধ্যমে মুসলিম সৈন্যদেরকে ছত্রিশ ভাগে সজ্জিত করেন। তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কাতারে বিন্যস্ত করেন। ইতিপূর্বে আরবের কোনো বাহিনী এই বিন্যাসে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়নি। মাঝখানের ষোলটি কাতার হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এর কাঁধে, ডান থেকে দশটি কাতার হজরত আমর ইবনুল আস রা. এবং হজরত শুরাহবিল বিন হাসানার কাঁধে, বাম দিক থেকে আরও দশটি কাতারের নেতৃত্ব হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর কাঁধে অর্পণ করা হয়।

এরপর প্রত্যেক বাহিনীর সাহসী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করে প্রতি কাতারে একজন করে অফিসার নিয়োগ করা হয়।

হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা. কে কুরআন মাজিদের আয়াত শুনিয়ে মুসলমানদের আবেগ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারব রা. ও হজরত আবু হুরাইরা রা. কে সিরাত ও হাদিসের ঘটনাবলি শুনিয়ে মুসলমানদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১৩৯]

যুদ্ধের পূর্বে কোনো একজন মুসলমানের মুখ থেকে বের হয়ে যায় যে, রোমানদের সৈন্যসংখ্যা কত বেশি আর আমরা কত সামান্য!!

হজরত খালিদ সাইফুল্লাহ রা. চিন্তাভাবনা ছাড়াই সাথে সাথে বলেন, না, এই রোমানদের জন্য মুসলমানরা অনেক বেশি এবং এত অধিক সংখ্যক মুসলমানের জন্য রোমানরা খুব সামান্য। যে বাহিনীর আল্লাহর সাহায্য লাভ হয়, প্রকৃতপক্ষে তারাই অধিকসংখ্যক আর যাদের এই সৌভাগ্য অর্জিত হয় না, তারা সর্বাবস্থায় কম। আল্লাহর শপথ আজ যদি আমার ঘোড়া ঠিক থাকতো তা হলে রোমানরা এর চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যক হলেও কোনো পরোয়া ছিল না।

যুদ্ধের দামামা বাজানো হবে, এর মধ্যেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। রোমানদের সিপাহসালার জারিজ ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে চলে আসে। সে খালিদের সাথে কথা বলতে চাইলে হজরত খালিদ রা. তখন সামনে অগ্রসর হয়ে আসেন।

---

[১৩৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৪৫

জারিজ বলে, খালিদ, সত্য সত্য বলবে, আল্লাহ কি তোমাদের নবীর উপর আসমান থেকে কোনো তরবারি অবতীর্ণ করেছিলেন, যা পরে তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যে কারণে তোমরা সকল যুদ্ধে বিজয় লাভ করে থাকো?

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. নেতিবাচক উত্তর দিলে জারিজ জিজ্ঞেস করে, তা হলে তোমাকে কেন খালিদ সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) বলা হয়?

হজরত খালিদ রা. তখন অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, দেখো, একসময় আমিও এই নবীর বিরোধিতা করতাম। নবীকে আমি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন। আমি তার আনুগত্য করেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি হলে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি), আল্লাহ তায়ালা যা কাফেরদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করে রেখেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার জন্য আল্লাহর সাহায্যের দোয়া করেছিলেন।

জারিজ অবাক হয়ে এসব কথা শুনছিল। সে তখন বলে, আমাকে বলো তো এই নবী তোমাদেরকে কীসের প্রতি আহ্বান করতেন?

হজরত খালিদ রা. উত্তর দেন, তিনি বলতেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও কিংবা জিজিয়া প্রদান করো অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

এটা শুনে জারিজ জিজ্ঞেস করে, যারা এই দাওয়াত কবুল করে তোমাদের সঙ্গে শামিল হয়ে যেত, তাদের মর্যাদা কী হতো?

হজরত খালিদ রা. বলেন, তারা আমাদের সমমর্যাদার অধিকারী হতো; বরং একদিক থেকে তারা উত্তম হতো। কেননা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে এবং তার মুজিজা ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি আর তোমরা সেগুলো ব্যতীতই ইসলাম কবুল করছো। তাই তোমাদের মর্যাদা আমাদের চেয়ে উঁচু।

এটা শুনে জারিজ হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর হাতে ইসলাম কবুল করে নেয়। তিনি ইসলামের পক্ষ নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে যান।[১৪০]

---

[১৪০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে লড়াই শুরু হয়। উভয় পক্ষের সেনারা প্রবল আগ্রহের সাথে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিনভর তুমুল লড়াই হয়। এর মধ্যেই মদিনা থেকে দ্রুতগামী দূত আসে। সে সংবাদ প্রদান করে যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ইনতেকাল হয়ে গেছে। তার স্থানে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব আমিরুল মুমিনিন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. মুসলিমবাহিনীর প্রধান সিপাহসালার হবেন।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সংবাদটি শ্রবণ করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তা গোপন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কেননা খলিফার মৃত্যুর কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আর প্রধান সিপাহসালার পরিবর্তনের কারণে যুদ্ধের বিন্যাস পালটে যেতে পারে। যার ফলে গোটা যুদ্ধের চিত্রই পালটে যাবে।

যুদ্ধে পরিস্থিতি একসময় এমন হয়ে যায় যে, রোমানরা মুসলমানদের পিছু হটাতে হটাতে তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌছে। এই অবস্থায় হজরত ইকরিমা বিন আবু জাহেল রা. চিৎকার করে বলেন, আমি কয়েকবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এখন পরীক্ষার সময়। ইসলামগ্রহণের পর আজ আমার কোরবানি দেওয়ার সময় এসেছে। আমি কি এখন পলায়ন করব?!

এরপর তিনি চিৎকার করে বলেন, কে আছো মৃত্যুর জন্য বাইয়াত হয়ে আমার সাথে চলবে?

তার আশপাশে তখন ৪০০ মুজাহিদ জমা হয়ে যায়। হজরত ইকরিমা এবং তার চাচা হজরত হারিস বিন হিশাম রা. (আবু জাহেলের ভাই) মুজাহিদদের নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদেরকে নিজেদের তাঁবু থেকে পিছনে হটিয়ে দেন।

এই লড়াইয়ে হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এবং তার ১৩ বছর বয়সি ছেলে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর শরিক ছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর বলেন, বয়সের স্বল্পতার কারণে আমি লড়াইকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম না। কিন্তু আমার পিতার সাথে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলাম। আমি দেখছিলাম আবু সুফিয়ান বিন হারবসহ কুরাইশের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে

তোলার চেষ্টা করছিলেন। মুসলমানরা তাদের আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন।[১৪১]

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও নওমুসলিম জারিজ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করতে থাকেন। লড়াইয়ের কারণে মুসলমানরা যোহর এবং আসর নামাজ ইশারায় আদায় করেন। যুদ্ধ চলছিল। সন্ধ্যার দিকে রোমানদের সাহসে ভাটা পড়তে থাকে। তারা পিছু হটা শুরু করে। তখন হজরত খালিদ রা. তাদের মধ্যভাগে এক জোরদার হামলা চালান। তাদের পদাতিক এবং অশ্বারোহীদের কাতার উলটে দেন। রোমানরা পলায়ন করতে গিয়ে নিজেদের পরিখার মধ্যে পড়ে যেতে থাকে। মুসলমানরা তাদের লাশের স্তূপ গড়ে তোলে।

২০ হাজার রোমান সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়। মুসলমানদেরও ক্ষতি হয়। হজরত আবু সুফিয়ান রা. যুদ্ধে মুসলমানদের সাহসিকতা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তির বিদ্ধ হওয়ার কারণে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের শেষপর্যায়ে নওমুসলিম জারিজ সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের সুধা পান করেন।

ইকরিমা এবং তার ছেলে আমর মারাত্মকভাবে আহত হন। বিজয়ের আগেরদিন সকালবেলা তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাদের মাথা নিজের কোলে রাখেন এবং মহব্বতের সাথে তাদের চেহারায় হাত বুলাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে পিতা-পুত্র উভয়ে হজরত খালিদ সাইফুল্লাহ রা. এর কোলে নিজেদের প্রাণকে প্রাণদাতা সত্তার নিকট সঁপে দেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[১৪২]

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ : ইসলামের প্রথম প্রধান সিপাহসালার

যুদ্ধের শেষদিন দূত এসে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে আবু বকর রা. এর মৃত্যুসংবাদ জানায়। তিনি সৈন্যদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য এই সংবাদ গোপন রাখেন। ঐদিন সন্ধ্যায় যখন লড়াই কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যায় তখন হজরত খালিদ রা. সাহাবায়ে কেরামকে আবু বকর রা. এর

---

১৪১ আল কামিল ফিত তারিখ ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

১৪২ আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত্যুর সংবাদ জানান। সাথে সাথে এটিও বলে দেন যে, নতুন খলিফা হজরত উমর ফারুক হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে শামের সমস্ত বাহিনীর প্রধান সিপাহসালার নিযুক্ত করেছেন। এর অর্থ হলো আগামীতে সকল ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু উবাইদা রা. প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন আর হজরত খালিদ, হজরত আমর ইবনুল আস, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান-সহ অন্যান্য সেনাপতি তার নির্দেশনা অনুযায়ী চলবেন।

সকল বাহিনী একই স্থানে একত্র হয়ে গেলে তাদের প্রধান সিপাহসালার কে হবে-হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করে যাননি। এজন্য ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধে নিজেদের পক্ষ থেকে পরামর্শের ভিত্তিতে সাময়িকের জন্য হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যেহেতু সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল নির্বাচন করার প্রয়োজন রয়েছে; তাই হজরত উমর ফারুক রা. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই এই বিষয়ে ঘাটতি অনুভব করেন। তাই তিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ সাহাবি হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. কে আমির নির্ধারণ করেন।

তবে আরেকটি বিষয় রয়ে যায় যে, যখন সামরিক বিষয়ে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সবচেয়ে সফল প্রমাণিত হচ্ছিলেন তখন তাকে কেন স্বতন্ত্রভাবে কমান্ড ইন চিফ (প্রধান সিপাহসালার) বানানো হলো না? এর সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. একজন দক্ষ সামরিক ব্যক্তি হলেও রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল না। পক্ষান্তরে হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. সামরিক বিষয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দক্ষ ছিলেন। এখন যেহেতু সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করার পাশাপাশি বিজিত এলাকা পরিচালনার বিষয়টি সামনে চলে এসেছিল এজন্য হজরত উমর রা. হজরত আবু উবাইদা রা. কে প্রধান সিপাহসালার নির্বাচন করেন, পরবর্তীতে যা সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

এর মাধ্যমে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর একনিষ্ঠতা এবং নিয়মকানুনের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল থাকার বিষয়টি বুঝা যায়। তার

পূর্ণ সামরিক যোগ্যতা সত্ত্বেও কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই তিনি দরবারে খেলাফতের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেন। হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[১৪৩]

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্ব্যর্থতা নিরসন

কিছু ঐতিহাসিক ১৩ হিজরিতে সেনাপতির দায়িত্বে রদবদলকে 'বরখাস্ত' শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়। হজরত উমর ফারুক রা. হজরত খালিদ-সহ সমস্ত সেনাপতিকে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এর নেতৃত্বে আনার জন্য সেই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, হজরত খালিদ রা. কে পদচ্যুত করার জন্য নয়; বরং তিনি তখনও পূর্বের ন্যায় নিজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাকে ১৭ হিজরিতে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে।

যেহেতু হজরত আবু উবাইদা রা. আল্লাহর তরবারি হজরত খালিদ রা. এর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন এজন্য তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদের যোগ্যতার মাধ্যমে সর্বোত্তম উপায়ে উপকৃত হতে থাকেন। অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব প্রদান করেন।

দামেশক বিজয়

হজরত আবু উবাইদা রা. হজরত উমর ফারুক রা. এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামি সেনাবাহিনীকে ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। তাদেরকে শামের গুরুত্বপূর্ণ শহর দামেশকে নিয়ে যান। তিনি এ শহরকে একদিক থেকে অবরোধ করেন। অপর দিকে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করে তা খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। তৃতীয়দিকে আমর ইবনুল আস রা. কে দায়িত্ব প্রদান করেন।

এই ঐতিহাসিক শহরের প্রাচীর অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। মুসলমানগণ কয়েকদিন পর্যন্ত বাইরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। এক সময় উভয় দিক থেকে তির ও পাথরবর্ষণ শুরু হয়। হিরাক্লিয়াস দামেশকবাসীদের সাহায্যে শামের রাজধানী হিমস থেকে সাহায্য পাঠায়। কিন্তু আবু উবাইদা রা. সাহায্য পৌছার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এজন্য দামেশকে কোনো সাহায্য পৌছতে পারেনি।

---

[১৪৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৭০

শহরবাসীরা একদিন কোনো এক উৎসবে মত্ত ছিল। হজরত খালিদ রা. সুযোগ পেয়ে প্রাণ উৎসর্গকারী কিছু সাথি নিয়ে প্রাচীরে উঠে যান। তারা প্রাচীরের ফটক খুলে ফেলেন। ফলে মুসলিম সৈন্যরা ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। শহরবাসীরা এই অবস্থা দেখামাত্র দ্বিতীয় দিকের দরজা খুলে হজরত আবু উবাইদা রা. এর নিকট সন্ধির শর্ত পেশ করে। হজরত আবু উবাইদা রা. খালিদ বিন ওয়ালিদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এজন্য তিনি এ সকল শর্ত কবুল করে নেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে শহরে প্রবেশ করেন। ভেতরে পৌঁছে দেখেন অন্যদিক দিয়ে খালিদ রা. বাধা প্রদানকারী রোমানদের হত্যা করতে করতে এগিয়ে আসছেন।

যখন পূর্ণ বিষয়টি সামনে আসে তখন দেখা যায় শহরের একটি অংশ তরবারির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে এবং অপর অংশ সন্ধির মাধ্যমে আয়ত্তে এসেছে। এজন্য কিছু সাহাবি বললেন, আমরা প্রথমে শক্তি খাটিয়ে শহরে প্রবেশ করেছি এজন্য আমরা শহরবাসীদের কোনো শর্ত মানতে বাধ্য নই। আবার অপর কিছু সাহাবি বলছিলেন, আবু উবাইদা হচ্ছেন আমির। যেহেতু তিনি শর্তগুলো গ্রহণ করেছেন এজন্য সন্ধির শর্তের প্রতি সকলকেই লক্ষ রাখতে হবে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয়, অর্ধেক শহরের ব্যবস্থাপনা হজরত আবু উবাইদা রা. এর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, বাকি অর্ধেক শহর তরবারির মাধ্যমে বিজিত বলে গণ্য করা হবে।[১৪৪]

আল্লামা বালাজুরি রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী ১৪ হিজরিতে দামেশক অবরোধ শুরু হয় আর রজব মাসে তা বিজিত হয়।[১৪৫]

দামেশক বিজয়ের পর হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. নিজে সৈন্য নিয়ে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল জয় করার জন্য বের হন। এই বাহিনীর প্রথম কাতারের সেনাপতি ছিলেন তার ভাই হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.। বিজয়ের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'ইরকাহ' শহরটি তিনি একা জয় করেন। তখন থেকেই তার

---

[১৪৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৮৫

[১৪৫] ফুতুহুল বুলদান, ১২৩, ১২৬

নেতৃত্বের পরশপাথর খুলে যাওয়া শুরু করে। সাইদা, জুবাইল ও বৈরুতও তখন বিজিত হয়।[১৪৬]

ফিহিলের যুদ্ধ

দামেশক বিজয়ের ফলে রোমানরা বেশ বড় ধরনের আঘাত পায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদলকে একত্র করে। যাদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। জর্দানের বাইসান নামক স্থানে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে। হজরত আবু উবাইদা রা. তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সামনে অগ্রসর হন। তাদের সামনে ফিহিল ময়দানে শিবির স্থাপন করেন। রোমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার চেষ্টা করতে থাকে। হজরত আবু উবাইদা রা. তখন হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রা. কে পাঠান। তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অত্যন্ত দামি দামি গালিচা বিছানো ছিল। হজরত মুয়াজ রা. সেই গালিচায় না উঠে মাটিতেই অবস্থান করেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি সেই গালিচায় বসা পছন্দ করি না, গরিবদের অধিকার আত্মসাৎ করে যা তৈরি করা হয়েছে।

তারা বলল, আমরা তো আপনাকে সম্মান করতে চাই।

তিনি বললেন, তোমরা যাকে সম্মান মনে করো, আমার সেটার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি মাটিতে বসাটা গোলামের কাজ হয়ে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর গোলাম। যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে তা হলে বলতে পারো, অন্যথায় আমি ফিরে যাচ্ছি।

তারা বলল, আমরা জানতে চাচ্ছি, তোমরা কেন হাবশা ও পারস্যের লোকদের বাদ দিয়ে আমাদের সাথে লড়াই করতে এসেছ; অথচ আমাদের রাজত্ব সবচেয়ে বড়? আমাদের সেনাসংখ্যা আকাশের তারকা এবং মরুভূমির বালুকারাশির সমপরিমাণ?

হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রা. উত্তরে বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের সীমান্ত-সংলগ্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে জিহাদের নির্দেশ

---

[১৪৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

দিয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। আমাদের আবেদন হলো, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তা হলে তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে। যদি এটা পছন্দ না হয় তা হলে জিজিয়া প্রদান করে আমাদের নিরাপত্তার মধ্যে চলে আসো। যদি এটা গ্রহণ না করো তা হলে তরবারির মাধ্যমে ফয়সালা হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, তোমরা যেহেতু নিজেদের রাজত্ব ও সেনাসংখ্যার আধিক্যের কথা বললে; তাই শুনে রাখো, আমাদের বাদশাহ হলেন আল্লাহ। আমাদের শাসক আমাদের মতোই একজন মানুষ, যিনি ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নন। যদি তিনি কুরআন-হাদিস অনুযায়ী ফয়সালা করেন তা হলে তাকে তার পদে বহাল রাখা হবে অন্যথায় তাকে পদচ্যুত করা হবে। যদি তিনি কোনো ধরনের অপকর্ম করেন তা হলে তার উপর দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে। চুরি করলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। শুনে রাখো, তিনি নিরাপত্তা-বেষ্টিত কোনো জায়গায় থাকেন না। নিজেকে আমাদের চেয়ে বড়ও মনে করেন না।

রোমানরা এই কথা শুনে পেরেশান হয়ে যায়। তখন হজরত আবু উবাইদা রা. এর সঙ্গে কথা বলার জন্য নিজেদের দূত প্রেরণ করে। দূত যখন মুজাহিদদের নিকট পৌঁছে, আবু উবাইদা রা. তখন মাটিতে বসে তির সাজিয়ে দেখছিলেন। দূত এদিক-ওদিক তাকিয়ে সিপাহসালারকে খুঁজতে থাকে। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সকলকে একই রকম দেখাচ্ছিল। পরিশেষে সে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের আমির কোথায়?

বলা হলো, উনি আমাদের বাহিনীর আমির। এটা শুনে সে হতবাক হয়ে যায়। দূত নিজের আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে যে, আমাদের রাষ্ট্রপক্ষ আপনাদেরকে জনপ্রতি দু' আশরাফি করে প্রদান করবে। আপনি এখন চলে যান।

হজরত আবু উবাইদা রা. সুস্পষ্টভাষায় তা অস্বীকার করেন। কেননা ধনসম্পদ তার উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর দীন বিজয়ী করাই তার উদ্দেশ্য।[১৪৭]

---

[১৪৭] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ৯৫-১০৯

রোমানরা পরিশেষে মোকাবেলার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ১৪ হিজরির (৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) জিলকদ মাসে ফিহিল ময়দানে তুমুল লড়াই শুরু হয়।

মুসলমানদের ডান অংশের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত আবু উবাইদা রা.। বাম অংশের দায়িত্বে ছিলেন হজরত আমর ইবনুল আস রা.। পদাতিক বাহিনীর আমির ছিলেন হজরত ইয়াজ বিন গনাম রা.। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন হজরত জিরার বিন আযওয়ার রা.। এক তুমুল লড়াইয়ের পর এখানেও রোমানরা পরাজিত হয়। মুসলমানরা এই অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।[১৪৮]

হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. উমর ফারুককে বিজয়-সংবাদ পাঠান। পাশাপাশি তিনি তাকে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে, সে ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করেন। হজরত উমর ফারুক রা. বলেন, জনগণ জিম্মি হবে, ভূমিগুলো পূর্বের ন্যায় মালিকদের নিকট থাকবে।

ফিহিলের যুদ্ধের পর জর্দানের সমস্ত এলাকা খুব সহজেই বিজয় হয়ে যায়। সর্বত্র সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে এটাই ফয়সালা হয় যে, স্থানীয় লোকদের জানমাল, সহায়-সম্পদ, উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে। শুধু মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানরা প্রয়োজন অনুযায়ী জমিন গ্রহণ করবে।[১৪৯]

বাইজেন্টাইনের রাজধানী হিমস অবরোধ

শামে এখন শুধু তিনটি বড় শহর অবশিষ্ট রয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যের এশিয়া-কেন্দ্রিক রাজধানী হিমস ছিল এর মধ্যে প্রধান। এরপর ছিল বাইতুল মাকদিস, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যা সবচেয়ে সম্মানিত শহর। উত্তরে ছিল এন্তাকিয়া। রোমান সম্রাট তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন।

মুসলিমবাহিনী পথিমধ্যে ঐতিহাসিক শহর বা'লাবাক জয় করে হিমসে পৌঁছান। সময়টি ছিল প্রচণ্ড শীতকাল। কিন্তু মুসলমানগণ শহর অবরোধ থেকে পিছিয়ে থাকেননি। এমন প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল যে, সাধারণ মানুষদের

---

[১৪৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৮৯

[১৪৯] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১২২, ১২৩

হাত-পা অবশ হয়ে যেত। রোমানদের বহুলোক মোজা ও গরম জুতা পরিধান করা সত্ত্বেও চলাফেরা করতে পারতো না। কারো আঙুল, কারো হাত, কারো পা অবশ হয়ে যেত। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম অতি সাধারণ পোশাক এবং সব সময়ের সাধারণ জুতা পরেই অবস্থান করছিলেন। এতে তাদের কোনো কষ্ট হচ্ছিল না।

অবরোধ অনেক দীর্ঘ হলো। সাহাবায়ে কেরাম একদিন একত্র হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবিরধ্বনি দেন। আল্লাহু আকবারধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সাথে সাথেই হিমসের সুউচ্চ দেয়ালে কম্পন তৈরি হয়। কিছু দেয়ালে ফাঁটল ধরে যায়। শহরবাসী এটা দেখে কম্পিত হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তারা মুসলমানদের নিকট শহর সোপর্দ করে দেয়।[১৫০]

---

[১৫০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৪৯

ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ফিহিল, দামেশক, হিমসে পরাজয় বরণ করে পলায়নকারী রোমান সেনাপতিরা হিরাক্লিয়াসের নিকট এন্তাকিয়ায় একত্র হয়েছিল।[১৫১] হিরাক্লিয়াস কয়েক বছর পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পাঠ করেছিল। সে ভালোভাবেই জানত তার সম্প্রদায়ের তারকা নিষ্প্রভ হয়ে চলেছে। দীনে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের গতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সে আরেকবার তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বোঝানোর চেষ্টা করে। সে বলে, 'আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন। তোমরা যদি আমার কথা মানো তা হলে তার সঙ্গে সন্ধি করে নাও। এর দ্বারা কমপক্ষে এশিয়া মাইনর আমাদের হাতে থাকবে। কিন্তু যদি তোমরা লড়াই করার উপর জেদ ধরে থাকো তা হলে স্মরণ রেখো, শামের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আরবের সেনারা এশিয়া মাইনর থেকে কোহেস্তান পর্যন্ত আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে।'

কিন্তু রোমান সেনাপতিরা হিরাক্লিয়াসের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে। তারা সর্বাবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে।[১৫২] স্বজাতির পক্ষপাতিত্বের কারণে হিরাক্লিয়াস তখন কনস্টান্টিনোপল, এশিয়া মাইনর, আলজাজিরা, আর্মেনিয়াসহ সমস্ত এলাকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করে একটি তাজাদম বাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। এরপর রোমান সেনারা ঢলের ন্যায় এন্তাকিয়া পৌঁছতে থাকে। রোমানদের আগ্রহ-উদ্দীপনা এত অধিক ছিল যে, গির্জার পাদরি, দিনার-দিরহাম পরিত্যাগকারী সন্ন্যাসী—যে কখনো নির্জন স্থান থেকে বের হয়নি—তারাও এই চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হয়। তাদের মনোবল অত্যন্ত উন্নত ছিল। তারা এ যুদ্ধের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি

---

[১৫১] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৩২

[১৫২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৪৬

গ্রহণ করে। এরপর তারা দক্ষিণ দিকে মার্চ করে। মুসলমানরা সেখানে পতাকা গেড়ে অবস্থান করছিল।[১৫৩]

শামের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লামা আযদির বর্ণনাগুলো সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, এই যুদ্ধে রোমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ।[১৫৪] অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে তাদের সংখ্যা ছিল ২ লাখ। তবে আমার মনে হয়, পেশাদার রোমান সৈন্য ছিল ২ লাখ; বাকিরা ছিল আরব খ্রিষ্টান, স্বেচ্ছাসেবক এবং নতুন ভর্তি-হওয়া সাধারণ জনগণ।

মুসলমানদের সিপাহসালার হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. সেনাবাহিনীর একটি অংশের সাথে হিমসের দেয়াল-ঘেরা শহরে অবস্থান করছিলেন। বহু মুজাহিদের পরিবার-পরিজন সেখানে ছিল। কেননা মুসলমানরা এখানে রীতিমতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন। এই অবস্থায় যখন তারা রোমানদের এত বড় সৈন্যসমাবেশের সংবাদ জানতে পারেন, সাহাবায়ে কেরাম তখন জরুরি পরামর্শে বসেন। প্রধান সেনাপতি হজরত আবু উবাইদা রা. বলেন, এত অধিক রোমান সৈন্য আসছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী কেঁপে উঠছে। বলো, এখন আমাদের কী করা উচিত?

হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. নারী এবং শিশুদের শহরে রেখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ময়দানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. বলেন, 'শহরবাসী সকলেই খ্রিষ্টান। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা আমাদের পরিবার-পরিজনকে আক্রমণের টার্গেট বানানোর আশঙ্কা রয়েছে।'

হজরত আবু উবাইদা রা. বলেন, শহরবাসীদের বের করে দেওয়াটা একটা সমাধান হতে পারে।

হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. বলেন, হে আমির, এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে? আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করছি। এখন কীভাবে তাদের সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি?

---

[১৫৩] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৩৪

[১৫৪] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৯৪

হজরত আবু উবাইদা রা. এই মত ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো পদ্ধতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় ছিল না। তিনি তখন সেনাবাহিনীর একাংশের সাথে দামেশকে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় মুসলমানগণ নিজেরাই হিমস ছেড়ে দামেশকে চলে যাবে।

ফয়সালা হওয়ামাত্র হজরত আবু উবাইদা রা. সরকারি কোষাগারের দায়িত্বশীল হজরত হাবিব বিন মাসলামা রা. কে আসতে বলেন। খ্রিষ্টানদের থেকে গৃহীত জিজিয়ার প্রতিটি দিরহাম তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি বলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময় হিসেবে এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। এখন যেহেতু আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে চলে যাচ্ছি; তাই এই অংশ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।

মুসলমানরা যেসব এলাকা পদানত করে এখন তা হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়ে পড়েছেন, সেসব জনপদ ও শহরেও এ নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শহরবাসীদের লক্ষ লক্ষ দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়ার পর মুসলমানরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

শহরবাসীরা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের এই সদাচরণ এবং দিয়ানতদারি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অশ্রুসজল হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা দোয়া করছিল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পুনরায় এ শহরে ফিরিয়ে আনুন।

ইহুদিরা বলছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত আছি ততক্ষণ রোমান বাদশাহকে এ শহর আয়ত্তে নিতে দেব না।

হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. মুসলমানদের নিয়ে দামেশক পৌছেন। সকল সেনাপতিকে নিয়ে যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করেন। এরপর তিনি বাহিনী নিয়ে জর্দানের ইয়ারমুক অভিমুখে এগিয়ে যান।

হজরত আমর ইবনুল আস পূর্ব থেকেই নিজের বাহিনীর সাথে এখানে উপস্থিত ছিলেন। পুরোটাই ছিল খালি ময়দান। এটা ছিল আরবের

সীমান্তের নিকটবর্তী। পরাজিত হলে মুসলমানদের জন্য পেছনে গিয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ ছিল।[১৫৫]

হজরত আবু উবাইদা হিমস থেকে রওনা দেওয়ার সময় হজরত উমর রা. কে রোমানদের সেনাসংখ্যার আধিক্য সম্পর্কে অবগত করে তৎক্ষণাৎ সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দূত যখন হজরত উমর রা. এর নিকট পৌছে ততক্ষণে বড় বাহিনী তৈরি করে তা প্রেরণ করার সময় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এজন্য হজরত উমর রা. আবু উবাইদার নামে সাহসিকতা এবং তাওয়াক্কুল সম্পর্কে লিখিত এক পত্র পাঠান। সাথে সাঈদ বিন আমেরকে তৎক্ষণাৎ এক হাজার লোকের একটি দল দিয়ে শামে পাঠিয়ে দেন।[১৫৬]

আমিরুল মুমিনিন সকল মুজাহিদের প্রতি একটি বার্তা প্রেরণ করেন। লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বে সেনাবাহিনীর কাতারে তা শোনানোর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন। এ চিঠিতে তিনি বলেন, হে মুসলমানগণ, শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে লড়তে হবে। বাঘের মতো তাদের উপর হামলা করতে হবে। তারা যেন তোমাদের নিকট পিঁপড়ার চেয়েও তুচ্ছ মনে হয়। আমার দীর্ঘ বিশ্বাস রয়েছে যে, বিজয় এবং সাহায্য তোমাদের পদচুম্বন করবে।

লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে এই সাহায্যকারী বাহিনী এবং উমর ফারুক রা. এর পয়গাম পৌছে।[১৫৭]

মুসলমানদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৫ হাজারের বেশি ছিল না। তাদের মধ্যে ১ হাজার ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি, যাদের মধ্যে একশত ছিলেন বদরি সাহাবি। ইয়ামানি গোত্র আজদের ১০ হাজারের অধিক সাহসী মুসলমান এই কাতারে বিদ্যমান ছিলেন। ইয়ামেনের হিমইয়ার গোত্রের বড়সংখ্যক যোদ্ধাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। মুসলিমবাহিনীর ডান বাহুর আমির ছিলেন হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রা.। বাম বাহুর আমির ছিলেন হজরত কাবাস বিন আশইয়াম

---

[১৫৫] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৩৬-১৩৮
[১৫৬] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৩৮-১৪২
[১৫৭] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৬৪

রা.। পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন হজরত উতবা রা। অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। প্রধান সেনাপতি যদিও হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত সকল বিষয়ে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তার পরামর্শে সেনাবাহিনীর শ্রেণিবিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমির নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে তার পরামর্শই গৃহীত হয়।[১৫৮]

তখনো রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়নি, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণাত্মক অবস্থায় রোমানদের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে যান। রোমানরা এটা ধারণা করে বসে ছিল যে, মুসলমানরা হয়তো ভীত হয়ে পিছপা হয়ে যাবে। হজরত খালিদ রা. কে আসতে দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবেলা শুরু হয়। মল্লযুদ্ধের জন্য রোমানদের এক প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী বের হয়ে আসে। ওইদিকে হজরত খালিদ রা. এর ইশারায় তার অধীনস্থ এক আমির হজরত কায়েস বিন হুবায়রা তরবারি উন্মুক্ত করে সামনে আসেন। প্রতিপক্ষ নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে এমন আঘাত করেন যে, তরবারি তার ঘাড়সহ মাথা কেটে ফেলে।

এরপর ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বেই রোমান সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে পুনরায় মুসলমানদের ধনদৌলতের লালসা দেখিয়ে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। দূত পাঠিয়ে সন্ধির ব্যাপারে কথা বলার জন্য হজরত আবু উবাইদা রা. কে নির্ভরযোগ্য এক দূত পাঠানোর অনুরোধ জানায়।[১৫৯]

হজরত আবু উবাইদা রা. এর নির্দেশে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তাদের নিকট গমন করেন। তাদের সেনাপতি বাহান নিজের শান-শওকতের সঙ্গে বলে, হে আরবেরা, আমরা তোমাদের উত্তম প্রতিবেশী।

---

[১৫৮] তারিখুত তাবারি, ৩/৩৯৭; আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৬৫-১৬৮, ১৯৮

[১৫৯] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৭০-১৭২

তোমাদের যে গোত্রই আমাদের ভূমিতে এসেছে, আমরা তাদের সাথে সবসময় ভালো আচরণ করেছি। আমাদের আশা ছিল, আরবরা উত্তম আচরণের কারণে আমাদের কৃতজ্ঞ হবে। কিন্তু এর উলটো তোমরা আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে এখান থেকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছো। অথচ পারস্য সাম্রাজ্যসহ দুনিয়ার কেউই এ কাজে সফল হতে পারেনি। আর তোমরা তো দুনিয়ার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এবং মূর্খ জাতি। তোমাদের কীভাবে এমন দুঃসাহস হতে পারে? যাই হোক, আমরা তোমাদের বলছি, যদি তোমরা এখন চলে যাও, তা হলে আমরা তোমাদের প্রধান সেনাপতিকে দশ হাজার এবং অন্যান্য সেনাপতিকে এক হাজার এবং সাধারণ সৈনিকদের একশত দিনার করে প্রদান করব।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তার কথার উত্তরে বলেন, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য ও শান-শওকত সম্পর্কে আমরা ভালোভাবেই অবগত আছি। খ্রিষ্টান বানানোর জন্যই তো তোমরা আরবদের সাথে সদাচরণ করেছিলে। এই কারণে তাদের বহু গোত্র আজ খ্রিষ্টান হয়ে তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর তুমি আমাদের পশ্চাৎপদতা, মূর্খতা এবং প্রয়োজনগ্রস্ততার যে কথা বললে, নিঃসন্দেহে আমরা তার চেয়েও নিচু অবস্থানে ছিলাম। আমরা মরুভূমিতে জীবনযাপন করতাম। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর জুলুম করত। আমরা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করতাম। পাথরের পূজা করতাম। মোটকথা, আমরা ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা সেই সময় তার রাসুল পাঠিয়ে আমাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি আমাদেরকে কুফর-শিরকে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। ভ্রান্ত আকিদার লোকদের সাথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই একত্ববাদের পয়গাম অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। যে ব্যক্তি এটা মানবে সে আমাদের ভাই এবং যারা মানবে না তারা জিজিয়া প্রদান করে আমাদের হেফাজতে থাকতে পারে। যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে তার ফয়সালা করবে এ তলোয়ার।

বাহান এ কথা শুনে বুঝতে পারে, লড়াই ব্যতীত কোনো উপায় নেই।[১৬০]

---

[১৬০] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৭৭-১৮৪

মোটকথা, সাময়িক সময়ের বিরতি দিয়ে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। ঐদিন ফজর নামাজে হজরত আবু উবাইদা সুরা ফজর তেলাওয়াত করেন। যখন তিনি তেলাওয়াত করেন,

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

> অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কষাঘাত করলেন।[১৬১]

এই আয়াতে পৌছার পর মুসলমানরা বুঝতে পারল যে, অচিরেই রোমানদের উপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হবে এবং মুসলমানদের বিজয় হবে।[১৬২] এরপর উভয় দল পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের কিছুক্ষণ পূর্বে এক যুবক আবু উবাইদা রা. এর নিকট এসে বলেন, আমি প্রাণ উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো সংবাদ পৌছাতে চান তা হলে বলতে পারেন।

হজরত আবু উবাইদা আশান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, আমাদের সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশ করবে এবং বলবে, আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, সেগুলো পূর্ণ হয়েছে।

এই ঘটনাকে প্রাচ্যের কবি ইকবাল মরহুম এভাবে উল্লেখ করেছেন।

صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند

تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام

সারিবদ্ধ ছিল আরবের তরবারি-ধরা যুবকদল,
যেন শামের নববধূ মাটি, ছিল অপেক্ষায় রক্ত-মেহেদির

اک نوجوان صورت سیماب مضطرب

آکر ہوا امیر عسا کر سے ہم کلام

রুপার মতো উজ্জ্বল মুখ এক যুবক ছটফট করতে করতে,
বাহিনীর আমিরের কাছে এসে লাগল বলতে

---

[১৬১] সুরা ফাজর, আয়াত ১৩

[১৬২] আবু ইসমাইল আজদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১৭৭-১৮৪

اے بوعبیدہ رخصت پیکار دے مجھے

لبریز ہو گیا مرے صبر و سکوں کا جام

হে আবু উবাইদা, দিন, ছুটি দিন আমায়,
ধৈর্য ও স্থিরতার পেয়ালা যেন উপচে পড়ছে

بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں

اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

হয়েছি অস্থির রাসুলের প্রেম-বিরহে,
বিরহ-জ্বালায় মুহূর্তের জীবনও হারাম হয়ে গেছে,

جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں

لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام

যাচ্ছি আমি মহান রাসুলের পবিত্র চরণে,
বলুন, থাকে যদি কোনো পয়গাম, নিয়ে যাবো খুশি মনে

یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ

جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام

এ আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে নির্মিলিত হলো সেই চোখ,
দৃষ্টি ছিল যার, উন্মুক্ত তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণ

بولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو

پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام

বললেন বাহিনীর আমির, তুমিই সেই যুবক,
পদক্ষেপে যার আছে সম্মান প্রেমের অবধারিত

پوری کرے خدائے محمد تری مراد

کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام

পূর্ণ করুন মুহাম্মাদ সা. এর প্রভু বাসনা তোমার,
কতই-না উন্নত ভালোবাসার স্তর তোমার

پہنچے جو بارگاہ رسول امیں میں تو

کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام

পৌছবে যখন তুমি সত্যবাদী সেই রাসুলের দরবারে,
সালাম পেশ করে শুধু এইটুকু নিবেদন করবে,

ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے

پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے

মহা মর্যাদাবান প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করেছেন
সত্য হয়েছে তা-ই, নবীজি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই যুবকই সর্বপ্রথম যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লড়াই করতে করতে সে শহিদ হয়ে যায়।[১৬৩] কেউ কেউ বলেছেন, এই যুবক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যায়নাবের ছেলে আলি বিন আবুল আস ছিলেন। কিন্তু কোনো বর্ণনার মাধ্যমে এই দাবির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, একটি বক্তব্য অনুযায়ী আলি বিন আবুল আস ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধ বক্তব্য অনুযায়ী তিনি শৈশবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১৬৪]

অবশেষে রোমানরা রীতিমতো আক্রমণ শুরু করে। তাদের ৩০ হাজার সৈন্য শেকল বেঁধে লড়াই করতে এসেছিল, যেন পলায়নের চিন্তা মাথায় না আসে। সামনে হাজার হাজার তিরন্দাজ ছিল। তারা তিরবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে আসছিল। এরপর ছিল বর্শাধারী সৈনিক। যারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাদের পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল। মুসলমানদের ডান বাহু—আযদ গোত্র অত্যন্ত সাহসিকতার

---

[১৬৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৫৬১

[১৬৪] আল ইসাবাহ, নং ৫৬৯৪। ইবনে আসাকিরের একটি উদ্ধৃতি তাদের একমাত্র দলিল। তাতে কোনো ধরনের উদ্ধৃতি ছাড়াই শুধু এতটুকু উল্লেখ রয়েছে,

ذكر بعض اهل العلم بالنسب انه قتل يرموك

বংশবিদ্যা সম্পর্কে অবগত কিছু কিছু আলেম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে মারা যান। (তারিখে দিমাশক, ৮/৪৩)

বর্ণনাটির সনদবিহীন হওয়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও এক বক্তব্য অনুযায়ী এটি বলা যেতে পারে যে, আলি বিন আবুল আস ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন; কিন্তু এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, আবু উবাইদার সাথে তার উল্লিখিত কথাবার্তা হয়েছিল? এই কারণেই তার সাথে কথোপকথনকারী এই যুবকের নাম কোথাও উল্লেখ হয়নি। ইয়ারমুকে হাজার হাজার মুসলমান শহিদ হয়েছে; কিন্তু এটা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই যুবকটি আলি বিন আবুল আস ছিল?

সঙ্গে লড়াই করছিল। খ্রিষ্টানরা সর্বাত্মক শক্তি ব্যয় করেও তাদেরকে পিছপা করতে পারছিল না। অপর দিকে ডান বাহু খ্রিষ্টানদের স্রোতের মুখে জমে থাকতে পারেনি। তাদের পা উপড়ে যায়। রোমানরা আক্রমণ করতে করতে মুসলমানদেরকে তাদের তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে যায়। এখানে মুসলিম নারীরা পুরুষদেরকে পিছপা হতে দেখে তাঁবুর খুটি উঠিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, যদি তোমরা পিছু হটো তা হলে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে ফেলব।

মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। তারা পুনরায় সামনে অগ্রসর হতে থাকে। মুয়াজ বিন জাবাল ঘোড়া থেকে নেমে বলতে থাকেন, আমি পায়ে হেঁটে শক্তভাবে লড়াই করতে পারি, তোমরা যারা ভালোভাবে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে পারো তারা ঘোড়াটা নিয়ে নাও।

তার ছেলে আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ বলেন, আমি এ ঘোড়ার হক আদায় করব। এরপর তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। পিতা-পুত্র বাঘের মতো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ওইদিকে জুবায়েদ গোত্রের সরদার হাজ্জাজ বিন আবদে ইয়াগুস ৫০০ মুজাহিদ নিয়ে রোমানদের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। তারা পিছু-হটে-যাওয়া-মুজাহিদদের পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈনিকদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান। এটা ছিল ডান বাহুর অবস্থা।

ওইদিকে মুসলমানদের বাম বাহু রোমানদের দুর্দান্ত আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটে যায়। তারা তাঁবু পর্যন্ত চলে আসে। এখানেও মুসলিম নারীরা আশ্চর্যজনক সাহসিকতার প্রমাণ দেন। রোমানদের মোকাবেলায় মুসলিমরা স্থিরচিত্তে বুকটান করে দাঁড়ান। মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, হজরত আমর ইবনুল আস, হজরত শুরাহবিল বিন হাসানার মতো বড় বড় সাহাবি এই দিকে ছিলেন। তারা পাহাড়ের মতো অটল থেকে যুদ্ধ করছিলেন।

হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. এর চতুর্দিকে বহু রোমান সৈন্য ছিল। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে শক্ত ভূমির ন্যায় স্থির হয়ে ছিলেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

> আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[১৬৫]

তিনি বারবার চিৎকার করে বলছিলেন, কে আল্লাহর সাথে ব্যবসা করবে?

যেই এই ডাক শুনেছে সেই ফিরে এসেছে। মুসলমানরা পিছপা হতে হতে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

আবু হুরাইরা রা. এর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি চিৎকার করে ডাকছিলেন, মুসলমানেরা! জান্নাতী আয়তলোচনা রমণীদের জন্য সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হও। আপন প্রতিপালকের জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাও।

হজরত আবু সুফিয়ান রা.-ও এভাবে মুজাহিদদেরকে উৎসাহ বৃদ্ধি করে আপন ছেলে হজরত ইয়াজিদ রা. এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। ইয়াজিদ রা. এক-চতুর্থাংশ সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। তিনি বলেন, বেটা, এই যুদ্ধে আমাদের প্রতিটি সৈন্য জানবাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করছে। তোমার উপর এখন অনেক জিম্মাদারি চলে এসেছে। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে নাও।

হজরত ইয়াজিদ রা. এই কথা শুনে আনন্দের সাথে লড়াই করতে থাকেন।

বাম বাহুর সেনাপতি হজরত কাবাস বিন আশইয়াম ছিলেন এক তুলনাহীন যোদ্ধা। তিনি এমন প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছিলেন যে, বারবার তার তরবারি ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বর্শা দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বারবার চিৎকার করে বলতে থাকেন, এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর নামে মরতে এবং মারতে শপথ করে আমার হাতে তরবারি উঠিয়ে দেবে? লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাকে হাতিয়ার প্রদান করত। আর তিনি পুনরায় শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

বাম বাহুতে হজরত হানজালা বিন জুয়াইয়া রা. অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। রোমানদের এক পাহলোয়ান আরবীয় পোশাক পরে সামনে আসে। সে বলে, 'হে আরবজাতি, তোমরা নিজেদের মরুভূমি এবং ইয়াসরিবের দিকে ফিরে যাও'। হজরত হানজালা রা.

---

[১৬৫] সুরা তাওবা, আয়াত ১১১

দেখামাত্রই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সে আক্রমণ করে তরবারির মাধ্যমে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু উভয় পক্ষের পাল্লা সমান সমান থাকে। অবশেষে হজরত হানজালা রা. বাহুতে আঘাত করে তাকে ভূপাতিত করে দেন। কিছু সময় পর উভয়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে যান। হজরত হানজালা রা. লক্ষ করেন যে, তার ঘাড়ের দিক থেকে কিছু অংশ শিরস্ত্রাণ মুক্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি লক্ষ্য স্থির করে সেখানে আক্রমণ করেন। তরবারি লক্ষ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

মুসলিমবাহিনীর মধ্যভাগের সেনাপতি ছিলেন হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা.। তিনি হাটুতে বিদ্ধ হওয়া বর্শা সামলে আপন স্থানে জমে থেকে লড়াই করছিলেন। শত্রুদের হামলা মোকাবেলা করছিলেন। তাদের প্রত্যেক সারির উপর হামলা করে তাদেরকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[১৬৬]

হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রা. রোমানদের উপর এত প্রবল আক্রমণ করেছিলেন যে, দুইবার তাদের সারি ভেদ করে এক মাথা থেকে অন্য মাথা দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ফেরার সময় তার কাঁধে শত্রুর আঘাতে দুটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়।[১৬৭]

লড়াইয়ের ময়দান ভীষণ উত্তপ্ত ছিল। ফলে তারা সকলেই চেতনা ও হুঁশহীন হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত হুবাস বিন কায়েস এমন প্রবল আক্রমণ করছিলেন যে, শত্রুর আঘাতে তার পা কেটে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তিনি তা বুঝতেই পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পর ব্যথা অনুভব হলে তিনি নিজের পা খুঁজতে থাকেন।[১৬৮]

এ সময় হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. অশ্বারোহীদের নিয়ে আক্রমণ করেন। তাদের ১০ হাজার সৈন্যকে পিষে ফেলেন। সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত তুমুল লড়াই চলতে থাকে। কে জিতবে তা অনুমান করা যাচ্ছিল না। কিন্তু হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বুঝে গিয়েছিলেন যে, রোমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত; তাই তিনি অশ্বারোহীদের সাহস প্রদান করে

---

[১৬৬] আজদি প্রণীত ফুতুহুশ শাম, ১০০-১১৭
[১৬৭] সহিহ বুখারি, ৩৭২১, ৩৯৭৫
[১৬৮] ফুতুহুল বুলদান, ১৩৮

বলেন, মুসলমানগণ, রোমানদের যতটুকু শক্তি ছিল, তারা সেটা প্রদর্শন করে ফেলেছে। এখন তাদের উপর এক জোরদার হামলা করো। আল্লাহর কসম, আমাদের এখনই বিজয় অর্জন হয়ে যাবে।

এটা বলে তিনি ১ হাজার দক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে রোমানদের ১ লক্ষ অশ্বারোহীর উপর আক্রমণ করেন। এতে তাদের কাতার সম্পূর্ণ উলটে যায়।

ওইদিকে হজরত কায়েস বিন হুবাইরা তাজাদম সৈন্যদের সাথে বাম বাহুর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ বের হয়ে রোমানদের সারি ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

মুসলিমবাহিনীর মাঝখান থেকে হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. তাকবিরধ্বনির মাধ্যমে আক্রমণ করে রোমানদের মাঝখানের অংশকে মাঠের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান।

এইবার রোমানদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। তারা আর স্থির থাকতে পারছিল না। মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। সন্ধ্যার মধ্যেই ইয়ারমুকের ময়দানে বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যায়। ১ লক্ষাধিক রোমান সৈন্য নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার সৈনিক শাহাদাত বরণ করেন। যাদের মধ্যে হজরত জিরার বিন আযওয়ার এবং হজরত হিশাম বিন আসের মতো বড় ব্যক্তিরাও শামিল ছিলেন।

হিরাক্লিয়াস তখন এন্তাকিয়ায় বসে আপন সম্প্রদায়ের ভাগ্যলিপি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর এশিয়াকে সর্বদার জন্য বিদায় জানিয়ে সে কনস্টান্টিনোপল যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে।

শামের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সে এডিসায় পৌছেছে। কিছুদিন পূর্বে যে শহরে তার আকাশচুম্বী শৌর্য-বীর্য ছিল, এখন তা সম্পূর্ণরূপে উলটে যায়। আরবের ইসলামি বিপ্লব তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। সে অজান্তেই বলে ওঠে, 'আলবিদা হে শাম, তোমাকে অন্তিম সালাম!' এরপর সে ঘোড়ায় চড়ে বিদায় নেয়।

পারস্যের রণক্ষেত্রে

ইরানে তখন লাগাতার যুদ্ধ চলছিল। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ১৩ হিজরিতে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নির্দেশে ইরানে নিযুক্ত অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শামে চলে এসেছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে পারস্যের অধিকৃত অঞ্চলগুলোর বিশাল জিম্মাদারি হজরত মুসান্না বিন হারিসা রা. এর কাঁধে অর্পিত হয়েছিল। তার সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল ইরাকের ঐতিহাসিক শহর হিরাতে।

ওই সময় শাহরিরান নামক এক যোদ্ধাবাজ নেতা পারস্যের মসনদে সমাসীন ছিল। সে পারসিকদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে চাচ্ছিল। পূর্বের অল্প বয়স্ক বাদশাহ আরদশির বিন শেরওয়াইহকে হত্যা করে সে সিংহাসন দখল করে। এই শাসক যদিও সাসানি-গোষ্ঠীভুক্ত ছিল না; কিন্তু ইতিপূর্বে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকায় সামরিক বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল।[১৬৯]

যখন সে জানতে পারে যে, মুসলমানদের অর্ধেক সৈন্য রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছে তখন সে ১০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে হিরা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালায়। মুসান্না তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করে অগ্রসর হন। প্রাচীন আরব শহর- ব্যাবিলনের নিকট গমন করেন। সেখানে তিনি পারসিকদের মোকাবেলা করেন। মুসলিমবাহিনীর ডান এবং বাম বাহুতে হজরত মুসান্নার ভাই মুআন্না এবং মাসুদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করে নিজেদের বাহাদুরির প্রমান রাখেন। পরিশেষে পারস্য সম্রাটের পরাজয় হয়। মুসলমানরা তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যান। যেহেতু মুসলমানদের সৈন্য কম ছিল এজন্য মুসান্না

---

[১৬৯] আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার, ১/৫৫, ৫৬

অভিযানটি এখানেই মুলতবি করেন। এরপর তিনি দরবারে খেলাফতে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে মদিনার দিকে মার্চ করেন।[১৭০]

হজরত মুসান্না বিন হারিসার মদিনা গমন

এটা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অন্তিম সময় ছিল। হজরত মুসান্না ওই অবস্থায় তাকে ইরাকের রণক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর আবেদন করেন। যেহেতু মদিনা এবং আরবের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ শামের রণক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল এজন্য নতুন যোদ্ধা ভর্তি করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. সে সময় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি হজরত উমর ফারুক রা. কে ডেকে বলেন, 'সম্ভবত এটি আমার জীবনের শেষদিন। যদি আমি আজ মৃত্যুবরণ করি তা হলে তুমি সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা করা ব্যতীত লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে মুসান্নার সাথে পাঠিয়ে দেবে। আমার শোক যেন তোমাকে এই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান না করে।'

আবু বকর সিদ্দিক রা. সে-রাতেই মৃত্যুবরণ করেন। হজরত উমর ফারুক রা. পরদিন লোকজনকে মসজিদে নববিতে একত্র করে পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা শুরু করেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি লোকজনকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। পরিশেষে বনি সাকিফের আবু উবায়েদ বিন মাসউদ জিহাদের জন্য সর্বপ্রথম নাম লেখান। তার গোত্রের লোকজনও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাম লেখানো শুরু করেন। এরপর অন্যান্য লোক শামিল হয়।

হজরত মুসান্না রা. কে তখন তাদের সামনে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, পারস্য সম্রাটের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে ভীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের শস্য-শ্যামল সীমান্ত জয় করে ফেলেছি। ইনশাআল্লাহ, এখন সামনের এলাকাও বিজিত হয়ে যাবে।'

---

[১৭০] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করার পর হজরত উমর রা. হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি রহ. কে আমির নির্ধারণ করেন। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ি। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আপত্তি করেন যে, সাহাবিগণ বিদ্যমান থাকতে একজন তাবেয়িকে কেন আমির নির্ধারণ করা হবে? তখন হজরত উমর ফারুক রা. উত্তর দেন, জিহাদের ডাকে যে সর্বপ্রথম লাব্বাইক বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আমির বানাবো না।

এরপর হজরত উমর ফারুক রা. হজরত আবু উবায়েদ সাকাফিকে সেনাবাহিনীতে বিদ্যমান সাহাবিদের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করার এবং সৈন্যদের সাথে ভালো আচরণ করার উপদেশ প্রদান করে বিদায় জানান।[১৭১]

পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ

পারস্যের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। একজন শাসক ক্ষমতা স্থির করার পূর্বেই অন্যজন তার সিংহাসন উলটে দিত। এই সময়ে ইরানে একধরনের পরিবর্তন আসে। পারস্যের আমিরগণ তাদের প্রধান সেনাপতি শাহরিরানকে- যে ইতিপূর্বে শেরওয়াইহ-এর পুত্র আরদশিরকে হত্যা করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল—হত্যা করে পারস্যের রাজসিংহাসনে পারভেজের মেয়ে বুরানকে বসায়। রাজবংশে তখন শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার মতো কোনো পুরুষ ছিল না বিধায় এ মেয়েকে সিংহাসনে বসানো হয়।

বুরান রাজনৈতিক বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দেয়। সে সামরিক বিষয়ে পারস্যের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি রুস্তম পাহলোয়ানকে মুসলমানদের মোকাবেলা করার দায়িত্ব অর্পণ করে। রুস্তম আরবের সীমান্ত এলাকায় জমিদার এবং কৃষকদের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উসকে দেয়। সে মুসলমানদের থেকে ইরাকের অধিকাংশ অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। হজরত মুসান্না রা. ততক্ষণে খেলাফতের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন করে ফিরে এসেছিলেন। তখন হিরা অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি এটাও জানতে পারেন যে, রুস্তমের এক সেনাপতি জাবান ফুরাত নদীর তীর ধরে এগিয়ে

---

[১৭১] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

আসছে। অপর বাহিনী নার্সি নামক সরদারের নেতৃত্বে কাসকার অভিমুখে রওনা হয়েছে।

হজরত মুসান্না রা. এটা শোনামাত্রই হিরা খালি করে পেছনে সরে আসেন। তিনি হজরত আবু উবায়েদ সাকাফির নেতৃত্বে আগমনকারী বাহিনীর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। একসময় আবু উবায়েদের সাহায্যকারী বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। তারা হজরত মুসান্না রা. এর বাহিনীর সাথে নামারিক নামক স্থানে জাবানের সাথে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এটা ছিল উমর রা. প্রেরিত প্রথম কোনো বাহিনী। তারা ঘোরতর লড়াইয়ের পর বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেন।

পারস্যের সেনাপতি জাবান পরাজিত হয়ে গ্রেফতার হয়; কিন্তু গ্রেফতারকারী মুসলমানরা তার মর্যাদা সম্পর্কে জানত না। এজন্য জাবান তাদের অজান্তেই ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা করে। নিজের পরিবর্তে দুটি যুবক গোলাম দেওয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা হাসিল করে নেয়। ইতিমধ্যে অন্য মুসলমানেরা তাকে চিনে ফেলে। তাকে ধরে প্রধান সেনাপতি হজরত আবু উবায়েদ সাকাফির নিকট উপস্থিত করা হয়। বলা হয় সে পারস্যের সরদার জাবান। তাকে হত্যা করে ফেলা হোক।

আবু উবায়েদ সাকাফি সমস্ত ঘটনা জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে, এমন বড় দুশমনকে ছেড়ে দেওয়াটা অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু তিনি অঙ্গীকার পূরণের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত কায়েম করে বলেন, একজন মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। আর মুসলমান সকলেই এক দেহের ন্যায়। একজনের ওয়াদা সকলের ওয়াদা বলে গণ্য হয়। আমি ভয় করি তাকে হত্যা করে না জানি গুনাহগার হয়ে যাই।[১৭২]

এরপর হজরত আবু উবায়েদ কাসকার-অভিমুখে রওনা হন। এখানে সেনা বিন্যস্ত করে অপেক্ষমাণ নার্সির বাহিনীকে আক্রমণ করে তিনি ভাগিয়ে দেন। এই পরাজয় সম্পর্কে অবগত হয়ে আরেক প্রসিদ্ধ সরদার জালিনুসকে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি তাকেও পরাজিত করে

---

[১৭২] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠিয়ে দেন। জালিনুস বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে রুস্তমের নিকট পৌঁছে যায়।

জঙ্গে জিসির (পুলের যুদ্ধ)

এরপর রুস্তম পারসিকদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সিপাহসালার বাহমান জাদাবিয়াকে লড়াইয়ের জন্য নির্বাচন করে। তার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সাহস বৃদ্ধির জন্য শামের শাহি পতাকা 'দেরাফশ কাবিয়ানি' প্রদান করে। এই বাহিনী ফুরাত নদীর পূর্ব অংশ কুসসুন নাতেফে অবতরণ করে। ইসলামি বাহিনী পশ্চিম অংশ মারবাহায় শিবির স্থাপন করেছিল। ১৩ হিজরির শাবান মাস ছিল তখন। যুদ্ধের পূর্বের রাতে মুসলমানদের সেনাপতি হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি রহ. এর স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি আকাশ থেকে শরবতের পাত্র নিয়ে অবতরণ করেছে। আবু উবায়েদসহ কয়েকজন মুসলমান সেই শরবত পান করেন। হজরত আবু উবায়েদ এ স্বপ্ন শুনে স্ত্রীকে বলেন, আল্লাহ চান তো এতে শাহাদাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বে পারস্যের সিপাহসালার বাহমান হজরত আবু উবায়েদকে আহ্বান করে বলে, তোমরা নদীর নিকট চলে আসো কিংবা আমাদেরকে নদী পার হওয়ার সুযোগ প্রদান করো।

উত্তরে হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি মুসলমানদের সাহসিকতা প্রকাশ করার জন্য নিজেরাই নদী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নেন। তার অভিজ্ঞ সাথিরা এই সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করলে তিনি বলেন, পারসিকদের নিকট প্রমাণ হতে দেব না যে, আমরা মৃত্যুকে ভয় পেয়ে থাকি।

অবশেষে নদীতে সাঁকো বাধা হয়। মুসলমানরা নদীর ওপারে চলে যান।[১৭৩]

যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই বুঝা যায় যে, এত বিশাল বড় বাহিনীর জন্য এ ময়দান অত্যন্ত সংকীর্ণ। সামান্য পিছু হটলেই সমুদ্রে মুসলিমদের সলীল সমাধি হওয়ার উপক্রম হবে।

---

[১৭৩] সাঁকোকে আরবিতে জিসির বলা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধটিকে হারবুল জিসির বলা হয়।

তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেলে পারসিকরা নিজেদের যোদ্ধা হাতিগুলোকে মুসলমানদের বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

আরবি ঘোড়া ইতিপূর্বে হাতি দেখেনি। এই কারণে ঘোড়াগুলো হাতি দেখে ভীত হয়ে যায়। মুসলমানরা যখন আক্রমণের চেষ্টা করত ঘোড়াগুলো তখন তাদের সঙ্গ দিত না। পারসিকরা যখন হাতি নিয়ে অগ্রসর হতো মুসলমানদের ঘোড়া তখন এদিক-ওদিক চলে যেত। যুদ্ধের সারি বিনষ্ট হয়ে যেত। পাশাপাশি পারসিকরা তির নিক্ষেপ করছিল। ফলে মুসলমানদের বহুল পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছিল।

এই চরম সংকটপূর্ণ অবস্থা দেখে মুসলমানদের সেনাপতি হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি কোষমুক্ত করে হাতিগুলোর দিকে এগিয়ে যান। তার সাথে সাথে আরও অনেকেই এভাবে অগ্রসর হন। তারা হাতিগুলোর উপর আক্রমণ করেন। হাতি কাউকে নিকটে আসতে দিচ্ছিল না। হজরত আবু উবায়েদ উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করছিলেন, হাতির পেট বিদীর্ণ করে দাও, তাদের হাওদা উলটে দাও।

মুসলমানরা প্রাণ হাতে নিয়ে হাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছু হাতি মারা যায়। হাতির আরোহীদের উপর আক্রমণ করা হয়। হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি নিজে সাদা হাতির সঙ্গে মোকাবেলা করছিলেন। এটা সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী ছিল। শেষে তিনি তরবারির মাধ্যমে শক্তভাবে আঘাত করেন। হাতি এ আঘাত খেয়ে হজরত আবু উবায়েদকে শুঁড় দ্বারা প্যাঁচিয়ে ফেলে। এরপর তাকে নিজের পাহাড়সম পা দ্বারা পিষে ফেলে। হজরত আবু উবায়েদের দেহ পিষ্ট হয়ে যায়। তিনি সেখানে শহিদ হয়ে যান।

এই দৃশ্য দেখে মুসলমানরা ঘাবড়ে যান। ঐদিকে আবু উবায়েদ থেকে পড়ে যাওয়া পতাকা সাকিফ গোত্রের অপর জানবাজ উঠিয়ে নেন। তিনি ওই হাতির উপর আক্রমণ করে তাকে আবু উবায়েদের লাশ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। হাতিটি লাশ সরাতে আসা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে তাকেও পিষে ফেলে। এভাবে একের পর এক সাকিফ গোত্রের সাতজন পতাকা হাতে নিয়ে আক্রমণ করে শহিদ হয়ে যান।[১৭৪]

---

[১৭৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।→

এই মুষ্টিমেয় জানবাজ ব্যতীত সকল মুসলমান পিছপা হতে থাকে। এই অবস্থা দেখে বনু সাকিফের এক প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিক নদীতে নির্মিত সাঁকো ভেঙ্গে ফেলেন, যাতে মুসলমানদের মন থেকে পলায়নের চিন্তা বের হয়ে যায় এজন্য তিনি এমনটা করেছিলেন। এখন মুসলমানদের পিছু হটার সুযোগ শেষ হয়ে যায়। পারসিকরা তাদেরকে ধাওয়া করে নদীতে ফেলতে থাকে। এভাবে হাজার হাজার মুসলমান আহত ও শহিদ হয়ে যান।

এই নাজুক সময়ে হজরত মুসান্না বিন হারিসা রা. আহত হয়েও অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলমানদেরকে সাহস যোগাতে থাকেন। তিনি কিছু মুজাহিদ নিয়ে পারসিকদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। পাশাপাশি নদীতে সাঁকোর ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি মুজাহিদদের লক্ষ করে বলেন, আমি তোমাদের রক্ষার জন্য বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে যাও।

তার দৃঢ়তার ফলে অবশিষ্ট মুসলমানদের বেঁচে যাওয়ার রাস্তা মিলে যায়। হজরত মুসান্না অবশিষ্ট ৩ হাজার মুসলমানকে নিয়ে ফিরে আসেন। ৯ হাজার মুজাহিদের মধ্যে ৪ হাজার শত্রুপক্ষের তরবারি এবং নদীর ঢেউয়ে নিঃশেষ হয়ে যান। আর দুই হাজার এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পড়ে পলায়ন করেন।

যুদ্ধে যদিও ৬ হাজার পারসিক মারা গিয়েছিল; কিন্তু পরিশেষে তাদের বিজয় হয়েছে। নববি-যুগ থেকে তখন পর্যন্ত মুসলমানদের এত বড় পরাজয় আর ঘটেনি।

দুঃখজনক বিষয় হলো আবু উবায়েদ সাকাফির মতো মর্দে মুজাহিদ ও শহিদের ছেলে মুখতার সাকাফি মুসলিম উম্মাহর নিকৃষ্টতরো ব্যক্তি ছিল। এমনকি সে একসময় মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার হয়ে যায়। এ বাস্তবতা একথার প্রমাণ বহন করে যে, কখনো কখনো ভালো মানুষদের সন্তানরা নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এমনকি খাইরুল কুরুনও নিকৃষ্ট ব্যক্তি থেকে খালি ছিল না। কিন্তু কিছু মানুষ খাইরুল কুরুনের কুখ্যাত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের ভালো এবং নেককার আখ্যা দেওয়ার জন্য বলে থাকে যে, তারা তো সালিহিনের বংশধর! তারা তো খাইরুল কুরুনের লোক! তারা কীভাবে খারাপ হতে পারে? এটা মোটেই যুক্তিসম্মত দলিল নয়।

হজরত উমর ফারুক রা. এ ঘটনা জানতে পেরে ভীষণ কষ্ট পান। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু উবায়েদের উপর রহম করুন। আফসোস! যদি সে পিছু হটে আমার নিকট চলে আসতো, তা হলে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো।[১৭৫]

জিসিরের প্রতিশোধ : বুআইব যুদ্ধ

একটিমাত্র ময়দানে বিজয়ী হয়ে পারসিকদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল অনেক। অপরদিকে মুসলমানরা লজ্জিত হয়ে পেরেশান ছিলেন। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। উমর ফারুক রা. এর দৃষ্টি থেকে বিষয়টি মুহূর্তের জন্যও হারিয়ে যায়নি। তিনি জিহাদের ডাক দেন। স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে হজরত মুসান্না রা. এর সাহায্যে পাঠানো শুরু করেন। বাজিলা গোত্রের সরদার জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রা. আপন বাহিনী নিয়ে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। হজরত মুসান্নাও নিজ গোত্র থেকে নতুন যুবকদের ভর্তি নেন। এভাবে মুসলমানদের সামরিক অবস্থা মজবুত হয়।

পারস্যের প্রধান সেনাপতি রুস্তম মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা শোনামাত্র মিহরানকে একদল পাষাণ-দিল সেনা দিয়ে প্রেরণ করে। এটা ১৪ হিজরির রমজানের ঘটনা। ফুরাত নদীর তীরে বুআইব নামক স্থানে উভয় পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয়। হজরত মুসান্না বিন হারিসা রা. এবার নদী অতিক্রম করার ভুল করেননি; বরং প্রতিপক্ষকে নদী অতিক্রম করার জন্য আহ্বান জানান।

পারসিকরা পূর্বের বিজয়ের নেশায় মুসলমানদের স্বাভাবিক হিসেবে নেয়। এজন্য তারা নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে নদী পার হয়ে অপর পারে চলে আসে। মুসলমানরা পিছু সরে গিয়ে তাদের জন্য খোলা ময়দান ছেড়ে দেয়। এরপর তারা সারিবদ্ধ হয়ে যায়। হজরত মুসান্না রা. এর এক ভাই হজরত মুআন্না অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। হজরত মাসউদ পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। হজরত মুসান্না বিন হারিসা রা. কাতারে হেঁটে হেঁটে মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন, আমি তিনবার তাকবির বলবো।

---

[১৭৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

তোমরা এর মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। চতুর্থ তাকবির বলার পর একসঙ্গে একযোগে আক্রমণ চালাবে।

এরমধ্যে পারসিকরা সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের সারি ছিল তিনটি। প্রতিটি সারিতে অশ্বারোহী এবং পদাতিক ছাড়াও জঙ্গি হাতি ছিল। তাদের যুদ্ধের নাকারা বাজানোর আওয়াজ অত্যন্ত উঁচু ছিল। ফলে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

হজরত মুসান্না আপন বাহিনীকে বুঝিয়ে বলেন, তোমরা যা দেখছ, সেটা তাদের কাপুরুষতার প্রমাণ। তোমরা নিয়মনীতি অনুযায়ী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাক।

কিছু সময় পর হজরত মুসান্না পরপর তিনবার তাকবিরধ্বনি উচ্চারণ করেন। মুসলমানরা হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পর্যন্ত চতুর্থ তাকবিরধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। এর মধ্যেই বনু ইজলের কিছু অশ্বারোহী কাতার থেকে বের হয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

হজরত মুসান্না রা. অত্যন্ত আফসোস করে নিজের দাড়িগুলো মুষ্টির মধ্যে নিয়ে চিৎকার করে বলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা আজ ইসলামকে লাঞ্ছিত করো না।'

অশ্বারোহীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে।

এরপর সেনাপতির নির্দেশনা অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ শুরু হয়। হজরত মুসান্না সেনাবাহিনীর মাঝ অংশের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রতিপক্ষের মাঝ অংশের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হটিয়ে ডান বাহু পর্যন্ত নিয়ে যান। এখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। লড়াইয়ের ফলে যেন কারো কোনো হুঁশ ছিল না।

লড়াইয়ে পারসিক সেনাপতি মিহরান মারা যায়। এর ফলে পারসিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। অপরদিকে মুসলমানদের ডান ও বাম বাহু পারসিক বাহিনীর অপর অংশের উপর আক্রমণ করে তাদেরকেও পিছু হটিয়ে মাঠের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান। পারসিকদের জন্য তখন নদী অতিক্রম ব্যতীত কোনো রাস্তা ছিল না। কিন্তু ততক্ষণে হজরত মুসান্না নিজের কিছু জানবাজ সাথিকে নিয়ে সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে যান। তাদের পলায়নের রাস্তা বন্ধ করে দেন।

পারসিকরা জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্‌বিদিক পলায়ন করতে থাকে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। শুধু গোটা রাত নয়; বরং পরের দিনও এই অবস্থা চলতে থাকে। মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। পারস্যের ১ লক্ষ সৈন্য মারা যায়। পুনরায় আরবের বাইরে মুসলমানদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। নিহত পারসিকদের হাড়গোড় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষার উপকরণ হয়ে থাকে। এই লড়াইয়ে হজরত মুসান্না রা. এর ভাই মাসউদ শহিদ হন। হজরত মুসান্না রা. তার জানাজা পড়ান। তিনি বলেন, এটা ভেবে আমার চিন্তা লাঘব হয়ে যাচ্ছে যে, আমার ভাই ময়দানে জমে লড়াই করেছে। সে পরাজিত হয়নি।[১৭৬]

ইয়াজদাগিরদ : সর্বশেষ পারস্য সম্রাট

বুআইবের পরাজয় পারসিকদের পঙ্গু করে দেয়। তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, কোনো নারীর নেতৃত্বে থেকে আরবদের মোকাবেলা করা যাবে না। পারস্যের দরবারে এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিসরার সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষকে সিংহাসনে বসানো আবশ্যক। তাই সভাসদবর্গ রানি বুরান দুখতকে পদচ্যুত করে। তারা বেশ অনুসন্ধান করে সাসানি বংশের একুশ বছরের যুবক ইয়াজদাগিরদকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচন করে। তার নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তারা কোমর বেঁধে নামে। এই ইয়াজদাগিরদই পারস্যের সর্বশেষ সম্রাট ছিল।[১৭৭]

এইবার পুনরায় পাহলোয়ান রুস্তমের কাঁধে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পাশাপাশি তাকে এই হুমকিও দেওয়া হয় যে, ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

রুস্তম তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। সে প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং বসতিগুলোকে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। ইয়াজদাগিরদ সিংহাসনে আরোহণের ফলে লোকদের ভেঙ্গে-পড়া-মনোবল পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ

---

[১৭৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।
[১৭৭] আল আখবারুত তিওয়াল, ১১৯

করে মুসলমানদেরকে তাদের সকল বিজিত অঞ্চল থেকে বের করে দেয়। এটা ১৩ হিজরির জিলকদ মাসের ঘটনা।

উমর ফারুক রা. এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ মুসান্না রা. কে পেছনে সরে এসে আরব-সীমান্তে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি নতুনভাবে সেনাবাহিনী তৈরির কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ আমি পারসিক শাহজাদার মোকাবেলায় এখন আরবের শাহজাদাদের পাঠাবো। দূত পাঠিয়ে আরবের সকল স্তরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত লোক, গোত্রপতি, প্রসিদ্ধ বাহাদুর, ভালো কবি এবং অগ্নিঝরা বক্তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তাদেরকে মদিনায় আসার দাওয়াত প্রদান করেন। তখন হজের সময় নিকটবর্তী ছিল। হজরত উমর ফারুক রা. হজের জন্য মক্কায় যান। ওই সময় তার পক্ষ থেকে আরবের সকল অলিগলিতে জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়ার সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়।[১৭৮]

তিনি যখন হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ততক্ষণে মদিনায় হাজার হাজার মুজাহিদ স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য চলে এসেছিল।

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা ব্যতীতও কার কাঁধে এ জিম্মাদারি ন্যস্ত করা হবে—এ ব্যাপারে হজরত উমর রা. এর মাথায় অত্যন্ত কঠিন জিম্মাদারি এসে পড়েছিল। ইরাকের সিপাহসালার হজরত মুসান্না জঙ্গে জিসিরের ক্ষত থেকে তখন পর্যন্ত সুস্থ হননি। প্রতিনিয়ত তার অসুস্থতা বেড়েই চলেছিল। হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হজরত আমর ইবনুল আস-এর মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেনারেলরা শামের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে আনার সুযোগ ছিল না। এদিকে পারস্যের ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির সংবাদের মাধ্যমে এটা অনুমিত হচ্ছিল যে, এখন যে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এর উপর উভয় শক্তির পরিপূর্ণ জয় কিংবা শোচনীয় পরাজয় নির্ভর করছে। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর হজরত উমর ফারুক রা. নিজেই যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার ফয়সালা করেন। তার বিশ্বাস ছিল, এর মাধ্যমে মুসলমানদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

---

[১৭৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৩ হিজরির অধীনে এই আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে। তারা পারস্যের যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে।

তিনি ১৫ হিজরির মহররম মাসে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করেন। হজরত আলি রা. কে মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেন। সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে পৌছান। এটা দেখে চারিদিকে একধরনের উদ্দীপনা তৈরি হয়ে যায়। সকলে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নেয়। তিনি মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে সিরার নামক ঝরনার নিকট পৌছেন। এখানে প্রবীণ সাহাবিদের সঙ্গে কথা বলে সেনাবাহিনীর মূল নেতৃত্ব নিজের হাতে রেখে তিনি ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার মত প্রকাশ করেন। এরপর তিনি এ ব্যাপারে তাদের অভিমত জানতে চান। কয়েকজন সাহাবি ইতিবাচক মত প্রকাশ করলেও হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. বিনাসংকোচে এর বিরোধিতা করে বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ্ না করুক, যদি আপনি পরাজিত হয়ে যান তা হলে সকল যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে। আমার মত হচ্ছে, আপনি মদিনায় অবস্থান করুন এবং কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান।

হজরত উমর ফারুক রা. তার কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে রণক্ষেত্রে যাওয়ার ইচ্ছা বাতিল করেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা হলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কাকে দেওয়া হবে?

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. বলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে।

হজরত উমর ফারুক রা. তার সাথে একমত হয়ে হজরত সা'দ রা. কে সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তাদেরকে বিদায় দেওয়ার সময় উমর রা. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন। বলেন : হে সা'দ, এ বিষয়টি যেন তোমাকে অহমিকায় ফেলে না দেয় যে, তুমি আল্লাহর রাসুলের মামা এবং তার সাহাবি। আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণকে অনিষ্টের মাধ্যমে নয়; বরং নেককাজের মাধ্যমে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সঙ্গে কারো কোনো ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে শুধু আনুগত্যের সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ উঁচুস্তরের হোক কিংবা সাধারণ পর্যায়ের, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তারা সকলেই

সমান। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি যেভাবে দেখেছ সবসময় সেভাবে চলবে। এটাই আমাদের বুনিয়াদ। তোমাকে অনেক বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। তাই সবসময় ধৈর্যের লাগাম আঁকড়ে থাকবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। স্মরণ রাখবে, দুই জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটি হলো আল্লাহর আনুগত্য, দ্বিতীয়টি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের মানসিকতা তৈরি হয়। আর দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং পরকালের প্রতি উদাসীনতার কারণে গুনাহের মানসিকতা তৈরি হয়।

কেউ যদি মানুষের মাঝে প্রিয় ও পছন্দনীয় হতে চায়, তা হলে তার এ মানসিকতার বিরোধিতা করবে না। নবীগণই এ দোয়া করেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে ভালোবাসলে মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। আর তিনি কারো প্রতি ঘৃণা রাখলে মানুষের নিকট তাকে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেন। তাই আল্লাহর নিকট তোমার অবস্থা ও অবস্থান কী, সে সম্পর্কে জানার জন্য লক্ষ করো লোকে তোমার ব্যাপারে কী বলে।[১৭৯]

হজরত মুসান্না রা. এর মৃত্যু

উমর ফারুক রা. বিদায়কালে এই ৪ হাজার মুজাহিদের জন্য দোয়া করেন। তিনি তাদেরকে এমনভাবে বিদায় জানান, যেন তাদের প্রতিটি বিষয়ের সংবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তাদেরকে প্রতি কদমে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা তার নিকট সাধারণ ব্যাপার।

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ইরাকের সীমান্ত জারুদ নদী পর্যন্ত পৌছেছিলেন, এরই মধ্যে ইরাকযুদ্ধের সিপাহসালার হজরত মুসান্না রা. এর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌছে।

নিঃসন্দেহে হজরত মুসান্না রা. ইরাক ও পারস্যের জিহাদের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. যখন মুরতাদ ও

---

[১৭৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬১৩, ৬১৪; আল ইবার, ১৫ হিজরি।

খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন হজরত মুসান্না তখন একাই আপন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আরবের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পারস্যে গেরিলা হামলা শুরু করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজেই খলিফার দরবারে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের জন্য হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অনুমোদন লাভ করেন। তিনি স্বীয় কাজে সহযোগিতার জন্য কিছু সৈন্য নিয়ে যান। এরপর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিষয়টি স্তিমিত হওয়ার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে তার সাহায্যে প্রেরণ করেন। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর শামে যাওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হজরত মুসান্না রা. নিজেই ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনা করেন।[১৮০]

তার মৃত্যুর পর হজরত সা'দ রা. ইরাক-অঞ্চলের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। ওইদিকে হজরত উমর ধারাবাহিকভাবে ইরাকের রণাঙ্গনে তাজাদম মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করতে থাকেন। এভাবে একসময় হজরত সা'দ রা. এর পতাকাতলে সমবেত মুজাহিদের সংখ্যা ৩০ হাজারে পৌছে যায়। এদের মধ্যে তিন শতাধিক ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তাদের মধ্যে সত্তরের অধিক ছিলেন বদরি সাহাবি। সাহাবায়ে কেরামের ৭০০ নওজোয়ান ছেলেসন্তান এ বাহিনীতে শামিল হয়েছিলেন। ততক্ষণে হজরত মুগিরা বিন শুবা শামের রণক্ষেত্র থেকে সাহায্য নিয়ে পৌছে গিয়েছিলেন।[১৮১]

এর মধ্যেই হজরত উমর ফারুক রা. এর পক্ষ থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে কাদিসিয়া নামক স্থানে শিবির গড়ার নির্দেশনা এসে পৌছে। তিনি বলেন, এমনভাবে সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করবে যে, সামনে ইরাকের ময়দান থাকবে এবং পেছনে আরবের পাথুরে পাহাড় থাকবে। যেন বিজয় অর্জিত হলে সামনে অগ্রসর হওয়া যায় আর পিছু হটতে হলে যেন আরবের এ সকল পাহাড়ে মোর্চা বানানো যায়, যেগুলো সম্পর্কে পারসিকরা অবগত নয়।

---

[১৮০] উসদুল গাবাহ, হজরত মুসান্না রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[১৮১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬২৫, ৬৩০

পারস্যের রাজদরবারে ইসলামের দূত

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. কাদিসিয়া পৌছে নোমান বিন মুকাররিন, আসেম বিন আমর এবং মুগিরা বিন শুবাকে আরবের অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল পারস্য সম্রাট ইয়াজদাগিরদকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে তার সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

তারা মাদায়েনে পৌছার পর তাদেরকে দেখার জন্য স্থানীয় লোকদের এক বিশাল দল একত্র হয়ে যায়। ইসলামের জন্য প্রাণ-উৎসর্গকারী এ সকল মহান ব্যক্তির দেহে সাধারণ চাদর এবং পায়ে অতি সাধারণ জুতো ছিল। চাবুক হাতে তারা হ্যাংলা-পাতলা ঘোড়ায় আরোহণ করে ছিলেন। পারসিকরা হয়রান ও পেরেশান হয়ে পড়েছিল যে, এমন সাধারণ সৈন্যরা কীভাবে এত বড় বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে!!

প্রতিনিধিদলের প্রধান হজরত নোমান বিন মুকাররিন অত্যন্ত চমৎকার শৈলীতে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, যদি ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা বুঝে না আসে তা হলে জিজিয়া প্রদান করে মুসলমানদের অধীনে থাকা যেতে পারে। অন্যথায় যুদ্ধ অনিবার্য।

ইয়াজদাগিরদ তাদের দাওয়াত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলে, আমার জানামতে তোমাদের চেয়ে অধিক দুরাচারী, তোমাদের চেয়ে দুর্বল, বিক্ষিপ্ত ও অবাধ্য সম্প্রদায় আর একটিও নেই। আমরা যখনই তোমাদেরকে সোজা করতে চাইতাম তখন সীমান্তের কোনো শাসককে বলে দিতাম, যেন সে তোমাদের কান মলা দিয়ে আসে। তোমরা কখনো পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করতে পারতে না; বরং তোমরা এর বিরুদ্ধে তো মাথা ওঠানোর চিন্তাই করতে পারতে না। এখন যদি তোমাদের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে গিয়ে থাকে তা হলে এর ফলে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। হ্যাঁ, যদি দরিদ্রতা এবং ক্ষুধার কারণে তোমরা আমাদের এলাকায় আসতে বাধ্য হয়ে থাকো তা হলে আমাদের বলো, আমরা তোমাদের খাবারদাবার ও পোশাকআশাকের ব্যবস্থা করে দেব। আমরা তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করবো।

তাদেরকে উন্নত পোশাক দেব। তোমাদের জন্য তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো দয়ালু শাসক নির্ধারণ করে দেব। এবার বল তোমাদের খেয়াল কী?

ইয়াজদাগিরদের এই বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য শুনে হজরত মুগিরা বিন শুবা দাঁড়িয়ে যান। তিনি দরবারি সকল কৃত্রিমতা ঝেড়ে ফেলে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বলেন, বাদশাহ সালামত, আমার সাথে আসা সমস্ত ব্যক্তি আরবে অত্যন্ত সম্মানিত। তাদের ভদ্রতার প্রতি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি আমার সাথে কথা বলুন, আমি আপনার প্রত্যেকটি কথার জবাব দেব। আপনি আমাদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেটাতে আমাদের পূর্ববর্তী পশ্চাৎপদতার পূর্ণ অবস্থা ফুটে ওঠেনি। আপনি আমাদের দুরাচারের কথা আলোচনা করেছেন, হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে আমাদের চেয়ে দুরাচারী কেউ ছিল না। আমাদের মতো ক্ষুধার্ত কেউ ছিল না। আমরা কীটপতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছু ভক্ষণ করতাম। খোলা জমিনে আমাদের বাড়িঘর ছিল। আমরা উট ও ছাগলের পশমের তৈরি কাপড় পরিধান করতাম। অন্যকে হত্যা করা, জুলুম করা আমাদের অভ্যাস ছিল। আমাদের কেউ কেউ জীবিকার ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত ব্যক্তিকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেন, যিনি বংশ-পরিবার, প্রভাব-প্রতিপত্তি, গোত্র এবং শহর ছাড়াও নিজের ব্যক্তিগত উত্তম চরিত্র-গুণে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং দয়ালু হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি সত্য বলেছেন; কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছি। ধীরে ধীরে একসময় তার সাথি-সঙ্গী বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর আমরা পিছিয়ে পড়তে থাকি। একসময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরে তার সততার বিশ্বাস ঢেলে দেন। আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তার আনীত ধর্ম সত্য। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হলো, যারা এই ধর্ম মানবে, অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তারা তোমাদের সমান হবে। যে ব্যক্তি তা মানবে না তবে জিজিয়া প্রদান করবে, তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিতে হবে। আর যে এটা অস্বীকার করবে, তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তাই বাদশাহ সালামত, আপনি এখন চাইলে জিজিয়া দিতে পারেন, চাইলে যুদ্ধ করতে পারেন কিংবা চাইলে মুসলমান হয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে পারেন।

ইয়াজদাগিরদ তার এই কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বলে তোমরা কীভাবে আমার সাথে এ ধরনের কথা বলার সাহস করতে পারলে।

হজরত মুগিরা তৎক্ষণাৎ অনায়াসে বলেন, আপনি আমাদের সাথে এ জাতীয় কথা বলেছেন; তাই আমরাও আপনার সাথে এই কথা বললাম। আপনি যদি ওই সব কথা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় বলতেন তা হলে আপনাকে এ সকল কথা শুনতে হতো না।

এই কথা শুনে ইয়াজদাগিরদ রাগে লাল হয়ে যায়। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, যদি দূতহত্যা অবৈধ না হতো তা হলে আমি তোমাদেরকে জীবিত ছাড়তাম না। যাও, তোমাদের সেনাপতিকে বলে দাও, আমি রুস্তমকে তোমাদের মোকাবেলার জন্য পাঠাচ্ছি। সে তোমাদের সবাইকে কাদিসিয়ার পরিখায় দাফন করে দেবে। তোমাদেরকে অন্যান্যের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেবে।

তারপর সে নিজের সভাসদদের বলে, এক টুকরো মাটি নিয়ে তাদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তির মাথায় রাখো। এরপর তাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও। মাটির টুকরো আনা হলে প্রতিনিধিদলের মধ্যে থেকে হজরত আসেম বিন আমর রা. সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমিই তাদের সবচেয়ে বড়।

মাটির টুকরা তার মাথায় রাখার সাথে সাথে তিনি দ্রুত গতিতে বের হয়ে যান। তারপর সেটাকে ঘোড়ায় রেখে ঘোড়া চালিয়ে দেন।

ওইদিকে রুস্তম যখন মুসলমান প্রতিনিধিদলের সাথে ইয়াজদাগিরদের আচরণ সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে বড় আফসোসের সঙ্গে বলে, খোদার কসম, তারা আমাদের ভূখণ্ডের চাবি নিয়ে গেছে!

এরপর সে নিজের অধীনস্থদের বলে, যদি আমরা রাস্তায় তার থেকে মাটি নিয়ে নিতে পারি তা হলে বুঝে নিবে আমাদের রাজত্ব এবং রাষ্ট্র বেঁচে গেছে। কিন্তু যদি তাদের সেনাপতি পর্যন্ত এই মাটি পৌছে যায় তা হলে মনে রেখো আমাদের রাষ্ট্র তাদের কবজায় চলে যাবে।

এটা বলে সে কাদিসিয়া পৌছার পূর্বে দূত থেকে মাটির টুকরা বাজেয়াপ্ত করে আনার জন্য কিছু লোক পাঠায়। কিন্তু ততক্ষণে তূণীর থেকে তির বের হয়ে গেছে। হজরত আসেম বিন আমর রা. একের পর এক মনজিল

অতিক্রম করে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর নিকট পৌঁছে গিয়েছেন। মাটির টুকরা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সামনে রেখে তার নিকট সকল ঘটনা বর্ণনা করেন। হজরত সা'দ আনন্দিত হয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা পারস্য সাম্রাজ্যের চাবি দিয়ে দিয়েছেন!

রুস্তম যখন প্রতিনিধিদলের হাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার খবর জানতে পারে তখন তার বিশ্বাস হয়ে যায়, পারস্যের সূর্য অচিরেই অস্তমিত হয়ে যাবে।[১৮২]

রুস্তমের দরবারে

কাদিসিয়ার সৈন্যশিবিরে হজরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা আসছিল। তিনি তার এক চিঠিতে মুসলমানদেরকে শত্রুদের সংখ্যা এবং উপায়-উপকরণ দেখে ভীত না হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বেশি বেশি لا حول ولا قوه الا بالله পাঠ করার নসিহত প্রদান করেন।

হজরত সা'দ রা. এক মাস পর্যন্ত কাদিসিয়ায় অবস্থান করেন। এর মধ্যে পারস্যের বাদশাহ ইয়াজদাগিরদ রাজধানী থেকে রুস্তমের নেতৃত্বে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। ৮০ হাজার গোত্র তাদেরকে সহযোগিতা করছিল। রুস্তম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা পাওয়ার ব্যাপারে ততটা আশাবাদী ছিল না। সে ভগ্নহৃদয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়। যুদ্ধ পেছানোর জন্য সে খুব কম কম করে পথ চলছিল। জায়গায় জায়গায় অবস্থান করে অবশেষে সে 'সাবাত' নামক স্থানে শিবির গাড়ে।

তার বাহিনীর প্রথম কাতারে ৪০ হাজার যোদ্ধা ছিল, জালিনুস যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ডান বাহুতে ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। এর নেতৃত্ব ছিল হুরমুজানের হাতে। সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত অফিসার। বাম বাহুতে ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। তাদের কমান্ডার ছিল মেহরান, মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারে যার ভালো রকম অভিজ্ঞতা ছিল। মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্য এ ছাড়াও ৩৩টি জঙ্গি হাতি ছিল।

---

[১৮২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬২৫-৬২৯

অতিক্রম করে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর নিকট পৌছে গিয়েছেন। মাটির টুকরা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সামনে রেখে তার নিকট সকল ঘটনা বর্ণনা করেন। হজরত সা'দ আনন্দিত হয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা পারস্য সাম্রাজ্যের চাবি দিয়ে দিয়েছেন!

রুস্তম যখন প্রতিনিধিদলের হাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার খবর জানতে পারে তখন তার বিশ্বাস হয়ে যায়, পারস্যের সূর্য অচিরেই অস্তমিত হয়ে যাবে।[১৮২]

রুস্তমের দরবারে

কাদিসিয়ার সৈন্যশিবিরে হজরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা আসছিল। তিনি তার এক চিঠিতে মুসলমানদেরকে শত্রুদের সংখ্যা এবং উপায়-উপকরণ দেখে ভীত না হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে বেশি বেশি لا حول ولا قوه الا بالله পাঠ করার নসিহত প্রদান করেন।

হজরত সা'দ রা. এক মাস পর্যন্ত কাদিসিয়ায় অবস্থান করেন। এর মধ্যে পারস্যের বাদশাহ ইয়াজদাগিরদ রাজধানী থেকে রুস্তমের নেতৃত্বে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। ৮০ হাজার গোত্র তাদেরকে সহযোগিতা করছিল। রুস্তম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা পাওয়ার ব্যাপারে ততটা আশাবাদী ছিল না। সে ভগ্নহৃদয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়। যুদ্ধ পেছানোর জন্য সে খুব কম কম করে পথ চলছিল। জায়গায় জায়গায় অবস্থান করে অবশেষে সে 'সাবাত' নামক স্থানে শিবির গাড়ে।

তার বাহিনীর প্রথম কাতারে ৪০ হাজার যোদ্ধা ছিল, জালিনুস যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ডান বাহুতে ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। এর নেতৃত্ব ছিল হুরমুজানের হাতে। সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত অফিসার। বাম বাহুতে ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। তাদের কমান্ডার ছিল মেহরান, মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারে যার ভালো রকম অভিজ্ঞতা ছিল। মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্য এ ছাড়াও ৩৩টি জঙ্গি হাতি ছিল।

---

[১৮২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬২৫-৬২৯

এই সকল প্রস্তুতি সত্ত্বেও রুস্তম যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করছিল। সে আলোচনা-পর্যালোচনার দিকে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করে হজরত সা'দ রা. কে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর আবেদন জানায়। তিনি হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. কে পাঠান।

মুগিরা রা. এলে রুস্তম বলে, তোমরা তো আমাদের প্রতিবেশী। আমরা তোমাদের সঙ্গে সবসময় ভালো আচরণ করেছি। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদআপদ থেকে বাঁচিয়েছি। তোমাদের জন্য ফিরে যাওয়া উচিত। আমরা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করি না।

হজরত মুগিরা রা. উত্তর দেন, দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তো পরকালের প্রত্যাশী। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট তার সত্য রাসুল পাঠিয়ে আমাদেরকে প্রকৃত দীন প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি সে অনুযায়ী আমল করবে সে সফল হবে। যে ব্যক্তি সেটা ত্যাগ করবে সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবে।

রুস্তম আগ্রহ প্রকাশ করে ইসলামের পরিচয় জানতে চায়। তখন হজরত মুগিরা রা. সংক্ষেপে ইসলামের শিক্ষা এবং ভালো দিকগুলো উল্লেখ করেন। রুস্তম তার প্রত্যেক কথার প্রতি উত্তরে বলছিল, এটা তো ভালো জিনিস।

পরিশেষে সে জিজ্ঞাসা করে, যদি আমরা এই ধর্ম কবুল করে নিই তা হলে তোমরা আমাদের সাথে কী আচরণ করবে?

তিনি উত্তর দেন, আমরা তোমাদের রাজত্বের কাছেধারেও আসবো না।

এ কথা শুনে রুস্তম আনন্দ প্রকাশ করে। তাকে বিদায় দেওয়ার পর আপন সরদারদের সামনে সে ইসলাম কবুল করে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার সুযোগ তুলে ধরে। কিন্তু সকলেই তার এই প্রস্তাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রুস্তম যুদ্ধের ব্যাপারে টালবাহানা করতে থাকে। সে পুনরায় হজরত সা'দ রা. কে এক প্রতিনিধি পাঠানোর আবেদন জানায়। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. তখন হজরত রিবয়ি বিন আমের রা. কে পাঠান। রুস্তম এইবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ দরবার প্রস্তুত করে মুসলমানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর মানসিক

চাপ সৃষ্টি করাও একটি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজদরবারের এসব জাঁকজমক ও সাজসজ্জা হজরত রিবয়ি বিন আমের রা. এর উপর সামান্য প্রভাব ফেলতে পারেনি; বরং তিনি নিজের অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করার জন্য ঘোড়া দ্বারা গালিচা মাড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর ঘোড়াকে এক মূল্যবান আসনের সাথে বাঁধেন।

রোমান পাহারাদাররা তার অস্ত্র খুলে রাখতে চাইলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছি। যদি এভাবে ভেতরে প্রবেশ করতে দাও তা হলে ঠিক আছে অন্যথায় আমি চলে যাব।

পাহারাদার নিরুত্তর হয়ে যায়। তিনি আপন বর্শা দ্বারা মূল্যবান গালিচা খোঁচাতে খোঁচাতে ভেতরে প্রবেশ করেন। যার ফলে রুস্তমের তাঁবুতে বিছানো গালিচা এক সাইড থেকে অন্য সাইড পর্যন্ত পুরোটা বিদীর্ণ হয়ে যায়।

এই কর্মকাণ্ডের কারণে রুস্তম ভীত হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, বলো তো তোমরা কেন এখানে এসেছ?

হজরত রিবয়ি বিন আমের রা. তখন অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় মুসলমানদের আগমনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন, ইতিহাসের পাতায় যা চিরভাস্বর হয়ে আছে। তিনি বলেন,

> الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام
>
> আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি যাকে চান তাকে মানুষের গোলামি থেকে আমরা আল্লাহর গোলামির দিকে নিয়ে যেতে পারি। তাদেরকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসতে পারি। সকল ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে ইসলামের নিষ্ঠার পথে বের করতে পারি।

রুস্তম রিবয়ি বিন আমের রা. এর এই কথা শুনে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার অবকাশ চায়।[১৮৩]

---

[১৮৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬২২

তৃতীয়বার মুসলমানদের পক্ষ থেকে হজরত হুযাইফা বিন মিহসান রা. কথা বলার জন্য গমন করেন। কিন্তু তখন কোনো কথা হয়নি। পরিশেষে হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. কে চূড়ান্ত কথা বলার জন্য পাঠানো হয়। তিনি দরবারে প্রবেশ করে সকল ধরনের কৃত্রিমতা ঝেড়ে ফেলে সোজা রুস্তমের সিংহাসনে তার সঙ্গেই বসে পড়েন।

দরবারের লোকেরা চিৎকার শুরু করলে হজরত মুগিরা রা. বলেন, এর মাধ্যমে কেবল আমার স্থান উঁচু হয়েছে। তোমাদের মনিবের সম্মানের কোনো ঘাটতি হয়নি।

রুস্তম বুঝতে পারে, যুদ্ধ অনিবার্য। তা এড়ানো যাবে না। সে মুসলিম প্রতিনিধিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। অহংকারীসুলভ ভঙ্গিতে আরবদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলে, তোমরা সেই মাছির মতো, যে অন্যের মধুর পাত্রে বসে। একসময় তাতে পড়ে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, বের হওয়ার জন্য অন্যকারো অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়। তোমরা ওই আত্মমর্যাদাহীন লোভী শিয়ালের মতো, যে এক সরু ছিদ্র দিয়ে আঙুরের বাগানে প্রবেশ করে। খেয়েদেয়ে সে এত মোটা হয়ে যায় যে, আর বের হতে পারে না। এরপর বাগানের মালিকের হাতে সে মারা যায়।

তার কথা থেকে অহমিকা ও অহংবোধ ঝরে পড়ছিল, যা অনারবদের রগরেশায় মিশে ছিল। এই ব্যাধি তার হক গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হজরত মুগিরা রা. তার মুখস্থ বুলি শুনতে থাকেন। সে মুখ বন্ধ করলে তিনি তার অনুরূপ উত্তর দিতে গিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বলেন, প্রকৃত বিষয় তো এটা যে, আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েতও দিয়েছেন আবার রিজিকও দিয়েছেন। সে রিজিকের একটি অংশ তোমাদের ভূখণ্ডে রয়েছে। আমরা তার কিছু দানাপানি আমাদের পরিবার-পরিজনকে ভক্ষণ করিয়েছি। এখন তারা বলা শুরু করেছে যে, দ্রুত এ শহরটা জয় করো, যাতে করে আমরা সর্বদাই এ শহরের উৎপন্ন ফসলাদি খেতে পারি।

এটা শুনে রুস্তম চিৎকার করে বলে, আচ্ছা, তা হলে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করেই দম ছাড়বো।

হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে বলেন, আমরা মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করব আর তোমরা মারা গেলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

রুস্তম তার ক্রোধ ঝেড়ে পুনরায় কঠোর ভাষায় বলে, তোমাকে একটি মূল্যবান পোশাক প্রদান করা হবে আর তোমাদের সিপাহসালারকে এক হাজার আশরাফি, মূল্যবান পোশাক ও ঘোড়া প্রদান করা হবে। যাও তোমরা চলে যাও।

হজরত মুগিরা বিন শুবা খোঁচা দিয়ে বলেন, ওহো! তোমাদের পরাজিত করে, তোমাদের শান-শওকত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর আমরা এতটা সহজে কীভাবে চলে যাব? এখন তো শুধু এতোটুকু বাকি রয়েছে যে, আগামীকাল তোমরা নাক ঘষে আমাদের গোলামি করবে।

এই কথা শোনামাত্র রুস্তমের দেহে আগুন জ্বলে যায়। সে ভরাট কণ্ঠে বলে, সূর্যের কসম! আগামীকাল আমি তোমাদের সবাইকে মৃত্যুর ঘাটে অবতীর্ণ করব।

আসলে কী ঘটবে তা আগামীকালই তোমরা বুঝতে পারবে। হজরত মুগিরা এই কথা বলে ফিরে আসেন।[১৮৪]

---

[১৮৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬২৩, ৬২৪

কাদিসিয়ার যুদ্ধ

রুস্তম সেদিনই তার বাহিনীকে মার্চ করার নির্দেশ দেয়। সে ডাবল বর্ম এবং উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করে এক লাফেই নিজের তেজস্বী ঘোড়ায় বসে চিৎকার করে বলে, আগামীকাল আমি আরবদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। তার পাশে-থাকা এক অফিসার বলে, যদি খোদা চান তা হলে।

রুস্তম সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিউত্তর করে, খোদা যদি না চান তা হলেও।

সে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে সাবাতের সেনাছাউনি থেকে বের হয়। মুসলমানরা ফুরাত নদীর পশ্চিম দিকে শিবির স্থাপন করেছিল। রুস্তম এখানে পৌঁছে নৌকার মাধ্যমে অস্থায়ী পুল বানানোর পরিবর্তে লাকড়ি, মাটি এবং পাথর দ্বারা ভরাট করে রাতারাতি এক রাস্তা বানিয়ে ফেলে। সকাল হওয়ামাত্র সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তীরবর্তী স্থানে সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করে ফেলে। পারস্যের বাছাইকৃত ৩০ হাজার আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি শেকল বেঁধে কাতারবন্দি হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ যাতে এই কাতার ভাঙতে না পারে, তারা নিজেরাও যেন পলায়ন করতে না পারে এজন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে আঠারোটি জংলি হাতি আর ডানবামে পনেরোটি করে হাতি সামনে রাখা হয়। হাতিগুলোর হাওদাতে বেশ দক্ষ তিরন্দাজরা আসন গ্রহণ করে।

রুস্তম আপন বাহিনীর পেছনে নদীর তীরে এক জাঁকজমক সিংহাসনে বসে সেনাবাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিল। পারস্যের বাদশাহ ইয়াজদাগিরদ প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের অবস্থা জানার জন্য কাদিসিয়া থেকে রাজধানী মাদায়েন পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় সংবাদদাতা নির্ধারণ করে রেখেছিল, যারা একে অপর থেকে সংবাদ শুনে উচ্চ আওয়াজে অপরের নিকট পৌঁছে দিত। এভাবে মুহূর্তেই রুস্তমের কথা ইয়াজদাগিরদের নিকট আর ইয়াজদাগিরদের কথা রুস্তমের নিকট পৌঁছে যেত।

ওইদিকে মুসলমানরা নিজেদের সেনাবিন্যাস করে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর আমির হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর

দেহে ফোঁড়া হয়েছিল। তিনি ভীষণ কষ্টবোধ করছিলেন। এ কারণে তিনি বসা থেকে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি সৈন্যবাহিনীর পেছনে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের ছাদে অবস্থান করছিলেন। তিনি বুকের নিচে একটি নরম জিনিস দিয়ে এমনভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন যে, সেখান থেকে যুদ্ধ ময়দানের সব দেখা যেত। এটা পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা। হজরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. অসুস্থ হয়ে পড়া সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুজাহিদ বাহিনীর সামনে বক্তব্য রাখেন। তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে বলেন, হে মুসলমানগণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

> আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।[১৮৫]

হে লোকসকল, এই পৃথিবী তোমাদের উত্তরাধিকার সম্পদ। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অঙ্গীকার। যদি তোমরা দুনিয়ালোভী না হও, পরকাল তালাশ করো, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়া দেবেন, আখেরাতও দেবেন। আর যদি তোমরা ভীরু ও কাপুরুষ হও, যদি তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করো, তা হলে তোমাদের ভীতি, গাম্ভীর্য ও সম্মান সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমাদের পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে।

অন্যান্য সেনাপতি আপন অধীনস্থ সৈনিকদের সামনে ভাষণ প্রদান করেন। তাদের মনোবল এবং চেতনাকে জাগ্রত করে তোলেন।

যেহেতু হজরত সা'দ রা. এর অসুস্থতার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই জানত না, এজন্য তাকে সকলের পেছনে একটি প্রাসাদে দেখে কেউ কেউ আপত্তি করে। তারা মনে করে, তিনি হয়তো আরাম করছেন! হজরত সা'দ রা. বিষয়টি বুঝতে পারেন, যাতে কারো কোনো ধরনের অভিযোগ ও আপত্তি না থাকে এজন্য সামনে এসে নিজের শরীরের ফোঁড়া দেখান।

তিনি হজরত খালিদ বিন উরফুতা গিফারি রা. কে যুদ্ধের ময়দানে আপন স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেন। সকল সেনাপতিকে তার নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে বলেন। কিন্তু আবু মিহজান সাকাফি রা. খালিদ বিন উরফুতার

---

[১৮৫] সুরা আমবিয়া, আয়াত ১০৫

স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। এ কারণে হজরত সা'দ রা. সতর্কতাস্বরূপ তাকে একটি প্রাসাদে বন্দি করে রাখেন। উল্লেখ্য যে, সা'দ রা. অসুস্থতার কারণে নিজেও এই প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন।[১৮৬]

হজরত সা'দ রা. কাগজে নির্দেশনা লিখে প্রাসাদের নিচে অবস্থানরত খালিদ বিন উরফুতা রা. কে প্রদান করতেন। তিনি এই নির্দেশনা বাহিনীর অন্যান্য সেনাপতির নিকট পৌঁছে দিতেন।[১৮৭]

আরমাস দিবস

দুপুর পর্যন্ত উভয় বাহিনী আপন-আপন স্থানে অবস্থান করে।[১৮৮] সেনাপতির নির্দেশে জায়গায় জায়গায় সুরা আনফাল তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। মুসলমানরা সারিবদ্ধ অবস্থায় জোহরের নামাজ আদায় করেন। অবশেষে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর প্রথম তাকবিরধ্বনি শোনা যায়। সকলে বুঝে যায় যে, একটু পর হামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় তাকবির দেওয়া হয়। সকলেই হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। তৃতীয় তাকবির শোনামাত্র মুসলিম মুজাহিদগণও আল্লাহু আকবারধ্বনি উচ্চারণ করেন। সাথে সাথেই তিরন্দাজরা তির নিক্ষেপ শুরু করেন। অশ্বারোহীরা বর্শাসহ আগে বাড়তে থাকেন। কিছুক্ষণ পর চতুর্থ তাকবির দেওয়া হয়। বিন্যাস অনুযায়ী তখন সকল মুজাহিদ একযোগে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ শুরু করেন।[১৮৯]

পারসিক শাহজাদা হরমুজ মুকুট পরিধান করে হজরত গালিব বিন আবদুল্লাহ আসাদির মোকাবেলায় আসে। তিনি তাকে গ্রেফতার করে ফেলেন। আরেকজন পারসিক অফিসার মূল্যবান চুড়ি এবং কোমরবন্ধ পরিধান করে হুংকার ছুড়ে সামনে আসে। তখন হজরত আমর বিন মাদিকারিব রা. অগ্রসর হয় তাকে ভূপাতিত করে খঞ্জর দ্বারা জবাই করে ফেলেন।[১৯০]

---

[১৮৬] আল মুনতাযাম, ৪/১৭০, ১৭১; আবু মিহজানকে বন্দি করায় তিনি এ প্রসঙ্গে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। সামনে তা উল্লেখ করা হবে।

[১৮৭] আল মুনতাযাম, ৪/১৭০

[১৮৮] আল মুনতাযাম, ৪/১৭২

[১৮৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩০২

[১৯০] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩০২

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হজরত সা'দ রা. প্রাসাদের ছাদ থেকে সেনাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়চিত্ত ছিলেন। এমনকি তার প্রাসাদের দরজা পর্যন্তও খোলা ছিল। কোনো পাহারাদার ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, যদি মুসলমানদের পিছু হটতে হতো তা হলে পারসিকরা সোজা প্রাসাদে ঢুকে হজরত সা'দ রা. কে গ্রেফতার করতে পারত। কিন্তু হজরত সা'দ রা. এ ধরনের আশঙ্কাকে পাত্তাই দেননি।[১৯১]

আরব-গোত্র বনু বাজিলার অশ্বারোহীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছিল। পারসিকরা সতেরোটি হাতি নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। আরবীয় ঘোড়াগুলো হাতি দেখে পলায়ন করা শুরু করে। বনু বাজিলার বিন্যস্ত কাতার ভেঙ্গে যেতে থাকে। হজরত সা'দ রা. তৎক্ষণাৎ বনু আসাদের বাহিনীকে তাদের সাহায্যে পাঠান। হাতিগুলো বনু আসাদকে আক্রমণ করা শুরু করে। তাদেরকে পিষে মারতে থাকে। হজরত সা'দ রা. পেরেশান হয়ে হজরত আসেম বিন আমর রা. কে বলেন, এসব হাতি থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে? তিনি বলেন, কেন নয়? এটা বলে তিনি আপন গোত্রের সর্বোত্তম তিরন্দাজদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। তিনি তিরের সাহায্যে এমন আক্রমণ করেন যে, সকল হাতি-আরোহীই আহত হয়ে পড়ে। বনু তামিমের বাহাদুর যোদ্ধারা হাতির হাওদা উলটে দেন। হাওদা ভেঙে তছনছ করে ফেলেন। আরোহীরা নিচে পড়ে উলটো পলায়ন শুরু করে। এভাবেই এই ভয়ঙ্কর বিপদ কেটে যায়।[১৯২]

প্রথম দিনের এই যুদ্ধকে ইতিহাসে 'ইয়াওমুল আরমাস' নামে স্মরণ করা হয়।

আগওয়াস দিবস

প্রথমদিনের যুদ্ধে কিছুসংখ্যক মুজাহিদ শহিদ হন। কিছুসংখ্যক আহত হন। শহিদদের দাফন করা হয়। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন মুসলমানরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হন।

---

[১৯১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৩২
[১৯২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩০২

তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। হঠাৎ হজরত সা'দ রা. এর ভাই হজরত হিশাম রা. পাঁচ হাজার মুজাহিদের সাহায্য নিয়ে এসে পৌছেন। ইতিপূর্বে তিনি শামে হজরত আবু উবাইদা রা. এর নেতৃত্বে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। হজরত উমর ফারুক রা. আবু উবাইদা রা. কে নির্দেশ দেন যে, ইরাকের রণক্ষেত্র থেকে যাদেরকে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে শামে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে যেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাহায্যে ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই এই বাহিনী দ্বিতীয়বার এই জায়গায় চলে আসেন। এর ফলে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিন্যাস করা হয়েছিল। তাদেরকে দশ দশজন করে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা তাকবিরধ্বনি দিয়ে অল্পক্ষণ পরপর মুজাহিদ বাহিনীর সাথে শামিল হচ্ছিলেন। সারাদিন তারা এভাবে আসতে থাকেন। এর ফলে শত্রুরা ধারণা করে যে, মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হয়তো অনেক বড় এক বাহিনী এসেছে।

সর্বপ্রথম যে অংশটি এসে শামিল হয় তার আমির ছিলেন হজরত কা'কা বিন আমর রা.। তার অসাধারণ বীরত্ব এবং সাহসিকতার কথা সকলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তার ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছিলেন, যে বাহিনীতে কা'কা'র মতো কোনো বাহাদুর থাকবে, তারা পরাজিত হতে পারে না। তিনি আসা মাত্র পারসিকদের হুংকার ছেড়ে বলেন, বাহাদুর কেউ থাকলে সামনে আসো।

তখন পারস্যের প্রসিদ্ধ সরদার বাহমান নিজেই এগিয়ে আসে, যে জুলহাজিব উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। সে জঙ্গে-জিসিরে মুসলমানদের পরাজিত করে দিয়েছিল। জিসিরের যুদ্ধে হজরত আবু উবায়েদ সাকাফি রহ. শহিদ হয়েছিলেন।

তাকে দেখামাত্র হজরত কা'কা রা. চিৎকার করে বলেন, ওহহো, আবু উবায়েদ এবং জিসিরের শহিদদের প্রতিশোধ (নেওয়ার পালা)!

এটা বলেই তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিছু সময় উভয়ের তরবারি একে অপরের উপর আঘাত হানতে থাকে। অবশেষে হজরত কা'কা বাহমানকে হত্যা করে ফেলেন। এরপর ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

শাম থেকে আগত সাহায্যকারী বাহিনীর দশজনের কোনো ইউনিট যখন দিগন্তে দৃশ্যমান হতো, হজরত কা'কা রা. তাতে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে থাকতেন।

মুসলমানগণ পারসিক হাতির হাওদাগুলো যেভাবে লন্ডভন্ড করে দিয়েছিলেন, পারসিকরা তার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে বের করতে পারেনি। এজন্য তারা এইদিন ময়দানে কোনো হাতি নিয়ে নামেনি। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরা জমে লড়াই করার সুযোগ লাভ করেন।

এদিকে হজরত কা'কা বিন আমর রা. পারসিক ঘোড়াগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য এক আশ্চর্য পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি নিজের উটগুলোকে কালো চাদর জড়িয়ে শেকলবাধা পারসিক অশ্বারোহীদের সামনে নিয়ে আসেন, যারা পলায়নপর মানসিকতা দূর করার জন্য এবং অটল-অবিচল থেকে শত্রুর উপর হামলা করার জন্য একে অপরকে শেকলের মাধ্যমে বেঁধে রেখেছিল। আরবি উটগুলোকে কালাচাদর পেঁচিয়ে সামনে আনা হলে পারসিক ঘোড়াগুলো পলায়ন করতে থাকে। তাদের কাতার লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

পারসিকদের দক্ষ তিরন্দাজের একটি ইউনিট ছিল। তারা উজ্জ্বল পোশাক, স্বর্ণ-রুপার চুরি ও কোমরবন্ধ পরে অন্যদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে চমকাচ্ছিল। তাদেরই এক তিরন্দাজ মুসলমানদেরকে বারবার টার্গেট করছিল। এর মধ্যেই আমর বিন মাদিকারিব রা. চিৎকার করে বলেন, মুসলমানেরা, বাঘের মতো আচরণ করে দেখাও, পারসিকরা তো নিছক ভেড়া-বকরি।

এটা বলেই তিনি সেই তিরন্দাজের দিকে এগিয়ে যান। এক মুসলমান চিৎকার করে বলেন, আবু সাওর, ওই অশ্বারোহী থেকে দূরে থাকো, তার কোনো নিশানা ব্যর্থ যায় না।

হজরত আমর বিন মাদিকারিব রা. তিরন্দাজকে দেখে তার দিকে দৌড়ে যান। তিরন্দাজটি তূণীর প্রস্তুত করে একটি তির নিক্ষেপ করে। শাঁ-শাঁ করে তা আমরের দিকে আসছিল। হজরত আমর রা. সতর্ক ছিলেন। তিনি ঢাল আগে বাড়িয়ে দেন। তির ঢালে বিদ্ধ হয়। তিরন্দাজ অপর একটি তির প্রস্তুত করার পূর্বেই হজরত আমর রা. তার নিকট পৌছে

যান। তাকে ধরে জবাই করে ফেলেন। তার দুটি স্বর্ণের চুড়ি, কোমরবন্ধ এবং রেশমি কোট খুলে নিয়ে আসেন।[১৯৩]

আবু মিহজান রা. এর সাহসিকতা

আবু মিহজান সাকাফি রা. কে যুদ্ধের নির্ধারিত নীতি লঙ্ঘন করার কারণে বন্দি করা হয়েছিল। যে প্রাসাদে হজরত সা'দ অবস্থান করছিলেন, সে প্রাসাদেই তাকে বন্দি করা হয়। হজরত আবু মিহজান রা. জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে পারায় অত্যন্ত দুঃখ-যাতনায় ভুগছিলেন। অনিচ্ছাক্রমেই তিনি এই পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন,

كَفَى حَزَنًا أَنْ تَرْتَدِي الخَيْلُ بِالقَنَا * وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

> এটা কতটাই দুঃখের কথা যে, অশ্বারোহীরা বর্শা নিয়ে লড়াই করছে আর আমাকে শেকল পরিয়ে এখানে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে!

হজরত সা'দ রা. এর বাঁদি নিকট দিয়েই যাচ্ছিলেন। তখন আবু মিহজান রা. তার নিকট আবেদন করেন, শেকল খুলে আমাকে একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দাও। সন্ধ্যায় আমি ফিরে আসবো। তখন আমাকে পুনরায় বেঁধে রেখো।

তার প্রতি বাঁদির দয়ার উদ্রেক ঘটে। সে শেকল খুলে হজরত সা'দ রা. এর ঘোড়া তাকে প্রদান করে।

তিনি সোজা যুদ্ধের ময়দানে চলে যান। এমনভাবে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন যে, শত্রুর পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিতে থাকেন। মানুষ পেরেশান হয়ে যায় যে, কোন বাহাদুর হঠাৎ করে ময়দানে নেমে এল!

তার প্রতি যখন হজরত সা'দ রা. এর দৃষ্টি পড়ে তখন তিনি এই আরোহীকে চিনতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি তাকে আবু মিহজানের মতো লড়াই করতে দেখছিলেন। ঘোড়াটিকে আবার তার নিজের ঘোড়ার মতোই মনে হচ্ছিল। তিনি চিন্তা করছিলেন যে, আবু মিহজান তো এখন বন্দি! বিষয়টি তার নিকট অস্পষ্ট রয়ে যায়।

---

[১৯৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৩৪

সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অন্ধকার নেমে এলে উভয় বাহিনী নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যায়। আবু মিহজান রা. আপন স্থানে এসে নিজেকে পূর্বের মতো বন্দি করে ফেলেন। হজরত সা'দ নিচে নেমে সর্বপ্রথম ঘোড়ার নিকট যান। তিনি লক্ষ করেন, ঘোড়ার শরীর থেকে ঘাম টপকে পড়ছে। খোঁজ নিলে সব বিষয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হজরত সা'দ রা. আবু মিহজান রা. এর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দেন।[১৯৪]

আবু মিহজানের প্রতি মদপানের অভিযোগ এবং তার বাস্তবতা

এখানে এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, ইতিহাসের কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আবু মিহজানকে মদপানের অভিযোগে বন্দি করা হয়েছে। কিন্তু এজাতীয় বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল। মুহাক্কিকদের মতে হজরত আবু মিহজান রা. কে নিয়ম-নীতি ভঙ্গের দায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি হজরত সা'দ রা. কর্তৃক নির্বাচিত খালিদ বিন উরফুতা রা. এর স্থলাভিষিক্তির উপর আপত্তি তুলেছিলেন। বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া এটাও একটা কারণ ছিল যে, তিনি এমন কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যাতে মদপানের স্বাদের কথা উল্লেখ ছিল। সা'দ রা. এর নিকট বিষয়টি অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকে।

ইবনুল আসির জাজারি রহ. বর্ণনা করেন, মিহজান রা. কে শাস্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি কোনো হারাম জিনিস পানাহারের কারণে বন্দি হইনি; বরং আমি ইসলামের পূর্বে একজন কবি ছিলাম। তখন মদপান করতাম। একবার মদপানের স্বাদ সংক্রান্ত কিছু কবিতা আমার জবান থেকে বের হয়ে যায়। এজন্য সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. আমাকে বন্দি করে ফেলেন।[১৯৫]

---

[১৯৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৩২

[১৯৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩০৬-৩০৯

ফায়দা : ১ - কোনো কোনো বর্ণনায় আবু মিহজান রা. এর বন্দিত্বের শিকল খুলে দেওয়া এবং তাকে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে হজরত সা'দ রা. এর স্ত্রী হজরত সালমার নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অপর বর্ণনায় পাওয়া যায়, এটি হজরত সা'দ রা. এর বাঁদি যাহরা করেছিলেন। দুটির মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, যাহরা হজরত সালমার অনুমতিক্রমে এই→

দ্বিতীয় দিনের এই যুদ্ধকে ইয়াওমে আগওয়াস নামে স্মরণ করা হয়। এই দিন প্রায় দুই হাজার মুসলমান শহিদ ও আহত হন। অপরদিকে পারসিকদের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যাটা দশ হাজারের কম নয়।[১৯৬]

খানসা বিনতে আমর রা. এর জিহাদি জজবা

খানসা বিনতে আমর রা. এর মূল নাম ছিল তুমাদির। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ নারী কবি ছিলেন। কবিতা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন, আরবের ইতিহাসে তার মতো উঁচুমাপের নারী কবি ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়নি। এমনকি তার পরেও কেউ তার মতো উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। জাহিলিযুগের এক যুদ্ধে তার ভাই মুয়াবিয়া নিহত হয়। অপর ভাই সাখার মারাত্মক আহত হয়। খানসা এক বছর সাখারের সেবা-শুশ্রূষা করেন। পরিশেষে সাখার একদিন মৃত্যুবরণ করে। খানসা শোকসাগরে ডুবে যান। ইতিপূর্বে তিনি মাত্র দুই-একটি কবিতা বলতে পারতেন। কিন্তু এখন বিরহের আগুন শোকগাথা রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। আল্লাহর বান্দি অত্যন্ত দরদমাখা শোকগাথা বলতে থাকেন। বড় বড় কবি সাহিত্যিকরা পর্যন্ত তার সামনে মাথা নত করে দিতে থাকে।

একসময় আল্লাহ তায়ালা তাকে ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য প্রদান করেন। তিনি আপন গোত্রের লোকজনের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। তিনি নিজের সন্তানদের নিয়ে ইসলাম

কাজটি করেছিল। বাঁদির পর্দার বিধান কিছুটা শিথিল। তাই তিনি এ ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেন। কিন্তু হজরত সালমা মিহজানের শেকল খুলে দেওয়া এবং নিজ হাতে তার ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা কিছুটা অসম্ভব। কেননা পর্দা পালনের সে যুগে এটি সময় ও পরিস্থিতির পরিপন্থি। যদিও অতি প্রয়োজনের সময় শরিয়তে এর সুযোগ রয়েছে। যেমন জিহাদের মধ্যে নারী সাহাবিদের পুরুষদের পট্টি বেঁধে দেওয়ার কথা সহিহ রেওয়াতের মাধ্যমে জানা যায় (সহিহ বুখারি, ২৮৮২, ২৮৮৩)। নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ এবং পুরুষদের পট্টি লাগানোর ঘটনা থেকে এই উদ্দেশ্য বের করা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্লেষণ যে, প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম সমাজে পর্দার পাবন্দি ছিল না; বরং পরবর্তীকালের মৌলবিরা তা আবিষ্কার করেছে!

ফায়দা : ২- সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. এর স্ত্রীর নাম ছিল সালমা বিনতে জাফর। তিনি প্রথমে মুসান্না বিন হারিসা রা. এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সা'দ রা. এর বিবাহে আবদ্ধ হয়েছেন। (আল ইসাবা, ৫/৫৬৯, উসদুল গাবাহ, ৫/৫৫, আল ইসতিয়াব, ৪/১৪৫৬, মুসান্না বিন হারিসা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[১৯৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩০৯

গ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবিতা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি নিজেই আবেদন করে তার কবিতা শুনতেন এবং তাকে উৎসাহ প্রদান করতেন।[১৯৭]

কাদিসিয়ার যুদ্ধে খানসা বিনতে আমর রা. তার চার ছেলেকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের রাতে সন্তানদের একত্র করে বলেন, 'আমার সন্তানেরা, তোমরা নিজেদের আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছ। নিজেদের আগ্রহেই হিজরত করেছ। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তোমরা একই পিতার সন্তান। তেমনিভাবে তোমাদের মা একজন। আমি না তোমাদের পিতার সাথে খেয়ানত করেছি আর না তোমাদের মামাদের লাঞ্ছিত হতে দিয়েছি। তোমাদের বংশে কোনো ধরনের দাগ লাগাইনি। তোমরা জানো, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কত বড় সাওয়াব রেখেছেন। স্মরণ রাখবে, পরকালের জীবন চিরস্থায়ী আর দুনিয়ার জীবন ধ্বংসশীল।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
>
> হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ করো এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[১৯৮]

সকালে তোমরা অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে নেমে পড়বে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্যে তোমরা শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করবে। যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হতে দেখবে তখন সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করবে। ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তোমরা শান্তির জীবন লাভ করবে।

পরদিন চার সন্তান অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। একে একে তার চার সন্তান শহিদ হয়ে যায়।

তিনি সেই খানসা, যিনি আপন দুই ভাইয়ের শোকগাথা দিয়ে গোটা আরবকে কাঁদিয়েছিলেন, যখন তার চার সন্তানই শহিদ হয়ে যায় তখন

---

[১৯৭] আল ইসতিয়াব, ৪/১৮২৭, আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, ১০/২৩৯-২৪২

[১৯৮] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২০০

তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, যে সত্তা আমাকে তাদের শাহাদাতের সম্মান দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আশাকরি তিনি আমাকে তাদের সাথে আপন রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।[১৯৯]

ঈমাস দিবস

তৃতীয় দিনের লড়াই ইয়াওমে ঈমাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হজরত কা'কা কিছু সাথি-সঙ্গীকে রাতেই যুদ্ধের ময়দান থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, সকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে একশ' একশ' করে একের পর এক তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আসতে থাকবে। সকালে যখন মুসলমান এবং পারসিকরা মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন তারা তাকবিরধ্বনি দিয়ে পালাক্রমে আসতে থাকে। এর ফলে পারসিকদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়। অবশেষে হজরত হিশাম বিন আবি ওয়াক্কাস ৭০০ অশ্বারোহী নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন।

যুদ্ধ শুরু হলে প্রথমে একজন পারসিক পাহলোয়ান এসে হুঙ্কার ছোঁড়ে। তখন কিছুটা খাটো দেহবিশিষ্ট শাবার বিন আলকামা তার সামনে এগিয়ে যান। পাহলোয়ানটি ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে শাবার বিন আলকামার বাহুতে আঘাত করে তাকে নিচে ফেলে দেয়। পাহলোয়ান তার বুকের উপর চেপে বসে। জবাই করার জন্য সে তরবারি কোষমুক্ত করে। কিন্তু হঠাৎ করে তার ঘোড়া উলটো দিকে পলায়ন করতে থাকে। ঘোড়ার লাগাম পাহলোয়ানের কোমরে বাঁধা ছিল। এতে পাহলোয়ান উলটে যায়। সে ঘোড়ার পেছনে আছড়ে যেতে থাকে। এটা দেখে শাবার পিছু দৌড়ে গিয়ে তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেন।

এই দিন পারসিকরা পুনরায় মাঠে হাতি নিয়ে আসে। এগুলো হেফাজতের জন্য পদাতিক এবং অশ্বারোহীদের শক্তিশালী পাহারা বসানো হয়। মুসলমানদের জন্য আক্রমণ করাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কেননা ঘোড়াগুলো হাতির সামনে আসতে ঘাবড়াচ্ছিল। হজরত আমর বিন মাদিকারিব রা. তার সম্মুখের হাতির দিকে ইশারা করে গোত্রের লোকদের বলেন, আমি এই হাতি এবং তার পাহারাদারদের উপর হামলা

---

[১৯৯] উসদুল গাবাহ, ৭/৮৯

করবো। যদি আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে না আসি তা হলে তোমরা আমার পেছনে পেছনে আসবে; নইলে আমাকে হারিয়ে ফেলবে। এরপর আমি যেমন বলেছি তেমন হবে।

এটা বলে তিনি পারসিকদের উপর আক্রমণ করেন। ময়দানের ধুলোবালিতে তিনি হারিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি ফিরে এলেন না তখন তার সাথিরা পারসিকদের কাতার ভেদ করে তার সাহায্যে এগিয়ে যায়। ততক্ষণে তিনি আহত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তবু বরাবরের মতো লড়াই করে যাচ্ছিলেন। সাথিরা তাকে অতি কষ্টে সেখান থেকে বের করে আনে। তার ঘোড়াও আহত হয়ে গিয়েছিল। এক পারসিক তখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা ওই ব্যক্তির ঘোড়ার পা পাকড়াও করেন। পারসিক লোকটি ঘোড়া চালানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে সে পলায়ন করে। হজরত আমর বিন মাদিকারিব তখন ঘোড়াটিতে আরোহণ করে চলে আসেন।

হাতিগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. পেরেশান ছিলেন। তিনি জানতেন এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়াই এখন প্রধান কাজ। পারসিকদের সাদা ও শক্তিশালী একটি হাতি সর্বাধিক ধ্বংসযজ্ঞ চালনা করছিল। হজরত সা'দ, হজরত কা'কা বিন আমর এবং হজরত আসেম বিন আমরকে সাদা হাতি দমন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আমিরের নির্দেশে লাব্বাইক বলে হজরত আসেম এবং হজরত কা'কা রা. লম্বা বর্শা তৈরি করে সাদা হাতির দিকে অগ্রসর হন। দুজনে একসঙ্গে হাতিটির চোখ টার্গেট করেন। চোখে আঘাত পাওয়ামাত্র হাতির মাথা ঘুরতে থাকে। ওপরে বসে থাকা তিরন্দাজ নিচে পড়ে যায়। এদিকে হজরত কা'কা রা. হাতির শুঁড় কেটে ফেলেন। এমনিভাবে যে হাতিগুলো অধিক পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল সেগুলোরও এভাবে চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হয়। এই হাতিগুলো আহত হয়ে পলায়ন করলে অন্যান্য হাতিও তাদের পথ ধরে। এভাবে যুদ্ধের ময়দান হাতিশূন্য হয়ে যায়।

এরপর মুসলমান অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের জমে লড়াই করার সুযোগ চলে আসে। ওই সময় সূর্য মাত্র পশ্চিম আকাশে হেলছিল। মুসলমানরা

নিজের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকেন। পারসিকরা অসাধারণ সাহসিকতার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল।[২০০]

লাইলাতুল হারির বা হারির রজনী

যেহেতু এটি উভয় জাতির ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ ছিল এ কারণে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও তরবারির আঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। লড়াইকারীরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাদের বেহাল দশা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু এখন জয়-পরাজয় ব্যতীত যুদ্ধ সমাপ্তি সম্ভব ছিল না। সৈনিকরা তুমুল লড়াই করে যাচ্ছিল। আশপাশের কোনো খোঁজখবর ছিল না তাদের। এমনকি রাতে কারো পানাহারের সুযোগ হয়নি। তারা এই সময় ঘুমানোর এমনকি কথাবার্তা বলার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। সকলের হাতেই অস্ত্র ছিল। যার ঝনঝনানিতে চারদিক মুখরিত ছিল। মুখে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল। এ কারণে এ রাতকে লাইলাতুল হারির তথা আর্তনাদ ও গোঙ্গানির রাত বলা হয়। রাতটি বাহাদুরদের হুংকার এবং আহতদের আর্তনাদে কেয়ামতের রূপ ধারণ করেছিল।

হজরত কা'কা বিন আমর, হজরত আসেম বিন আমর এবং হজরত কায়েস বিন হুবায়রা রা. সারারাত প্ল্যান পরিবর্তন করে করে একের পর এক হামলা করে যাচ্ছিলেন। তারা নিজেরাই প্ল্যানগুলো তৈরি করেছিলেন। এই কারণে সিপাহসালার হজরত সা'দ রা. তাদের ব্যাপারে বলেন, হে আল্লাহ, তাদের ক্ষমা করে দাও! তাদের সাহায্য করো! আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যদিও তারা আমার থেকে অনুমতি নিতে পারেনি।

রাতের এই আক্রমণে পারসিকরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু তবু জয়-পরাজয়ের কোনো ফয়সালা হয়নি।[২০১]

কাদিসিয়া দিবস

লড়াই করতে করতে সকালে উভয়পক্ষের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে যায়। শেষদিনের এই যুদ্ধকে ইয়াওমে কাদিসিয়া বলা হয়। এটি একনাগাড়ে

---

[২০০] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/ ৩০৯-৩১১
[২০১] আল কামিল ফিত তারিখ ২/৩১১-৩১২

দুপুর পর্যন্ত চলমান ছিল। হজরত কা'কা বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখন শত্রুদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানা যেতে পারে। তাই তিনি বাহাদুর মুজাহিদদের মনোবল বাড়াবার জন্য বলেন, 'এখন যারা অগ্রসর হয়ে হামলা করবে, তাদের বিজয় হবে। তোমরা আরো কিছুক্ষণ অবিচল থাকো। হামলা চালিয়ে যাও। ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।

এটা বলে তিনি হজরত আমর বিন মাদিকারিব, তুলাইহা বিন খুয়াইলিদের মতো নামকরা ব্যক্তিদের নিয়ে পারসিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। পারসিক সেনাপতি ফিরুযান এবং হুরমুজান তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু মুসলমানদের প্রবল আক্রমণ তাদের সেনাব্যূহ লন্ডভন্ড করে দেয়। তারা রুস্তমের একদম কাছাকাছি চলে যায়। রুস্তম ময়দানের পেছনে একটি জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনে বসে ছিল। মুসলমানদের আসতে দেখে সে নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু হেলাল বিন আলকামা নামক একজন মুসলমান তার পেছনে পেছনে পানিতে নেমে পড়েন। তিনি তার পা ধরে তীরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসেন। এরপর তরবারির মাধ্যমে তার মাথা কেটে ফেলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে চিৎকার করে বলেন, আমি রুস্তমকে হত্যা করে ফেলেছি। এটা শোনামাত্র পারসিকদের জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। তারা ময়দান থেকে পলায়ন করতে থাকে। মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাদের লাশের স্তূপ ফেলে দেয়।[২০২]

আত্মমর্যাদাশীল ৩০ হাজার পারসিক, যারা শেকল দিয়ে নিজেদের বেঁধে রেখেছিল, প্রাণ বাঁচানোর জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়। মুসলমানরা বর্শা ও তিরের আঘাতে তাদের সবাইকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেয়। মোটকথা, পারসিক সেনাবাহিনীর অধিকাংশই কাদিসিয়ার যুদ্ধে নাম-নিশানাহীন হয়ে যায়। সামগ্রিক হিসাবে সাড়ে ছয় হাজার মুজাহিদ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন।[২০৩]

মুসলিম বাহিনীতে শিশু ও নারীরাও শামিল হয়েছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল মুজাহিদদের খেদমত করা, শহিদদের জন্য কবর খনন করা, আহতদের

---

[২০২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/ ৩১২-৩১৪

[২০৩] তারিখুত তাবারি, ৩/৫৬৪

প্রতি লক্ষ রাখা। যুদ্ধ শেষ হলে শত্রুপক্ষের নিহতদের মূল্যবান পোশাক খোলার প্রয়োজন ছিল। লাশের কাপড় খুলতে গিয়ে যাতে বেপর্দার সম্মুখীন না হতে হয় এজন্য বাচ্চাদের উপর এই দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়।[২০৪]

কাদিসিয়া যুদ্ধের সময়কালের ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। এক মত অনুযায়ী এটি ১৪ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি ভুল বক্তব্য। আরেক মত অনুযায়ী এটি সংঘটিত হয়েছে ১৬ হিজরির শাওয়াল মাসে। অপর মত অনুযায়ী ১৫ হিজরির শাওয়াল মাসে এটি সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে মনে হয় শেষবক্তব্যটি সঠিক।

আমি কোনো বাদশাহ নই

হজরত উমর ফারুক রা. কাদিসিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে মদিনার বাইরে গিয়ে দুপুর পর্যন্ত ইরাক যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই সময়ে ইরাক থেকে আগত প্রত্যেক অশ্বারোহীকে ইরাকি মুজাহিদদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করতেন। এই দিকে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. দূতকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যখন সে মদিনার নিকটে পৌছয় তখন হজরত উমর রা. মদিনার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে এসেছো?

বার্তাবাহক উমর ফারুক রা. কে চিনত না। তার মধ্যে খলিফার নিকট সংবাদটি দ্রুত পৌছে দেওয়ার ত্বরা ছিল। এই কারণে সে ঘোড়া না থামিয়েই বলে, কাদিসিয়া থেকে। তিনি তখন অত্যন্ত অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে বলো সেখানে কী হয়েছে?

দূত বলল, আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের পরাজিত করেছেন।

হজরত উমর ফারুক রা. দৌড়ে দৌড়ে তাকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। আর সে ঘোড়া চালিয়ে উত্তর দিতে থাকে। এভাবে উভয়ে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শহরে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে, লোকেরা তার সাথে দৌড়ানো ব্যক্তিকে 'আমিরুল মুমিনিন' বলে

---

[২০৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৫৩৬

সালাম দিচ্ছে তখন সে কম্পিত হয়ে ওঠে। সে বলে, হজরত, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কেন আমাকে বললেন না যে, আপনিই আমিরুল মুমিনিন?

তিনি তখন অত্যন্ত সরলভাবে বললেন, হে আমার ভাই, এতে সমস্যা কী হলো?[২০৫]

এরপর তিনি মুসলমানদের একত্র করে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, মুসলমানগণ! জেনে রাখো, আমি কোনো বাদশাহ নই যে, তোমাদেরকে আমি গোলাম বানিয়ে রাখবো। আমি তো কেবল আল্লাহর গোলাম। আমার মাথায় খেলাফতের জিম্মাদারি রাখা হয়েছে। যদি আমি এমনভাবে এই জিম্মাদারি পালন করতে পারি যে, এর ফলে তোমরা ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো তা হলে এটি আমার সৌভাগ্য। যদি আমার দরজায় এসে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার আকাঙ্ক্ষা হয় তা হলে এটা আমার দুর্ভাগ্য। আমি তোমাদেরকে সঠিক শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু কথার মাধ্যমে নয়; বরং কাজের মাধ্যমে।[২০৬]

ব্যাবিলন থেকে মাদায়েন পর্যন্ত

রুস্তমসহ পারস্যের কয়েকজন বড় সেনাপতি কাদিসিয়ার যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু হুরমুজান, কারিনসহ কিছু সেনাপতি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। এ ছাড়াও কিছু পারসিক জেনারেল বিভিন্ন দুর্গ এবং শহরে মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল।

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদগণ তাদেরকে খতম করার জন্য কাদিসিয়াযুদ্ধের দুই মাস পর ১৫ হিজরির জিলহজ মাসে সামনে অগ্রসর হন। তারা ঐতিহাসিক শহর ব্যাবিলন জয় করেন। এরপর হজরত যুহরাকে কুফার আমির নিযুক্ত তারা সামনে অগ্রসর হন। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এই শহরটি হজরত ইবরাহিম আ. এর জন্মস্থান ছিল।

এখানকার দায়িত্বশীল শাহরিয়ার মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে নিজেই সামনে এসে হুংকার

---

[২০৫] আল কামিল ফিত তারিখ ২/ ৩১৫

[২০৬] তারিখুত তাবারি, ৩/৫৭৫

ছুড়তে থাকে। হজরত যুহরা রা. তার অহংকার চূর্ণ করার জন্য এক আরব যোদ্ধা নায়েল বিন জাশআমকে পাঠান। নায়েল ছিলেন ক্রীতদাস। উভয়ে ঘোড়ায় চড়ে একে অপরের মোকাবেলা করতে থাকে। শাহরিয়ার নায়েলকে সাধারণ সৈনিক মনে করে তার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে। সে উভয় বাহু দ্বারা নায়েলকে প্যাঁচিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। নায়েলও খালি হাতে শক্তি পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে। একসময় তারা উভয়েই ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়। শাহরিয়ার এক হাত দ্বারা নায়েলের চেহারায় আঘাত করে। অপর হাত দ্বারা সে খঞ্জর বের করে তার গলা বিদীর্ণ করে দিতে উদ্যত হয়। নায়েল তখন শক্তভাবে শাহরিয়ারের আঙুলে কামড় দিয়ে বসেন। হাড্ডি পর্যন্ত দাঁতের কামড় বসে যায়। শাহরিয়ার ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে পিছু হটে যায়। নায়েল তখন তাকে ফেলে দিয়ে বুকে চড়ে বসেন। তার খঞ্জর ছিনিয়ে নিয়ে পেট বিদীর্ণ করে ফেলেন।

শাহরিয়ার মারা যাওয়ামাত্র তার সৈন্যবাহিনীর মন ভেঙ্গে যায়। তারা সামান্য প্রতিরোধ করার পর লন্ডভন্ড হয়ে যায়। হজরত সা'দ পরবর্তীতে এখানে আসেন। তিনি নায়েলের কীর্তি শুনে দারুণ খুশি হন। শাহরিয়ারের পোশাক, অস্ত্র এবং ঘোড়া তাকে পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেন। নায়েল শাহরিয়ারের মূল্যবান পোশাক ও অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের মজলিসে আসেন। একজন সাধারণ গোলামের এই জাঁকজমক অবস্থা দেখে সকলেই হতবাক হয়ে যায়।

পারস্যের রাজধানী মাদায়েন দাজলা নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। শহরটির সুরক্ষার জন্য নদীর পশ্চিম দিকে একটি দুর্গ ছিল। এখানে ছিল পারস্য সম্রাটের একটি পোষা বাঘ। এ কারণে এই স্থানটিকে বাহুরশের বলা হয়। এখানে যুদ্ধ শুরু হলে পারসিকরা বাঘটাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছেড়ে দেয়। এইদিকে হজরত হাশেম বিন উতবা রা. অগ্রসর হন। তিনি তরবারি দ্বারা বাঘকে মারাত্মক আঘাত হানেন। বাঘ সেখানেই মারা যায়। এই বাহাদুরির কারণে হজরত সা'দ রা. হজরত হাশেম বিন উতবার কপালে চুমু খান। কিছুদিন অবরোধের পর বাহুরশের দুর্গটি ১৬ হিজরির সফর মাসে বিজিত হয়।[২০৭]

---

[২০৭] আল কামিল ফিত তারিখ ২/ ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭

দজলার ঢেউয়ে মুসলিমবাহিনী

নদীর উপকূলে বাহুরশের দুর্গের পেছনের দরজা ছিল। সেখান থেকে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন দেখা যেত। মুসলমানরা এই দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে নদীটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পারসিকরা সকল পুল ভেঙ্গে ফেলেছিল। সকল নৌকা গায়েব করে দিয়েছিল।

হজরত সা'দ রা. সংবাদ পেলেন যে, পারস্য সম্রাট ইয়াজদাগিরদ সকল ধনসম্পদ ও উপায়-উপকরণ নিয়ে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি নদী অতিক্রমের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয় তা হলে সে শহর সাফ করে বের হয়ে যাবে। সে কোনো নিরাপদ ঠিকানায় পৌছে নতুন করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করবে। এজন্য তৎক্ষণাৎ নদী অতিক্রম করা অপরিহার্য ছিল। হজরত সা'দ এই সমস্ত দিক মুসলমানদের সামনে উল্লেখ করে বলেন, ভাইয়েরা, শত্রুরা সকল দিক থেকে পলায়ন করে নদীর মাধ্যমে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নদীর এ পানির ফোঁটা তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। আমার সিদ্ধান্ত হলো, শত্রুরা প্রস্তুতি নেওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ঘিরে ফেলতে হবে। তাই নদীতেই ঘোড়াগুলোকে চালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছি।

সকলেই বলল, আমরা আপনার পেছনে আছি। আপনি অগ্রসর হোন।[২০৮]

সেনাবাহিনীর প্রথম কাতারে হজরত হুজর বিন আদি রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকেন, মুসলমান বন্ধুরা, তোমাদের সামনে এই সামান্য পানির কী মূল্য রয়েছে? এই পানি চিড়ে তোমরা শত্রুর নিকট পৌছে যাও! আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

> আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।[২০৯]

এটা বলেই তিনি দাজলা নদীতে ঘোড়া চালিয়ে দেন।[২১০]

---

[২০৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৩৯

[২০৯] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৫

[২১০] তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম, ৩/৭৭৯

নদী পার হওয়া মাত্র যাতে শত্রুপক্ষের তিরন্দাজদের আক্রমণের মুখে না পড়তে হয় এজন্য হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. হজরত আসেম বিন উমরকে ওপারে পৌঁছে ঘাটে নিযুক্ত পারসিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হজরত আসেম ষাটজন অশ্বারোহী নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে অপর পারে পৌঁছে যান।

ও পারে নিযুক্ত পাহারাদার নদীতে নেমে তাদের রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা চালায়। হজরত আসেম রা. এর নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলমানগণ বর্শার মাধ্যমে তাদের চোখ টার্গেট করেন। এইভাবে তারা কয়েক ডজন পারসিককে হত্যা করেন।

ওইদিকে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. মুসলমানদেরকে বলেন, আপনারা সকলেই এই দোয়াটি পড়ুন

نستعين بالله و نتوكل عليه. حسبنا الله و نعم الوكيل. و لينصرن الله وليه و ليظهرن دينه و لهزمن عدوه لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাই। তার উপর ভরসা রাখি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই-না উত্তম বিধায়ক! আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার বন্ধুকে সাহায্য করবেন। তিনি অবশ্যই তার দীনকে বিজয়ী করবেন। শত্রুকে পরাজিত করবেন। মহান সুউচ্চ আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতীত কেউ কোনো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার বা নেক কাজ করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না।

এই দোয়াটি পড়তে পড়তে সকলেই নদীতে নেমে পড়েন। সবার আগে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ঘোড়া ছোটান। তারা এমনভাবে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যেন কোনো সুপ্রশস্ত মহাসড়ক ধরে চলছেন।

হজরত সালমান ফারসি রা. হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. কে বলছিলেন, ইসলামের রুহ এখনো তাজা রয়েছে। এজন্য মাটির ন্যায় পানিকেও মুসলমানদের অনুকূল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সৈনিকরা যেভাবে নদীতে অবতরণ করেছে, সেভাবেই তারা উঠে আসবে।

হজরত সা'দ রা. বলছিলেন,

حسبنا الله ونعم الوكيل

> আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম বিধায়ক।

যদি মুজাহিদদের থেকে কোনো ধরনের নাফরমানির প্রকাশ না ঘটে এবং তাদের থেকে যদি এমন গুনাহ সংঘটিত না হয়, যা নেকির পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেয়, তা হলে জয় মুসলমানদেরই হবে।[২১১]

মুসলমানদেরকে এইভাবে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নদী পাড়ি দিতে দেখে পারসিকরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশই তখন 'ভূত আসছে, ভূত' বলতে বলতে পালাতে শুরু করে।[২১২]

এক মুজাহিদের পেয়ালা এবং নদীর আমানতদারি

যেসব পারসিক সৈন্য মোকাবেলার জন্য অবস্থান করছিল, মুসলমানরা তাদেরকে কচুকাটা করে তীরে অবতরণ করে। গোটা বাহিনী যেমন ছিল তেমনই নিরাপদে নদী পার হয়। হজরত আমের বিন মালিক নামের একজন সৈনিকের একটি পেয়ালা নদীতে পড়ে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তাকদিরের লিখন ছিল। এই কারণে সেটা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, এই পেয়ালা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।

এরপর দোয়া করেন, হে আল্লাহ, পুরো বাহিনীর মধ্যে শুধু আমার একটি জিনিস হারিয়ে গেল! আমাকে এমন মাহরুম বানাবেন না।

যখন সকলে নদীর পারে অবতরণ করেন তখন আকস্মিকভাবে একটি ঢেউ এসে পেয়ালাটি কিনারে এনে দেয়। এক সৈনিক সেটি চিনতে পেরে হজরত আমের বিন মালিক রা. এর নিকট পৌঁছে দেন।[২১৩]

ইয়াজদাগিরদ ইতিপূর্বেই নিজের পরিবার-পরিজন এবং ধনভাণ্ডার হুলওয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের নদী পার হওয়ার সংবাদ

---

[২১১] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৩৯, ৩৪০; তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৩৩
[২১২] তারিখুত তাবারি, ৪/১৪
[২১৩] তারিখুত তাবারি, ৪/১২

পাওয়ামাত্র সিংহাসন ছেড়ে সে নিজেও পলায়ন করে। যদিও সে পারস্যের ধনসম্পদের ভাণ্ডার নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু অধিকাংশই সে পেছনে ফেলে গিয়েছিল। মুসলমানরা যখন সাসানিদের এই প্রাচীন বালাখানায় প্রবেশ করেন তখন সকলেই হতবাক হয়ে পড়েন।[২১৪]

কিসরার ধনভাণ্ডার

সামনে সাসানি পরিবারের আজিমুশশান শ্বেতপ্রাসাদ ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন,

عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى.

মুসলমানদের একটি দল কিসরার শ্বেতপ্রাসাদ জয় করবে।[২১৫]

এটা সেই রাজকীর্তি, যার প্রতাপ ও শৌর্য-বীর্য দেখে মানুষের গতি বন্ধ হয়ে যেত। যার দেয়াল, মেহরাব এবং স্তম্ভের জাঁকজমক চোখ ধাঁধিয়ে দিত। কিন্তু এই শ্বেতপ্রাসাদের মিনারাগুলো আকাশচুম্বী হওয়া সত্ত্বেও আজ তা অবনত।

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. পারস্য-সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশ করতেই তার জবান থেকে বেরিয়ে আসে,

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান। সুখের কত উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। এমনই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।[২১৬]

শত শত বছর ধরে অর্ধ-এশিয়া রাজত্বকারী পারস্য-সাম্রাজ্যের রত্নভাণ্ডার আজ মুসলমানদের পদতলে। কিন্তু এই নজিরবিহীন বিজয় উপলক্ষে কোনো ধরনের আনন্দ-উৎসব করা হয়নি। মুসলমানরা পারস্যের

---

[২১৪] আল মুনতাযাম, ৪/২০৬

[২১৫] সহিহ মুসলিম, ৪৮১৫

[২১৬] সুরা দুখান, আয়াত ২৫-২৮

রাজদরবারে নামাজ আদায় করেন। আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। যার শক্তি-বলে কুফর-শিরকের মূলকেন্দ্রে ইসলামের পতাকা উড়ানোর তাওফিক হয়েছে।[২১৭]

মাদায়েন থেকে অঢেল পরিমাণ অর্থসম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। হজরত জাবের বিন সামুরা রা. আপন পিতার সাথে এই বিজয়ে শরিক হয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন শরিয়ত অনুযায়ী গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তির অংশে বারো হাজার দিরহাম পড়ে (আজকালের হিসাবে যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকার কম নয়)।

প্রচুর পরিমাণে সোনা-রুপা ছিল। কিছু কিছু বস্তা দেখে মনে করা হয়েছিল, এগুলো হয়তো শস্য-ফসলের বস্তা হবে। কিন্তু খুলে দেখা যায় তা নিরেট স্বর্ণ-রুপায় ভর্তি। কিছু সৈন্য ইয়াজদাগিরদ এবং তার সাথি-সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে বের হয়েছিলেন। তারা নাহরাওয়ান নদীর উপর ইয়াজদাগিরদের একদল খাদেম পান। যারা একটি খচ্চর পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের থেকে খচ্চরটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাতে থাকা সামানাপত্রের মধ্যে কিসরার পোশাক, অলংকার, জুতা ও শিরস্ত্রাণ পাওয়া যায়, যা হিরা-জহরত দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল।[২১৮]

আমানতদারির উত্তম দৃষ্টান্ত

মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত আমানতদারি ও খোদাভীতি বিদ্যমান ছিল। তারা যা কিছুই পেয়েছেন সেটা তাদের আমিরের নিকট পেশ করেছেন।

কিছু কিছু জিনিসের অর্থমূল্য বর্তমান হিসেবে কোটি কোটি টাকা ছিল। কিন্তু মুজাহিদরা সামান্য হেরফের করেননি। এক আল্লাহর বান্দা বাদশাহর শাহিমুকুট পেয়েছিলেন। তিনি এটা যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই পেশ করেন। এই মহামূল্যবান মুকুটটি দুষ্প্রাপ্য হিরে ও মতির কারুকার্যখচিত ছিল। ওটার ওজন ছিল অনেক। কেউ একা তা বহন করতে পারত না। এটাকে সিংহাসনের ডানে-বামে দুটি খুঁটির মাঝে

---

[২১৭] আল মুনতাযাম, ৪/২০৬

[২১৮] আল মুনতাযাম, ৪/২০৭-২০৮

শেকলের মাধ্যমে ঝুলিয়ে রাখা হতো। বাদশাহ সিংহাসনে বসে নিজের মাথা তাতে প্রবেশ করাতেন।

কিছু মুজাহিদ অত্যন্ত চমৎকার বাক্সে পারস্য-সম্রাট কিসরার পোশাক পেলেন। সেগুলোর মধ্যে মূল্যবান মতি লাগানো ছিল, যার মূল্য ছিল লক্ষ লক্ষ রুপি। এমন একটি বাক্স হজরত কা'কা বিন আমর রা. এর হস্তগত হয়, যাতে পারস্য সম্রাট, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, চীনের রাজা, হিন্দুস্থানের মহারাজাদের অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক ও মুকুট ছিল, যার প্রতিটি জিনিস ঐতিহাসিক মর্যাদা রাখত।

এ সকল জিনিস হজরত সা'দ রা. এর সামনে রাখা হলে তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এটা আমানতদার লোকদের বাহিনী।[২১৯]

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হলো হজরত সা'দ রা. এর নির্দেশে গনিমতের সম্পদ জমাকারী এক আমিরের নিকট এক ব্যক্তি একটি বাক্স নিয়ে আসে। বাক্সটি খুললে তাতে মণি-মুক্তা ও হিরা-জহরত চমকাতে দেখা যায়, যার মূল্য ততক্ষণে জমাকৃত সকল সম্পদের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি ছিল। আমির তাকে বলেন, তুমি এর মধ্য থেকে কিছু নাওনি তো?!

লোকটি উত্তর দেয়, আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ভয় না থাকতো তা হলে বাক্সটি আমি আপনার নিকট নিয়ে আসতাম না।

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে? সে উত্তর দেয়, আমি এই কাজটা এজন্য করিনি যে, তুমি আমার প্রশংসা করবে। আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছি যে, তিনি আমাকে এই কাজটি করার তাওফিক দিয়েছেন। তিনি আমাকে যে বদলা দেবেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। এটা বলেই সে আপন গোত্রের ভিড়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে খোঁজ নেওয়া হলে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন হজরত আমের বিন আবদুল কায়েস রহ.।

এই জিনিসগুলো গনিমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের মধ্যে শামিল করে খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ফারুক রা. এর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জিনিসগুলো দেখে তিনি বলে ওঠেন, যেই লোকগুলো এই জিনিসগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই পাঠিয়ে দিয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা

---

[২১৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৪২, ৩৪৩

আমানতদার। আলি মুরতাজা তখন বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এজন্য আপনার প্রজারাও সৎকর্মপরায়ণ।[২২০]

নৌবিহারের গালিচা

এসব সামানাপত্রের মধ্যে পারসিক বাদশাহদের জগদ্বিখ্যাত নৌবিহারের গালিচা ছিল, যেটা নওশেরওয়ার নির্দেশে তার মন্ত্রী বারযেজামহার তৈরি করেছিল। সম্রাট গ্রীষ্মকালে প্রশান্তি লাভের জন্য এতে করে সমুদ্র সফরে বের হতেন। এটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছিল নব্বই ফুট। স্বর্ণের তারের মাধ্যমে তা বয়ন করা হয়। তা হিরে ও মোতি সজ্জিত ছিল। স্বর্ণের প্রলেপে তাতে অবাক-করা ফুল ও পাতা অঙ্কিত ছিল। দেখামাত্র চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তাতে সড়ক ও নদীর চিত্র অঙ্কিত ছিল।

রানি ও রাজা গ্রীষ্মের দিনগুলোতে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এ গালিচায় খোশগল্পে মেতে উঠতেন। মদ্যপান চলতো। তারা বসন্তের আনন্দ অনুভব করতেন।

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. গালিচাটি মদিনায় পাঠিয়ে দেন। তখন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সাহাবি ও তাবেয়িদের একত্র করে এই গালিচা প্রদর্শন করান। গালিচাটি দেখে সকলেই হতভম্ব হয়ে যান। গালিচাটি কী করা হবে- হজরত উমর ফারুক রা. সে ব্যাপারে পরামর্শ করেন। কেউ কেউ এই আশ্চর্য জিনিসকে আপন অবস্থায় রাখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু হজরত আলি রা. এটা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে এটা কেটে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। হজরত আলি রা. এর ভাগে যে সামান্য অংশ পড়েছিল, তা বিশ হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি হয়। বর্তমান হিসাবে, যা ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ রুপির কম নয়।[২২১]

কিসরা তথা পারস্য সম্রাটের মুকুট ও চুড়ি : নববি মুজিযা

গনিমতের সম্পদে আগত পারস্য সম্রাটের মুকুট ও চুড়ি দেখে হজরত উমর ফারুক রা. এর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক

---

[২২০] আল মুনতাযাম, ৪/২০৯

[২২১] আল মুনতাযাম, ৪/২০৯, ২১০

ভবিষ্যদ্বাণীর স্মরণ হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সফরে তার পশ্চাদ্ধাবন করতে আসা সুরাকা বিন মালিক রা. কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে যখন পারস্য সম্রাটের চুড়ি, কোমরবন্দ ও মুকুট তোমাকে পরানো হবে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তখন মুসলমানরা চরম সঙ্কটকাল অতিক্রম করছিল। তাদের এতটাই করুণ দশা ছিল যে, স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ মাতৃভূমিতে মাথা গোঁজার জায়গা হচ্ছিল না। বাড়িঘর ছেড়ে এক অপরিচিত ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন। তার ঘোরতর শত্রুরা চতুর্দিক থেকে তাকে তালাশ করছিল। এই অবস্থায় এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সেই ব্যক্তিই করতে পারেন, যার দৃষ্টিতে শুধু মক্কাবাসী নয়; বরং রোম ও পারস্যের মতো সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ আল্লাহর সামান্য সৃষ্টি জীবের চেয়ে বেশি মূল্য রাখে না, শুধু আল্লাহর সত্তার উপরই যার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, যিনি তাকে ভবিষ্যৎ-বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।

মাত্র পনেরো বছরের মাথায় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালটে যায়। পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের পদতলে চলে আসে।

হজরত উমর ফারুক রা. পৃথিবীবাসীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার সত্যতা প্রত্যক্ষ করানোর জন্য হজরত সুরাকা বিন মালিক রা. কে সবার সামনে সেই চুড়ি, মুকুট এবং কোমরবন্ধ পরিয়ে দেন, বড় বড় রাজা-বাদশাহদের ভাগ্যেও যা জোটে না। হজরত উমর রা. এর নির্দেশে হজরত মালেক তাকবিরধ্বনি তোলেন। তিনি বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই জিনিসগুলো খোদা দাবিদার পারস্য সম্রাট থেকে ছিনিয়ে আরবের এক বেদুইনকে পরিয়ে দিয়েছেন।[২২২]

জঙ্গে জালুলা

মাদায়েন থেকে পলায়ন করে ইয়াজদাগিরদ হুলওয়ানে শিবির স্থাপন করে পুনরায় সেনাবাহিনী একত্র করা শুরু করে। ওইদিকে হজরত উমর ফারুক রা. ইরাকের বিজয়ের পূর্ণতাদানের জন্য হজরত সা'দ ইবনে

---

[২২২] উসদুল গাবাহ, সুরাকা বিন মালেক রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

আবি ওয়াক্কাস রা. কে যাবতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী হজরত হাশেম বিন উতবা রা. এর নেতৃত্বে বারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট একটি বাহিনীকে জালুলায় যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। পারস্যের সেনাপতি মেহরান এখানে অবস্থান করছিল। সে নিয়মিত ইয়াজদাগিরদের পক্ষ থেকে সাহায্য পাচ্ছিল। মুসলমানরা শহরটি অবরোধ করে ফেলেন। পারসিকরা আশি দিন দুর্গে বন্দি থাকে।

অবশেষে একদিন তারা শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হয়ে যায়। মুসলমানদেরকে আহত করার জন্য তারা ময়দানের এক জায়গায় কাটাদার গুল্ম বিছিয়ে দেয়। এগুলোকে হাসাক বলা হয়। আত্মরক্ষার জন্য তারা পরিখাও খনন করেছিল।

যুদ্ধের শেষপর্যায়ে তারা চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। শহরের দিকে পিছপা হতে থাকে। কিন্তু তাদের খোঁড়া হাজার হাজার পরিখায় তারা নিজেরাই পড়ে মারা যায়। হাজার হাজার সৈনিক নিজেদের বিছানো কাটাদার গুল্মে ফেঁসে যায়। এইভাবে আনুমানিক ১ লক্ষ পারসিক সেনা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের সিপাহসালার মেহরান পলায়ন করতে গিয়ে মারা যায়। শহরটি মুসলমানদের কব্জায় চলে আসে।

এটা ১৬ হিজরির জিলকদ মাসের ঘটনা। ইয়াজদাগিরদ এই পরাজয়ের খবর শোনামাত্র হুলওয়ান থেকে পলায়ন করে। মুসলমানরা হুলওয়ান, মুসেল, তিকরিতে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেন। এভাবে গোটা ইরাক ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে।

মুসলমানরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন। সকলের জন্য সাধারণক্ষমার ঘোষণা করা হয়। পারসিক নেতৃবর্গ এবং জমিদাররা পারস্য সম্রাটের অত্যাচারী নিয়মকানুন থেকে মুক্তি পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তারা নিজেরাই এসে আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে। জিজিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করে। এভাবে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২৩]

---

২২৩ আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৪৫-৩৪৯

ইরাকের শস্য-ফলাদির ব্যবস্থা

পারস্য সম্রাটের শক্তি খর্ব হয়ে যাওয়ার পর হজরত উমর ফারুক রা. বিজয়ের তুলনায় নিয়মকানুন বিন্যস্ত করা এবং বিজিত এলাকা আবাদ ও উন্নত করার চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তিনি ইরাকের প্রতিটি জমি পরিমাপ করেন। এক মাসের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি পারস্যের শাহি খান্দানের বাগান, পলাতক লোকদের সম্পত্তি ও জংলি ভূমিগুলো পৃথক করেন। এগুলোর আমদানি সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের জন্য নির্ধারণ করে দেন। অবশিষ্ট জমি স্থানীয় মালিকদের নিকট রেখে দেন। এগুলোর উপর যথপোযুক্ত কর আরোপ করেন। ফলে লোকজন পরিপূর্ণভাবে কৃষিকাজে মনোযোগ প্রদানের সুযোগ লাভ করে। বিশাল বিশাল খালি জায়গা ফসল ও বাগিচায় ভরপুর হয়ে ওঠে। এক বছরের মাথায় শুধু ইরাকের শস্যক্ষেত্রের উৎপাদিত ফসল আট কোটি দিরহাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দশ কোটিতে পৌঁছয়। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ হবে আনুমানিক পঁচিশ বিলিয়ন রুপি।[২২৪]

হজরত উমর ফারুক রা. মুসলমানদের আলাদা বসবাস এবং সেনাছাউনি নির্মাণের জন্য ইরাকের সর্বোত্তম ও মনোরম পরিবেশসম্পন্ন অঞ্চল নির্বাচন করেন। এর জন্য নকশা তৈরি করা হয়। সে নকশা অনুযায়ী বসরা ও কুফা শহর নির্মাণ করা হয়। বড় বড় সাহাবি সেখানে ঈমান, মারেফাত ও হেকমতের আলো জ্বালানোর জন্য বসতি স্থাপন করেন।[২২৫]

পরবর্তী বছর মুসলিমবাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আলজাজিরা, নাসিবাইন, আররিহা, আর্মেনিয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। হজরত ইয়াজ বিন গনাম, হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত উসমান বিন আবুল আস রা. এক্ষেত্রে সামনের কাতারে ছিলেন।[২২৬]

---

[২২৪] কাজি ইমাম আবু ইউসুফ কৃত আল খারাজ, ৩৬

[২২৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ১৭ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

[২২৬] প্রাগুক্ত।

হুরমুজান... তুসতুরের রণক্ষেত্র

এই সময় পূর্বদিকে মুসলিম যোদ্ধারা ইরাকের সীমানা থেকে বের হয়ে পারস্যের ময়দানে কর্তৃত্ব খাটাচ্ছিলেন। পারস্যের একজন শাহজাদাই শুরু থেকে নিয়ে তখন পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। সে হলো হুরমুজান। তার ধূর্ততা, চালাকি, যুদ্ধংদেহী মানসিকতার সাথে মুসলমানদের বহু অভিজ্ঞতা আছে।

ইয়াজদাগিরদ তখন রায় শহরে অবস্থান করছিল। হুরমুজান তার নিকট আবেদন করে, আপনি যদি আমাকে খোজেস্থান এবং পারস্যের রাজত্ব প্রদান করেন তা হলে আমি মুসলমানদের এই তুফান স্তিমিত করে দেব। ইয়াজদাগিরদ তৎক্ষণাৎ তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। হুরমুজান এরপর খোজেস্থানে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে।

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর পক্ষ থেকে হুরমুজানের মোকাবেলার জন্য হজরত উতবা বিন গাজওয়ান রা. কে নির্ধারণ করা হয়। তার সাহায্যের জন্য পরবর্তীতে হজরত নুয়াইম বিন মাসউদ, হজরত নুয়াইম বিন মুকাররিন, হজরত হারমালা বিন মুরাইতা প্রমুখ সাহাবিকে পাঠানো হয়। তিরা নদীর কিনারে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর হুরমুজান পরাজিত হয়।

হুরমুজান পালিয়ে আহওয়ায নামক স্থানে পৌছে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল মুসলমানরা এই এলাকাও ছিনিয়ে নিতে পারে। এজন্য সে আহওয়ায তার নিকট থাকার শর্তে সেনাপতি উতবা বিন গাজওয়ানের সাথে সন্ধি করে। হজরত উমর ফারুক রা. সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করেন। কয়েক মাসের জন্য হুরমুজান মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিশ্চিন্তে থাকে। এর মধ্যে সে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। অবশেষে সে মুসলমানদের সাথে পরিচালনাগত কিছু বিষয়ে মতবিরোধের বাহানা দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসে। পারস্য সম্রাটের বিক্ষিপ্ত হাজার হাজার সৈন্য ও অগ্নিপূজকরা তার পাশে জমা হয়ে যায়।

অন্য কোথাও যেন এর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে এজন্য হজরত উমর ফারুক রা. বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ামাত্র ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উতবা বিন গাজওয়ান রা. এর সাহায্যে হুরকুস বিন যুহাইরের নেতৃত্বে তাজাদম বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা 'বাযারে আহওয়াযে'র পুলের পারে হুরমুজানের সাথে লড়াই করেন। হুরমুজান পরাজিত হয়ে পলায়ন করে রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর সে পুনরায় সন্ধির আবেদন করে। হজরত উমর রা. কে সন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে হুরমুজানের আবেদন কবুল করেন।

কিছুদিন অতিক্রম না করতেই ইয়াজদাগিরদের উদ্বুদ্ধ করার ফলে হুরমুজান আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী তৈরির চেষ্টা চালাতে থাকে। হজরত উমর ফারুক রা. হজরত সা'দ ও বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রা. কে হুরমুজানের মোকাবেলা করার দায়িত্ব দেন। এবং হুরমুজানকে প্রতিহত করার নির্দেশ প্রদান করেন। একইসাথে তিনি হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. কে সেনাদলের আমির বানানোর নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি উমর রা. প্রবীণ সাহাবিদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে তার সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবেই এ বাহিনীতে হজরত নোমান বিন মুকাররিন ও হজরত আবু মুসা আশআরির নেতৃত্বে হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি, হজরত আনাস বিন মালিক এবং তার ছোটভাই হজরত বারা বিন মালিক রা. এর মতো বড় বড় সাহাবি অংশগ্রহণ করেন। আহওয়াযের সন্নিকটবর্তী আরবুক নামক স্থানে খোলা ময়দানে তুমুল লড়াই হয়। হুরমুজান পিছু হটে তুসতুর দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়।[২২৭]

মুসলিমবাহিনী এক মাস পর্যন্ত তুসতুরের আকাশচুম্বী প্রাচীর অবরোধ করে রাখে। উভয় পক্ষ থেকে পাথর এবং তির বৃষ্টি হতে থাকে। হুরমুজান থেমে থেমে ছোট ছোট বাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদের উপর জোরদার আক্রমণ করতে থাকে। জয়-পরাজয়ের কোনো ফয়সালা হচ্ছিল না।[২২৮]

---

[২২৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৬৪-৩৬৮

[২২৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৬৮

উভয় পক্ষ থেকে কয়েকবার সামনা-সামনিও মোকাবেলা হয়েছে। হজরত বারা বিন মালিক, হজরত মাজযাআত বিন সাওর, হজরত রিবয়ি বিন আমের, হজরত কাব সিওয়ার রহ. প্রমুখ বাহাদুর যোদ্ধা ১০০ পারসিক বাহাদুরকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন।[২২৯]

এক রাতে পারসিকরা প্রাচীর থেকে বের হয়ে হঠাৎ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। তাদের আক্রমণে মুসলমানরা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। হঠাৎ এক ব্যক্তির বারা বিন মালিকের কথা স্মরণ হলো। বাহাদুরি এবং শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তার প্রসিদ্ধি ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উশকোখুশকো চুলবিশিষ্ট ধুলোমলিন কিছু লোক এমন আছে, তারা যদি কোনো কাজে শপথ করে তা হলে আল্লাহ সেটা পূরণ করে দেখান। বারা বিন মালিকও এই ধরনের ব্যক্তি ছিলেন।[২৩০]

তার জানবাজির কারণেই মুসলমানরা ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কাজ্জাবের প্রাচীর-ঘেরা বাগানে প্রবেশ করে তাকে খতম করতে পেরেছিলেন। মুসলমানরা তখন তাকে ডেকে বলল, বারা, আজ আল্লাহর কসম করে বলে ফেলো যে, আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করে দেবেন।

হজরত বারা রা. বলেন, হে আল্লাহ, আপনার শপথ, আপনি আমাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করুন। আমাকে আপনার রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন।[২৩১]

এটা বলেই তিনি অন্ধের মতো পারসিকদের উপর আক্রমণ শুরু করেন। অন্যান্য মুসলমান তার পেছনে জোরদার হামলা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদেরকে পিছু হটাতে হটাতে পরিখা অতিক্রম করে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

এর মধ্যে শহরের এক লোক মুসলমানদেরকে শহরে প্রবেশের গোপন রাস্তা বাতলে দেয়। রাস্তাটি ছিল একটি ছোট্ট নদী। এ স্থান দিয়ে শহরে পানি প্রবেশ করত। কিছু মুসলমান সে পথ দিয়ে প্রাচীরের ভেতরে প্রবেশ

---

[২২৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৫৯

[২৩০] সুনানে তিরমিজি, ৩৮৫৪

[২৩১] উসদুল গাবাহ, বারা বিন মালেক রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য; আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৬৮

করেন। তারা পাহারাদারদের কাবু করে প্রাচীরের দরজা খুলে দেন। এটা ফজরের সময়ের ঘটনা ছিল। সূর্য উদিত হতে হতে শহর বিজিত হয়ে যায়। এর মধ্যেই হুরমুজান দুর্গে প্রবেশ করে। সে দুর্গের প্রাচীর থেকে মুসলমানদের তিরের নিশানা বানাতে থাকে।

হজরত বারা বিন মালিক দুর্গে আক্রমণোদ্যত হলে হুরমুজান তাকে শহিদ করে ফেলে। হজরত মাজযাআত বিন সাওর রা. দুর্গে প্রবেশের চেষ্টা করলে হুরমুজানের হাতে শহিদ হয়ে যান।

পরিশেষে হুরমুজান চিৎকার করে বলে, আমার তূণীরে একশটি তির বাকি আছে। আমার নিকট পৌঁছার পূর্বে তোমাদের একশো লাশ পড়বে। যদি তোমরা আমাকে উমর ফারুক এর নিকট জীবিত ও নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করো তা হলে তিনি আমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন আমি সেটাই মেনে নেব।

মুসলমানগণ তার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়। সে হাতিয়ার ফেলে দেয়। নির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী এটি ২০ হিজরির ঘটনা।

তাকে মদিনায় নিয়ে হজরত উমর ফারুক রা. এর খেদমতে পেশ করা হয়।

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ওই সময় মসজিদের ফ্লোরে শুয়ে ছিলেন। তার কোনো দরবার বা পাহারা ছিল না। হুরমুজান জিজ্ঞেস করে, তোমাদের আমির কোথায়?

তাকে বলা হলো তিনি এখানেই।

হুরমুজান পেরেশান হয়ে বলে, তার দরবারি ও দেহরক্ষীরা কোথায়?

তাকে বলা হলো, তিনি কোনো দরবারি ও দেহরক্ষী রাখেন না।

এর মধ্যে হজরত উমর ফারুক রা. জেগে ওঠেন।

হুরমুজান একজন শাহজাদা ছিল। রেশমি পোশাক এবং মুকুট পরিহিত ছিল। উমর ফারুক রা. এর নির্দেশে তাকে সাধারণ কাপড় পরিয়ে সামনে আনা হয়। উমর ফারুক রা. তাকে তিরস্কার করে বলেন, সকল হুরমুজানই অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম এবং আল্লাহর ফয়সালা দেখে নিয়েছে।

সে হাসিচ্ছলে বলে, জাহেলি যুগে খোদা আমাদের সুযোগ দিয়েছিল। তাই আমরা বিজয়ী ছিলাম। এখন খোদা আপনাদের সাথে আছেন। এই কারণে আপনারা বিজয়ী হচ্ছেন।

উমর ফারুক রা. বলেন, প্রকৃতপক্ষে সেসময় তোমাদের ঐক্যবদ্ধতা এবং আমাদের দলাদলিই তোমাদের বিজয়ের মূল কারণ ছিল।

হজরত উমর ফারুক রা. আনাস বিন মালিক রা. কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি তার ব্যাপারে কী বলেন? তাকে হত্যা করা হবে কি না?

হুরমুজান যদিও আনাস বিন মালিক রা. এর ভাই বারা বিন মালিক রা. কে হত্যা করেছিল; কিন্তু আনাস রা. অত্যন্ত উদার মনের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি যদি তাকে হত্যা করে ফেলেন তা হলে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে।

উমর রা. বলেন, আনাস, আমি বারা এবং মাজযাআতের হত্যাকারীকে কীভাবে ছেড়ে দিতে পারি?

এর মধ্যেই হুরমুজান পানি তলব করে। পানি আনা হলে সে বলে, আশংকা হয় যে, পানি পান করা অবস্থায় আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

হজরত উমর রা. বলেন,

لا بأس عليك حتى تشربه

কোনো সমস্যা নেই। পানি পান করা পর্যন্ত তুমি নিরাপদ।

এটা শোনামাত্র সে পানির পাত্রটি ফেলে দেয়। সে বলে, আপনি তো আমাকে জানে বাঁচিয়ে দিলেন!

হজরত উমর ফারুক রা. অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। হজরত আনাস বিন মালিক রা. বললেন, এখন তাকে হত্যার কোনো সুযোগ নেই। আপনি তো তাকে বলে দিয়েছেন যে, পানি পান করা পর্যন্ত তুমি নিরাপদ।

হজরত উমর রা. বলেন, এ বিষয়ে কেউ কি তোমার সাক্ষী রয়েছে?

হজরত আনাস বিন মালিক তখন হজরত যুবাইর রা. কে সাথে নিয়ে আসেন। তিনি আনাস রা. এর সমর্থন করেন। তিনি বলেন, উক্ত কথার মাধ্যমে জান নিরাপদ হয়ে যায়।

ব্যক্তিগতভাবে হজরত উমর ফারুক রা. বারা বিন মালিক রা. এর মতো সাহাবির হত্যাকারী হুরমুজানকে এইভাবে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যখন অন্যান্য সাহাবি আনাস বিন মালিক রা. এর মতের সমর্থন করেন তখন তিনি হুরমুজানকে বলেন, দেখো, আমি কোনো ধোঁকাবাজ নই। হ্যাঁ, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তা হলে ভিন্ন কথা।

হুরমুজান তখনই ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে মুসলমান হয়ে যায়। হজরত উমর আনন্দিত হয়ে পুরস্কার হিসেবে তাকে দুই হাজার দিরহাম প্রদান করেন। মদিনাতে তার জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ করে দেন।[২৩২]

গাসসানি শাহজাদা জাবালা বিন আইহাম

এই সময়ে ইয়ামানি শাহজাদা জাবালা বিন আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে। সে শামে বসবাসকারী আরব খ্রিষ্টানদের গোত্র বনু গাসসানের সম্মানিত ব্যক্তি এবং শাহি বংশের সর্বশেষ শাহজাদা ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমানদের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিল। মুসলমানদের সাথে লড়াই করার পর অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করে। সাথি-সঙ্গী, দেহরক্ষী এবং গোলামদের সাথে সে মদিনায় আগমন করে। তার শান-শওকত দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। এটা ১৬ হিজরির ঘটনা।

আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ফারুক রা. তার মনোবল বৃদ্ধি করেন। তিনি মুসলিম সমাজের একটি অংশ হয়ে যান। কিন্তু জাহিলিযুগের গর্ব-অহংকার তখন পর্যন্ত তার রগরেশায় অবশিষ্ট ছিল। একবার সে হজের জন্য মক্কা গমন করে। তাওয়াফের সময় বনু ফাযারার এক ব্যক্তির পা লেগে তার এহরামের চাদর খুলে যায়। ফলে তার শরীর উন্মুক্ত হয়ে যায়। জাবালা রাগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ব্যক্তিকে জোরে এক থাপ্পড় মারে। এতে তার নাকের হাড্ডি ভেঙ্গে যায়।

মাজলুম লোকটি উমর ফারুক রা. এর নিকট অভিযোগ নিয়ে যায়। তিনি জাবালাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি উত্তর দেন, আমিরুল মুমিনিন, আমিই তা করেছি। যদি কাবা সম্মানিত স্থান না হতো তা হলে আমি তরবারি দ্বারা তার মাথায় আঘাত করতাম।

---

[২৩২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৬৯-৩৭১; তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৪৭

হজরত উমর রা. বলেন, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছো। এখন এই বিচারপ্রার্থীকে কোনোভাবে রাজি করাও অন্যথায় আমাকে তোমার থেকে বদলা নিতে হবে।

জাবালা নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং মর্যাদার কারণে ভেবেছিল, সে হয়তো নিয়মকানুনের উর্ধ্বে। এই কারণে সে উমর ফারুক রা. এর কথা শুনে হতবাক হয়ে যায়। সে বলে এটা কীভাবে হতে পারে?! আমি তো একজন শাহজাদা আর সে একটা সাধারণ মানুষ!

উমর রা. বলেন, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা উভয়ে সমান।

জাবালা বাহানা করে বলে, আমি তো মনে করতাম মুসলমান হওয়ায় আমি অধিক সম্মানিত হয়ে গেছি!

হজরত উমর ফারুক রা. উত্তর দেন, তুমি যা দেখছো এটাই হলো সম্মান। এখন তুমি কেসাস প্রদান করো কিংবা এই বিচারপ্রার্থীকে সন্তুষ্ট করে নাও।

জাবালা বলল, যদি বিষয়টি এরকম হয় তা হলে আমি পুনরায় খ্রিষ্টান হয়ে যাব।

উমর ফারুক রা. বললেন, যদি তুমি এমনটা করো, তা হলে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়ায় তোমাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

জাবালা বুঝে যায় উমর ফারুক রা. নিয়মকানুন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত তাকে ছাড়বেন না। এজন্য সে কৌশলের পন্থা অবলম্বন করে চিন্তাভাবনার জন্য একদিন অবকাশ চায়।

হজরত উমর ফারুক রা. তাকে সুযোগ প্রদান করেন। জাবালা সে রাতেই আপন সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে মদিনা ছেড়ে চলে যায়।[২৩৩]

জাবালা বিন আইহামের ন্যাক্কারজনক পরিণতি

জাবালা মদিনা থেকে সোজা কনস্টান্টিনোপলে হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌছে। সেখানে গিয়ে সে খ্রিষ্টান হওয়ার ঘোষণা দেয়। হিরাক্লিয়াস তাকে জায়গির প্রদান করে। জীবিকার ব্যাপারে তাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়। সে অবশিষ্ট জীবন আনন্দের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়।

---

[২৩৩] ওয়াকিদিকৃত ফুতুহুশ শাম, ১/১০০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২৬৪, ২৬৫

হজরত হাসসান বিন সাবেত রা. জাহেলি যুগের আলে গাসসানের বিজয়কাল সম্পর্কে যেসব কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এই কবিতাগুলো তার অত্যন্ত পছন্দ ছিল। সে দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য এসব কবিতা শুনতে থাকতো।[২৩৪]

---

[২৩৪] তার মধ্যে কিছু কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

لله درعصابة نادمتهم* يوما بجلق في الزمان الأول

أولاد جفنة حول قبر أبيهم* قبر ابن مارية الكريم المفضل

يسقون من ورد البريص عليهم* بردى يصفق بالرحيق السلسل

بيض الوجوه كريمة أحسابهم* شم الأنوف من الطراز الأول

يغشون حتى ما تهر كلابهم* لا يسألون عن السواد المقبل.

আল্লাহ তায়ালা সেই লোকদের কল্যাণ করুন, যাদের সাথে আমি অতীতকালে একদিন জিল্লাক নামক স্থানে মদপানের জন্য বসেছিলাম। তারা ছিল ইবনে জাফানার সন্তান। তাদের পিতার কবরের নিকট দানশীল এবং সম্মানিত ব্যক্তি ইবনে মারিয়ার কবর রয়েছে। যারা বারিস নামক স্থানে তাদের নিকট আসে তারা তাকে মিষ্টি এবং প্রবাহিত পানি মিশ্রিত শরবত পান করিয়ে থাকে। তাদের চেহারা উজ্জ্বল এবং তাদের বংশ উন্নত। তারা উঁচু নাকওয়ালা পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। লোকজন তাদের নিকট অধিক পরিমাণে গমনাগমন করে থাকে। এমনকি এর ফলে তাদের কুকুর পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে। তারা আগন্তুককে কিছু জিজ্ঞেস করে না। —আল ইকদুল ফরিদ, ১/৩১৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২৬৬, ২৬৭, আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, ১১/৪২

পাশাপাশি সে কখনো কখনো হাসসান বিন সাবেত রা. এর ওই সব কবিতাও স্মরণ করত, যাতে তিনি এ বংশের ক্রান্তিকালের চিত্র তুলে ধরেছেন। এজাতীয় কিছু পঙক্তি এখানে তুলে ধরা হলো,

لمن الدار اقفرت بمعان* بين أعالي اليرموك فالصمان.

ذاك مغنى لآل جفنه في الده* ر، محلا لحادث الأزمان.

قد اوراني هناك دهرا مكينا* عند ذي التاج مجلسي و مكاني.

ثكلت امهم و قد ثكلتهم* لما حلوا بحادث الجولان.

ودنا الفصح فالولاءد ينظم* ن، سراعا اكلة المرجان.

ইয়ারমুক ও সিমানের উঁচু এলাকার মধ্যে মাআন শহরে তাদের বাড়িঘর বিরান হয়ে গেল। এটা তো এক সময় আলে জাফানার আবাসস্থল ছিল, কালপরিক্রমা যাকে বিলীন করে দিয়েছে। আমার বেশ মনে পড়ে, আমিও একসময় সেখানে বসবাস করতাম, আমার সাথি-সঙ্গী এবং মুকুটওয়ালা বাদশাহের সঙ্গে। তাদের

রাজত্ব বিরান হয়ে যাওয়ার দুঃখ তাকে সবসময় ভারাক্রান্ত করে রাখত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করার বেদনা তাকে এর চেয়েও বেশি কষ্টে নিপতিত করে। সে নিজেও একজন বড় কবি ছিল। যখন মুসলমানদের সমাজে অতিবাহিত দিনগুলোর কথা তার স্মরণ হতো তখন সে দুঃখের সাগরে ডুবে যেত। অত্যন্ত যাতনা সৃষ্টিকারী শোকগাথা আবৃত্তি করত।

হজরত উমর রা. একবার জাসসামা বিন মুসাহিককে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস তার সাথে সাক্ষাৎ করে জরুরি আলোচনার পর তাকে বলেছিল, তুমি জাবালার সাথে সাক্ষাৎ করে যেয়ো।

জাসসামা বিন মুসাহিক জাবালার প্রাসাদে পৌছে লক্ষ করেন, তার শান-শওকত রোমের বাদশাহর চেয়ে কম নয়। জাবালা তাকে অত্যন্ত ভালোভাবে সেবা-যত্ন করে। তার সঙ্গে বিনয় প্রদর্শন করে। এরপর সে এক সভার আয়োজন করে তাকে হাসসান বিন সাবেত রা. এর কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। হাসসানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জাসসামা বিন মুসাহিক বলেন, সে তো অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার চোখেও সমস্যা হয়ে গেছে।

জাবালা চুপ হয়ে যায়। এরপর সে নিজের অবস্থার উপর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে,

تنصرت الاشراف من اجل لطمة* وما كان لو صبرت لها ضرر

تكلفني فيها لجاج ونخوة * وبعت بها العين الصحيحة بالعور

فيا ليت امي لم تلدني وليتني * رجعت الى الامر الذي قاله عمر

وياليتني ارعى المخاض بقفرة * وكنت اسير في ربيعة او مضر

وياليت لي في الشام ادنى معيشة * اجالس قومي ذاهب السمع والبصر

মায়েরা তাদেরকে হারিয়ে ফেলুক। মায়েরা তো তাদেরকে হারিয়েই ফেলেছে যখন তারা যুগপরিক্রমায় নিপতিত হয়েছে। এখন আমাদের দরিদ্রতার এমন করুণ অবস্থা যে, ঈদ চলে এসেছে আর ছোট ছোট বাচ্চারা চিনাবাদামের মাধ্যমে দ্রুত খাবার তৈরি করছে! —আল ইকদুল ফরিদ, ১/৩১৪, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২৬৭, আল ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত, ১১/৪৩

> অভিজাত বংশের লোকেরা একটিমাত্র থাপ্পর থেকে বাঁচার জন্য খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। অথচ আমি যদি সেটা সহ্য করে নিতাম তা হলে আমার কোনো ক্ষতি হতো না। আমি এক্ষেত্রে অহংকার এবং হঠকারিতা প্রদর্শন করেছি। আমি সুস্থ ও নিরাপদ চোখ (ইসলাম) কে আলোহীন নিষ্প্রভ চোখের (খ্রিষ্টবাদ) মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছি।
>
> হায়, যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতো! হায় আফসোস, উমর যে কথা বলেছিল যদি আমি তা মেনে নিতে পারতাম! হায় আফসোস, যদি আমি কোনো জঙ্গলে উট চড়াতে পারতাম! রবিয়া বা মুদারের কোনো যুদ্ধে বন্দি হয়ে যেতাম!
>
> হায় আফসোস, শামেই যদি আমি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে পারতাম! আমি যদি অন্ধ বধির হয়ে আমার সম্প্রদায় মাঝে ওঠাবসা করতে পারতাম!

এরপর জাবালার মন বিগলিত হয়ে যায়। সে মুখে হাত রেখে অঝোরধারায় কাঁদতে থাকে। যখন সে কিছুটা শান্ত হয় তখন হাসসান বিন সাবেত রা. এর জন্য এক হাজার আশরাফি এবং আটা বোঝাই অনেকগুলো উট প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়। সে দূতকে বলে হাসসানকে আমার সালাম পাঠিয়ে মুদ্রাগুলো তাকে পৌছে দেবে। যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তা হলে এগুলো তার উত্তরাধিকারদের নিকট সোপর্দ করবে আর উটগুলো তার কবরের উপর উৎসর্গ করে দেবে।

দূত জাবালাকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদের লোভ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

দূত ফিরে এসে জাবালার সাথে সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করলে হজরত উমর রা. বলেন, সে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। ধ্বংসশীল দুনিয়াকে স্থায়ী আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তাই এ ব্যবসায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এরপর হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হাসসান বিন সাবেত রা. কে ডেকে পাঠান। হাসসান আসতেই বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আলে জাফানার ঘ্রাণ আসছে। হজরত উমর ফারুক রা. বলেন, হ্যাঁ, এই ব্যক্তি তাদের ওইখান থেকে এসেছে।

হাসসান বিন সাবেত তৎক্ষণাৎ বলেন, দাও, তাদের হাদিয়া। আমি জাহিলিযুগে তাদের প্রশংসা করেছিলাম। এ কারণে তারা শপথ করেছিল, যখনই তারা আমার অবস্থান সম্পর্কে জানে এমন কোনো লোক পেয়ে যাবে তখন অবশ্যই তারা আমাকে হাদিয়া পাঠাবে।[২৩৫]

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনকাল পর্যন্ত জাবালা জীবিত ছিল। ৫৩ হিজরিতে সে মুয়াবিয়া রা. কে সংবাদ পাঠিয়ে বলে, যদি দামেশকের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত আলে গাসসানের বাপ-দাদাদের সম্পত্তি এবং বিশটি গ্রাম আমার নামে লিখে দেওয়া হয় তা হলে আমি শামে চলে আসব। হজরত মুয়াবিয়া তার ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশায় এগুলো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দূত আবদুল্লাহ বিন মাসআদা রা. যখন এ সংবাদ নিয়ে কনস্টান্টিনোপল পৌছান তখন আলে গাসসানের সর্বশেষ শাহজাদার চির বিদায়ের কার্যক্রম চলছিল।

ঘটনাটি থেকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। লোকটি হক চিনেও তার থেকে পিছু হটেছে। ইসলামে প্রবেশ করেও এ মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অহংকার ও গরিমা তাকে এই অবস্থায় পৌছে দিয়েছে। এই কারণে অহংকারকে উম্মুল আমরায তথা সকল রোগের মূল বলা হয়েছে।

এই বিষয়টিও চিন্তাভাবনা করার মতো যে, আহলে হকের পথ-পন্থা পরিত্যাগ করে সে আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণের মধ্যেই জীবনযাপন করছিল। কিন্তু তবু সে এক চিলতে প্রশান্তি লাভ করতে পারেনি। জেনে-বুঝে হকপন্থিদের পথ পরিত্যাগকারীদের পরিণাম এমনই হয়ে থাকে। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করুন যে, দীনের পথে ফিরে আসার এবং তাওবা করার মতো দীর্ঘ সময় তার হাতে ছিল। কিন্তু সে কেবল আফসোস করে গেছে। আর তাওবা করতে পারেনি। এটা শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা। শুধু আফসোস কোনো উপকার করতে পারে না। কেউ নিজের ভুল বুঝতে পারলে তার তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে অনতিবিলম্বে তাওবা করা উচিত।

---

[২৩৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/২৬৫-২৬৮, আল মুনতাযাম, ৫/২৫৯, ২৬০; আল ইকদুল ফরিদ, ১/৩১৪, ৩১৫, তারিখে দিমাশক, ৭২/২৮-৩৬

উত্তর শামে

যে-সময়ে কাদিসিয়া ও মাদায়েনে সাসানিদের মুকুট ও সিংহাসন উলটে যাচ্ছিল, শামে তখন বাইজেন্টাইনদের সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর ১৫ হিজরিতে হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। তিনি হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে কিন্নাসারিনে আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। এখানে স্বয়ং হিরাক্লিয়াসের স্থলাভিষিক্ত মিনাস বিদ্যমান ছিল। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. রোমানদের পরাজিত করে মিনাসকে মৃত্যুর ঘাটে উপনীত করেন। কিন্নাসারিনকে আয়ত্তে আনার পর হিরাক্লিয়াসের খোঁজে শামের সর্বশেষ সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু হিরাক্লিয়াস ইতিপূর্বে শামকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানিয়ে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর রোমানরাও বড় বড় দুর্গ খালি করে দিতে থাকে। শহর থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়ে যেতে থাকে। এভাবেই তারা শাম ছেড়ে বিদায় নিয়ে চলে যায়। হজরত আবু উবাইদা রা. কে তখন বিশেষ কোনো লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়নি। এ বছরই তিনি শামের উত্তরাঞ্চল হালব ও এন্তাকিয়া জয় করেন।[২৩৬]

বাইতুল মাকদিস বিজয়

মোটকথা, হজরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফতের তিন বছর পূর্ণ হয়নি, এর মধ্যেই শামের হিমস, দামেশক, হালব, এন্তাকিয়া, কিন্নাসারিনের মতো বড় বড় শহর বিজিত হয়ে যায়। তখন ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক গুরুত্বের কথা ভেবে বাইতুল মাকদিসের বিজয়কে বিলম্বিত করা হচ্ছিল। শহরটি যেন রক্তপাত ছাড়াই জয় করা যায় এজন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল।

---

[২৩৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩২৪-৩২৬

শামে নির্বাচিত মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি হজরত আবু উবাইদা রা. এর অধীনস্থ কমান্ডারদের মধ্যে হজরত আমর ইবনুল আসও ছিলেন। যিনি হজরত আবু বকর রা. এর যুগ থেকে ফিলিস্তিনের দায়িত্বশীল ছিলেন। যখন প্রথম কেবলাকে আয়ত্তে আনার জন্য অভিযানের ফয়সালা হয় তখন হজরত আবু উবাইদা রা. হিমস থেকে নিজেই আমর ইবনুল আস রা. এর নিকট ফিলিস্তিন চলে আসেন। হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের মতো প্রবীণ সাহাবিগণ তখন একত্র হন।

১৬ হিজরিতে এ পবিত্র শহর অবরোধ করা হয়। স্থানীয় খ্রিষ্টানরা মোকাবেলা করাটা অর্থহীন মনে করে সন্ধির শর্তাদি পেশ করে। যেহেতু এই শহর ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলমান সকলের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জায়গা, পরবর্তীতে যাতে অন্যান্য গোত্রের মাঝে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি না হয় এজন্য শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, যাতে মুসলমানদের প্রধান ব্যক্তি নিজেই এসে সন্ধির শর্তাবলি অনুমোদন করেন। মুসলমানরা নিজেরাও এই বরকতপূর্ণ শহরে রক্তপাত করতে চাচ্ছিলেন না। এজন্য উমর রা. এর নিকট দ্রুতগতিতে দূত আসে। ফিলিস্তিনবাসীর মনোবাসনা তাকে জানায়। তিনি সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কেননা মাত্র একটি শহর বিজয়ের জন্য মুসলমানদের খলিফার চলে আসাটা খেলাফতের মহান দায়িত্বের গাম্ভীর্যকে প্রভাবিত করার আশংকা ছিল। হজরত আলি রা. এর পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় যে, আমিরুল মুমিনিনের বাইতুল মাকদিস যাওয়াটাই উত্তম হবে।

অবশেষে ১৬ হিজরিতে হজরত উমর ফারুক রা. হজরত আলি রা. কে মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে বাইতুল মাকদিসে রওনা করেন। তিনি একা একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। তার সাথে কোনো দেহরক্ষী, দরবারি বা খাদেমদের দল কোনো কিছুই ছিল না। মাথায় কোনো ছাতা বা পাগড়িও ছিল না। আরবের মরুভূমিতে সফর করছিলেন। সূর্যতাপ তার দেহ ঝলসে দিচ্ছিল। যখন বিশ্রামের সময় হতো তখন তিনি উটের জিন খুলে তাকে বালিশ বানাতেন। গায়ের চাদর বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়তেন।

শামের সীমান্তে প্রবেশ করতে করতেই তার জামা-কাপড় ধূলিমলিন হয়ে গিয়েছিল; বরং তা ছিঁড়েও গিয়েছিল। শামের সেনাবাহিনীর আমিরদেরকে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দামেশকের নিকটবর্তী স্থান জাবিয়ায় একত্র হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

দামেশকের নয়নাভিরাম ফল-ফসল, বাগবাগিচা এবং চমৎকার স্থানসমূহ দেখে অনায়াসেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,

> كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ○ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ○ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
>
> তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান। সুখের কত উপকরণ, যাতে তারা খোশগল্প করত। এমনই হয়েছিল এবং আমি ওগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।[২৩৭]

হঠাৎ এক ইহুদি তাকে দেখে ফেলে। সম্ভবত সে তার ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তাকে চিনে ফেলে এবং বলে, হে ফারুক, তুমিই বাইতুল মাকদিসের বিজেতা।[২৩৮]

মুসলমান সৈনিকরা হজরত উমর ফারুক রা. এর অপেক্ষায় ছিল। উমর রা. শুধু একটি চাদর, পাগড়ি ও মোজা পরিহিত ছিলেন। তিনি এ অবস্থায় উটের লাগাম ধরে পানির ঝরনা এবং হাউজ অতিক্রম করে তাদের নিকট আসছিলেন।

একজন বলল, আমিরুল মুমিনিন, এখানে শামের সেনাবাহিনী এবং খ্রিষ্টান পাদরিরা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দণ্ডায়মান আর আপনার এই অবস্থা?!

তিনি বললেন,

انا قوم اعزنا الله بالاسلام فلن نبتغي العزة بغيره

---

[২৩৭] সুরা দুখান, আয়াত ২৫

[২৩৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৫৫-৬৫৯

> আমরা সেই সম্প্রদায়, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তাই আমরা অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করব না।[২৩৯]

জাবিয়ায় পৌছার পর মুসলমানরা তার জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছিল। হজরত আবু উবাইদা, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান প্রমুখ তাকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি এখানে সেনাপতিদের সামনে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কথা বলেন। তিনি বলেন, অন্তর যদি ঠিক রাখো তা হলে তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আখেরাতের নিয়তে সকল কাজ করবে তা হলে তোমাদের দুনিয়াবি বিষয় ঠিক হয়ে যাবে। যে জান্নাতে যাওয়ার আশা রাখে সে যেন মুসলমানদের জামাতের সাথে থাকে। যে ব্যক্তি একা থাকে সে শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায়।

জাবিয়াতে বাইতুল মাকদিসের খ্রিষ্টান নেতৃবর্গ কথা বলার জন্য এসেছিল। যেহেতু হজরত উমর রা. এর পোশাকআশাক এবং বাহন অতি সাধারণ ছিল, এজন্য সেনাপতিগণ তাকে অবস্থা অনুযায়ী ঘোড়ায় আরোহণ করার এবং উন্নত পোশাক পরিধান করে লোকদের সামনে যাওয়ার অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন,

انا قوم اعزنا الله بالاسلام فلن نبتغي العزة بغيره

> আমরা সেই জাতি, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন; তাই আমরা অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করব না।[২৪০]

হজরত উমর ফারুক রা. সামান্য সময়ের জন্য তাদের প্রদত্ত পোশাক পরিধান করেছিলেন। তাও কেবল এজন্য যে, সেসময় তার পরিহিত পোশাক ধৌত করার জন্য নেওয়া হয়েছিল এবং তাতে কিছু তালি

---

[২৩৯] মুসতাদরাকে হাকিম, ২০৭

[২৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৬৫

লাগানো হয়েছিল। এরপর তিনি এই তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করেন।[২৪১]

এই অতি সাধারণ পোশাকে তিনি বাইতুল মাকদিস-নেতৃবর্গের সাথে আলোচনায় বসেন। সন্ধির শর্তাবলি নির্ধারিত হয়। নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর স্বাক্ষর হয়।

> আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়াবাসীদের (বাইতুল মাকদিস) জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের গির্জা এবং গোটা জাতির সকলে নিরাপদে থাকবে। তাদের উপাসনালয়কে আবাসনের জায়গা বানানো হবে না। এগুলো ধ্বংস করা হবে না। তাদের স্থাপনা এবং সীমানায় কোনো ধরনের সঙ্কোচন করা হবে না। তাদের ক্রুশ ও ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। ধর্ম পরিবর্তন করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। কাউকে কোনো ধরনের ক্ষতি করা হবে না।
>
> বাইতুল মাকদিসের অধিবাসীদের উপর অন্যান্য শহরবাসীর মতো জিজিয়া প্রদান করা আবশ্যক। তাদের জন্য রোমান সৈনিক ও কর্মকর্তাদের শহর থেকে বের করে দেওয়াটাও অবশ্য কর্তব্য।[২৪২]

অঙ্গীকার অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দারা তিন দিনের মধ্যে রোমান সৈন্যদের শহর থেকে বের করে দেয়। হজরত উমর রা. প্রথম কেবলা জিয়ারতের জন্য ভ্রমণ করেন। রাস্তায় একটি নদী পতিত হয়। তখন তিনি মোজা খুলে তা হাতে নেন। উট থেকে নেমে পায়ে হেঁটে নদীটি অতিক্রম করেন। হজরত আবু উবাইদা রা. পেরেশান হয়ে বলেন, আপনার এই ধরনের আচরণ স্থানীয় লোকদের নিকট দৃষ্টিকটু হবে।

তিনি তখন আবু উবাইদা রা. এর বুকে আঘাত করে বলেন, আবু উবাইদা, তুমি এই ধরনের কথা বলছো! তুমি কি ভুলে গেলে যে, তোমরা দুনিয়ার সবচেয়ে অপমানিত, দুর্বল এবং নীচু জাতের লোক ছিলে! আল্লাহ তায়ালা কেবল ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাই জেনে রাখবে, যখনই তোমরা ইসলাম ছেড়ে অন্য

---

[২৪১] প্রাগুক্ত

[২৪২] তারিখুত তাবারি, ৩/৬০৯

কোনো জিনিসে সম্মান তালাশ করবে তখনই আল্লাহ তোমাদের অপদস্থ করে দেবেন।[২৪৩]

তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মেহরাবে দাউদের নিকট দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করেন।

প্রথম কেবলা তথা পবিত্র পাথরকে রোমানরা ময়লা এবং নাপাকির স্তূপ বানিয়ে রেখেছিল। এর একমাত্র কারণ হলো, এটা ইহুদিদের কেবলা ছিল। এর মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা ইহুদিদেরকে উত্তেজিত করে তুলত। হজরত উমর ফারুক রা. পবিত্র পাথরটি খুঁজতে লাগলেন। তখন ইহুদিদের বড় আলেম কাব আহবার- যিনি তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, ইশারা করে বলেন, পবিত্র পাথরটি এখানেই রয়েছে।

কাব আহবার রহ. সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের পরামর্শ দেন। যার মেহরাব থাকবে পাথরটির পেছনে। যার ফলে একই সময়ে একজন ব্যক্তি কাবামুখী হয়ে নামাজ পড়ার পাশাপাশি প্রথম কেবলার দিকেও মুখ করতে পারবে। কিন্তু হজরত উমর রা. এটা অপছন্দ করেন। তিনি পবিত্র পাথরের সামনে এমনভাবে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন যেন নামাজির মুখ থাকে কাবা দিকে আর তাদের পিঠ থাকে পবিত্র পাথরের দিকে। যাতে করে ইহুদিদের সাথে সামান্যও সাদৃশ্য না হয় এজন্যই তিনি এভাবে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

হজরত উমর রা. এর নির্দেশে পবিত্র পাথর থেকে ময়লা-আবর্জনা সরানো শুরু হয়। তিনি নিজেই এ মহৎ কাজ শুরু করেন। নিজ চাদর বিছিয়ে তাতে ময়লা-আবর্জনা উঠাতে থাকেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও এতে অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই এই জায়গাটি পবিত্র করা হয়। সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যা আজ পর্যন্ত মসজিদে উমর নামে প্রসিদ্ধ। এটাকেই মসজিদে আকসা বলা হয়।

হজরত উমর রা. কিছুদিন শামে অবস্থানের পর ১৭ হিজরির শুরুর দিকে মদিনায় ফিরে আসেন।[২৪৪]

---

[২৪৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৬৬

[২৪৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৬৫৫, ৬৬৭→

রোম সম্রাটের সর্বশেষ প্রচেষ্টা

বাইতুল মাকদিস জয়ের পর রোমানদের সকল আশা মাটি হয়ে যায়। স্বয়ং রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস শামে দ্বিতীয়বার প্রবেশের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু ১৭ হিজরিতে আলজাজিরার শাসক এবং বাসিন্দারা তাকে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নতুন করে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে উসকে দেয়। এই কারণে রোমান সম্রাট তার এশিয়া-কেন্দ্রিক রাজধানী হিমস পুনরুদ্ধারের জন্য শেষবারের মতো প্রয়াস চালায়। এজন্য সে এক বিশাল বাহিনী পাঠায়। যারা হিমস অবরোধ করে ফেলে। আলজাজিরার খ্রিষ্টানেরা ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য বের হয়। এর ফলে শামে মুসলমানদের বিজিত এলাকা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়।

একটি অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা

হজরত উমর ফারুক রা. এর বাইতুল মাকদিস সফর সম্পর্কে ওয়ায়েজ ও বক্তাগণ অধিকাংশ সময় বর্ণনা করে থাকেন, সফরে হজরত উমর রা. এর সাথে একজন গোলাম ছিলেন। তারা উভয়ে একটি উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন। বাইতুল মাকদিস পৌঁছার সময় হজরত উমর ফারুক রা. উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন আর তার গোলাম উটের উপর ছিল। কেননা তখন গোলামের পালা ছিল। হজরত উমর রা. কে এই অবস্থায় দেখামাত্র বাইতুল মাকদিসের পাদরি এবং সন্ন্যাসীরা তার হাতে শহরের চাবি তুলে দেন। তাদের কতকে ইসলাম গ্রহণ করেন। আহলে কিতাবের গ্রন্থাদিতে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, এই শহর-বিজেতা উটের লাগাম টেনে আসবেন।

আমি দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ইতিহাসের কোনো কিতাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর এমন কোনো বর্ণনা পাইনি, যার মাধ্যমে উল্লিখিত ঘটনাটি সঠিক প্রমাণিত হবে। তারা এটাও বলে থাকেন যে, জানা নেই বক্তাগণ এই বর্ণনাটি কোথায় পেয়েছেন। পাঠকদের নিকট এই ঘটনাটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ রইল। কেউ কোনো প্রমাণ তালাশ করলে তাকে উত্তর দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই রয়েছে যে, হজরত উমর ফারুক রা. বাইতুল মাকদিস বিজয়ের দুই বছর পর যখন শাম সফর করেন তখন আপন গন্তব্যস্থল 'আইলা'য় এমনভাবে পৌঁছেছিলেন যে, নিজে উটের লাগাম ধরে পায়ে হাঁটছিলেন আর তার গোলাম উটের উপর ছিল। যেহেতু বাইতুল মাকদিসের প্রাচীন নাম ছিল 'ঈলিয়া' যা তার গন্তব্য 'আইলা'র সাথে মিলে যায় এজন্য সম্ভবত বর্ণনাকারীরা 'আইলা'কে 'ঈলিয়া' মনে করে শামের এই সফরকে বাইতুল মাকদিসের সফরের সাথে জুড়ে দিয়েছে।

হজরত উমর ফারুক রা. নতুন এই তুফান মোকাবেলার জন্য একদিকে আলজাজিরার মূল রাস্তায় সৈন্য মোতায়ন করেন। তারা রোমানদের সাহায্যে আগত ৩০ হাজার সৈন্যের বাহিনী প্রতিহত করেন। পাশাপাশি তিনি ইরাক থেকে সাহায্য তলব করে শামের প্রতিরোধ ক্ষমতা মজবুত করেন। মুসলমানদের মনোবল চাঙা রাখার জন্য তিনি নিজেই সফর করে দামেশক উপস্থিত হন।

এ অভিযানে রোমানরা দুর্বল হয়ে যায়। হজরত আবু উবাইদা রা. হিমস অবরোধকারী খ্রিষ্টান সৈন্যদেরকে খোলা মাঠে পরাজিত করে বিতাড়িত করেন। এরপর আর খ্রিষ্টানরা শামে বিশৃঙ্খলা তৈরির দুঃসাহস দেখায়নি। যেহেতু আলজাজিরার কিছু লোক এই সমস্যাটি বাধিয়েছিল এজন্য মুসলমানগণ আলজাজিরা ও আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হতে বিলম্ব করেননি।[২৪৫]

এই পর্যায়ে তিকরিত ও কাইসারিয়া বিজিত হয়। এটা ১৯ হিজরির ঘটনা। কাইসারিয়া হজরত মুয়াবিয়ার হাতে বিজিত হয়েছিল।[২৪৬]

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর পদচ্যুতি ও তার কারণ

বাইতুল মাকদিস বিজয়ের কিছুকাল পর ১৭ হিজরিতে হজরত উমর রা. হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত করেন। কতক ঐতিহাসিকের এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হজরত উমর রা. খলিফা হওয়ামাত্র ১৩ হিজরিতে তাকে পদচ্যুত করেছিলেন। এ ছাড়াও কারো কারো ধারণা হলো হজরত উমর ফারুক রা. হজরত খালিদ রা. এর বিরোধী ছিলেন কিংবা তাকে অযোগ্য মনে করতেন। অথচ এটি আগাগোড়া ভুল কথা। হজরত উমর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে না তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করেছিলেন আর না তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার বিরোধী ছিলেন। তার যোগ্যতার ব্যাপারেও তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তার এ সন্দেহ হবেই-বা কীভাবে; যখন খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদের ব্যাপারে বলেছেন,

---

[২৪৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৪৯-৩৫১

[২৪৬] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৪১

سَيْفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ
আল্লাহ তায়ালার এক তরবারি।[২৪৭]

এই বিষয়ে একটি কথা বুঝতে হবে। হজরত উমর ফারুক রা. ১৩ হিজরিতে খলিফা হওয়ার পরপর হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর স্থলে আবু উবাইদা রা. কে প্রধান সেনাপতি বানানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর বিচ্যুতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা হজরত খালিদ রা. হজরত আবু বকর সিদ্দিকের নির্বাচিত কয়েকজন কমান্ডারের একজন ছিলেন। মুজাহিদরা তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যখন সকল মুজাহিদ একই স্থানে একত্র হয়ে যান তখন সকল কমান্ডার কার অধীনে থেকে যুদ্ধ করবেন- এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। তখন সাময়িক প্রয়োজনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সকলেই হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে প্রধান সেনাপতি মেনে নেন। যদিও তা সাময়িকের জন্য ছিল; কিন্তু ইয়ারমুকের প্রথম লড়াইয়েও তাকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে বহাল রাখা হয়।

এর মধ্যেই হজরত উমর রা. খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি শামের রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত বিভিন্ন সেনাদলের জন্য খেলাফতের পক্ষ থেকে একজন প্রধান সেনাপতি নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এজন্য তিনি হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. কে প্রধান সেনাপতি নির্ধারণ করেন। ইতিপূর্বে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. প্রধান সেনাপতি ছিলেন, যাকে খেলাফতের পক্ষ থেকে কাউকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করা পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই যখনই হজরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত হুকুমনামা এসে পৌঁছয়, হজরত খালিদ রা. তৎক্ষণাৎ আবু উবাইদা রা. কে প্রধান সেনাপতি মেনে তার অধীনে কাজ শুরু করেন। তার পূর্বের অবস্থান তথা নির্দিষ্ট সংখ্যক মুজাহিদের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হ্যাঁ, এটা সঠিক কথা যে, হজরত উমর ফারুক পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে পদচ্যুত করেছিলেন। এটা খেলাফতে ফারুকের চতুর্থ

---

[২৪৭] সুনানে তিরমিজি, ৩৮৪৬

বছর—১৭ হিজরির ঘটনা। এর মূল কারণ হলো, হজরত উমর ফারুক রা. লক্ষ করেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. যে যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। এই কারণে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যে যুদ্ধে থাকবেন সেখানে মুসলমানদের পরাজয় হতে পারে না। হজরত উমর রা. শুধু মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিই নয়; বরং তাদের চিন্তাভাবনা সংশোধনের প্রতিও উত্তমরূপে খেয়াল রাখতেন। তিনি কোনো উপলক্ষে ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরি হওয়ার সামান্য থেকে সামান্যতর কারণ বরদাশত করতে পারতেন না।

যখন তিনি আশঙ্কা করলেন যে, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর এই যশখ্যাতির কারণে প্রথমে ব্যক্তিপূজা এবং পরবর্তীতে ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্ম নিতে পারে, তখন তিনি এই মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইসলামকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত করার পর এক সময় তাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তখন এতে কোনো সমস্যা ছিল না। ইসলামের এই নির্লোভ সৈনিক আনুগত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি এই ফয়সালা কবুল করে নেন। পরবর্তীতে একজন সাধারণ সৈনিকের মতো লড়াই করতে থাকেন।

কতক ঐতিহাসিক খালিদ বিন ওয়ালিদের পদচ্যুতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি লাবিদের কবিতা শুনে পুরস্কারস্বরূপ তাকে এক হাজার দিরহাম প্রদান করেছিলেন। হজরত উমর রা. এ ঘটনা জানতে পেরে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, যদি তিনি বাইতুল-মাল থেকে এ অর্থ প্রদান করে থাকেন তা হলে এটা খারাপ বিষয় আর যদি তিনি নিজ পকেট থেকে তা দিয়ে থাকেন তা হলে এটা অপচয়।[২৪৮]

কিন্তু এই বর্ণনায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে হজরত খালিদ রা. এই অর্থ নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই এটি কোনো গুনাহের কাজ নয়। হ্যাঁ, হজরত উমর ফারুক রা. এটা পছন্দ করেননি। কেননা তিনি অত্যন্ত সতর্ক মেজাজের মানুষ ছিলেন। কিন্তু এর মাধ্যমে হজরত খালিদ রা. এর উপর কোনো ধরনের আপত্তি-অভিযোগ আরোপিত হওয়া আবশ্যক হয় না।

---

[২৪৮] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৫৯, ৩৬০

আরেকটি বিষয় হলো, হজরত খালিদ রা. এ অবাঞ্ছনীয় খরচের পূর্ণতাদানের জন্য বাইতুল-মালে এই পরিমাণ অর্থ জমা করে দেন। তখন হজরত উমর রা. অত্যন্ত খুশি হন। সর্বশেষ কথা- যা সকল সন্দেহ দূর করে দেয় তা হলো, উমর রা. তাকে পদচ্যুত করার সময় বলেছিলেন, খালিদ, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।[২৪৯]

শুধু এটাই নয়; বরং হজরত উমর রা. মুসলমানদেরকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর ব্যাপারে সকল ধরনের সন্দেহ থেকে মুক্ত করার জন্য গোটা রাজ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আমি খালিদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা তার কোনো খারাপ আচরণের কারণে তাকে পদচ্যুত করিনি; বরং বিষয়টি হলো, লোকজন তার সামরিক কীর্তির কারণে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছিল। আমার আশংকা হচ্ছিল- না জানি লোকজন এক সময় তার উপর ভরসা করে বসে। আমি মানুষকে জানাতে চেয়েছি যে, সকল কিছু সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ। মানুষ যাতে কোনো ধরনের ফেতনায় নিপতিত না হয় এজন্যই আমি এটা করেছি।[২৫০]

দুর্ভিক্ষ

বিজয় এবং বরকতপূর্ণ জমানায় মুসলিম উম্মাহকে দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের ধৈর্য ও সাহসিকতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রথমটি ১৮ হিজরিতে সংঘটিত হয়। এ বছর চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যে কারণে আরবভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে ধুলাবালি উড়তে থাকে। দুর্ভিক্ষের কারণে হজরত উমর ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। যতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল ততদিন তিনি ঘি, দুধ ও গোশত চেখে দেখেননি। ক্ষুধার কারণে মানুষের চেহারা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে এ বছরকে আমুর রামাদা (ছাইয়ের বছর) বলা হয়।

---

[২৪৯] প্রাগুক্ত

[২৫০] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৫৯, ৩৬০

পরিশেষে হজরত উমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-খাবারের যোগান বিষয়ে পরামর্শ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী শাম ও ইরাকের গভর্নরকে চিঠি লিখে শস্য-ফলাদির কাফেলা পাঠাতে বলা হয়। হজরত আবু উবাইদা রা. শস্য-ফলাদি বোঝাই চার হাজার উট প্রেরণ করেন।

এই সময় মুযাইনা গোত্রের এক বেদুইন ক্ষুধার যাতনায় নিজের বকরি জবাই করে ফেলে। দেখতে সেটা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। চামড়া ছিলার পর ভেতর থেকে শুধু হাড্ডি বের হয়। এটা দেখে বেদুইন চিৎকার করে বলে, হায়, মুহাম্মদ (তিনি থাকলে এমনটি ঘটত না)। স্বপ্নে তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নসিব হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, 'উমরকে আমার সালাম পাঠাবে। তাকে বলবে, তুমি তো সকল বিধান পালনের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান। কথাবার্তায় পাকাপোক্ত মানুষ। তোমার কী হলো! চিন্তাভাবনার সাথে কাজ করো।'

বেদুইন লোকটি হজরত উমর রা. দরজায় পৌছে তার গোলামকে বলে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত। আমাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দাও। হজরত উমর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম শোনান তখন হজরত উমর রা. বুঝে যান যে, এর মাধ্যমে ইসতিসকার সুন্নাত নামাজ তাজা করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

তিনি সুন্নাত অনুযায়ী ইসতিসকার নামাজের জন্য মদিনা থেকে বের হন। হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব রা. কে সাথে নেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেন।

এর অল্প ক্ষণ পরই দিগন্তে মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। আকাশে বিজলি চমকাতে থাকে। এর সাথে আওয়াজ হতে থাকে,

اتاك الغوث ابا حفص

আবু হাফস (উমর), তোমার জন্য সাহায্য চলে এসেছে।

হজরত উমর ফারুক রা. মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই খেত-খামারে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। পুকুর-নালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। গোটা আরবের দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। ওইদিকে শাম ও ইরাক থেকে শস্য-

ফলাদির কাফেলাও চলে আসে। মুসলমানগণ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।[২৫১]

আমাওয়াস প্লেগ

দ্বিতীয় বিপদ হলো প্লেগ। এই প্লেগ শামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭ হিজরির শেষদিকে বাইতুল মাকদিসের পার্শ্ববর্তী এলাকা আমাওয়াস থেকে এর সূচনা হয়। কয়েক মাস পর্যন্ত এর সংক্রমণ চলতে থাকে। বহুলোক এতে আক্রান্ত হয়।

মুজাহিদদের ক্যাম্পও এ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিন একটি করে জানাজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে এলাকায় অবস্থান করছিলেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু নির্দেশনার মাধ্যমে মহামারিকবলিত এলাকা থেকে পলায়নের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বুঝে আসে।[২৫২]

হজরত উমর ফারুক রা. মহামারিতে আক্রান্ত লোকদের ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। তিনি নিজে শামে গিয়ে মুজাহিদদেরকে অন্যত্র স্থানান্তর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সেনাপতি হজরত আবু উবাইদা রা.

---

[২৫১] কানযুল উম্মাল, হাদিস নং, ২৩৫৩৮, তারিখুত তাবারি, ৪/৮৯, ৯৯, ১০০
হায়াতুস সাহাবা (উর্দু তরজমা মাওলানা এহসানুল হক) ৩/৬৪০

[২৫২]

بقيّةُ رجزٍ أو عذابٍ أُرسِلَ على طائفةٍ من بني إسرائيلَ. فإذا وقعَ بأرضٍ وأنتُمْ بها فلا تخرُجوا منها وإذا وقعَ بأرضٍ ولستُمْ بها فلا تَهبِطوا عليها

প্লেগ বনি ইসরাইলের উপর প্রেরিত আজাবের অবশিষ্টাংশ। যখন কোনো এলাকায় প্লেগ দেখা দেবে তখন তোমরা সেখান থেকে বের হবে না। আর অন্য এলাকায় থাকলে তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে না।

সুনানে তিরমিজি, ১০৬৫;

আমাদের সম্মানিত উসতাদ মাওলানা মুহাম্মদ যাহেদ (শাইখুল হাদিস জামিয়া এমদাদিয়া ফয়সালাবাদ) সুনানে তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকমিলাতু মাআরিফুস সুনানের প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তার উক্ত আলোচনার দ্বারা এ সংক্রান্ত সকল শরয়ী ও ডাক্তারি বিষয়ের সমাধান হয়ে যায়। আলেমগণ অবশ্যই তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটা তাকদিরের ফয়সালা থেকে পলায়নের নামান্তর।

হজরত উমর রা. আবু উবাইদা রা. কে মহামারি-আক্রান্ত এলাকা থেকে বের করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাকে চিঠি লেখেন, 'এক জরুরি প্রয়োজনে তোমার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই। তাই অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ প্রদান করছি যে, এই চিঠি পাঠমাত্র আমার নিকট রওনা দিয়ে দেবে।'

হজরত আবু উবাইদা রা. হজরত উমর রা. এর প্রয়োজনের কথা বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, প্লেগ-আক্রান্ত এলাকা থেকে বের করার জন্যই একটি প্রয়োজনের কথা বলে তিনি আমাকে মদিনায় নিতে চাচ্ছেন। তাই তিনি সাথি-সঙ্গীদের বলেন, 'আমি আমিরুল মুমিনিনের প্রয়োজনের কথা বুঝে গেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাকি রাখতে চান, যে বাকি থাকার মতো নয়।'

এটা বলে জবাবি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি যে প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছিলেন আমি সেটা জেনে গেছি। আমি এমন এক বাহিনীর সাথে আছি, যাদের থেকে আমার অন্তর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে আসতে চাই না যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমার এবং তাদের ব্যাপারে ফয়সালা না করেন। তাই আমাকে আপনার নির্দেশ মান্য করার ক্ষেত্রে অপারগ মনে করুন। সৈন্যদের সাথে আমাকে থাকতে দিন।'

চিঠি পাঠে হজরত উমর ফারুক রা. এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। সাথি-সঙ্গীরা তাকে অশ্রুসজল দেখে জিজ্ঞেস করেন, আবু উবাইদার কি মৃত্যু হয়ে গেছে? তিনি বলেন, মৃত্যু তো হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে অচিরেই মৃত্যু হয়ে যাবে।

এরপর হজরত উমর রা. আবু উবাইদা রা. কে দ্বিতীয় চিঠি লেখেন। তিনি বলেন, আপনি সেনাবাহিনী নিয়ে নির্মল আবহাওয়াবিশিষ্ট কোনো উঁচু ভূমিতে চলে যান।

হজরত আবু উবাইদার রা. এর নিকট যখন এ চিঠি পৌছে তখন তিনি আবু মুসা আশআরি রা. কে ডেকে বলেন, আমিরুল মুমিনিনের চিঠি

এসেছে। আপনি এখন সেনাবাহিনী নিয়ে অবস্থান করার মতো একটি জায়গা অনুসন্ধান করুন। আবু মুসা আশআরি রা. এমন জায়গা তালাশ করার জন্য প্রথমে ঘরে পৌঁছান। ঘরে গিয়ে দেখেন তার স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত হয়ে গেছে। তিনি ফিরে এসে হজরত আবু উবাইদা রা. কে বিষয়টি জানান।

এটা শুনে আবু উবাইদা রা. নিজেই এমন ভূমি তালাশের জন্য বের হন। তিনি উটে কাজওয়া বাঁধেন। তখনও তিনি পাদানিতে পা রাখেননি। এর মধ্যেই প্লেগ তার উপর আক্রমণ করে। এই অবস্থায় তিনি সৈন্যবাহিনীকে জাবিয়ার দিকে নিয়ে যান। ততক্ষণে হাজার হাজার মুজাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হজরত আবু উবাইদা রা. এ রোগে আক্রান্ত হয়েই আপন প্রতিপালকের সাথে মিলিত হন। এরপর হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান, হজরত হারিস বিন হিশাম, হজরত সুহাইল বিন আমর, হজরত উকবা বিন সুহাইল, হজরত আমের বিন গায়লান রা. এর মতো বড় বড় সাহাবি এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তারা প্রত্যেকেই মুসলিম উম্মাহকে দৃঢ় ও নিরাপদ রাখার মতো এক একটি মজবুত স্তম্ভ ছিলেন।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এ অবস্থা লক্ষ করে বিপদআক্রান্ত স্থানে অবস্থান করাটা সঠিক মনে করলেন না। তিনি সৈন্যদের বুঝিয়ে নিরাপদ এবং নির্মল আবহাওয়াবিশিষ্ট পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যান। এখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ মহামারি থেকে মুক্তি দান করেন। এসময়ে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান আল্লাহ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান। ফলে শামের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। কিছুকাল তারা নিজেদের এলাকার প্রতিরক্ষার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেননি।

হজরত উমর ফারুক রা. কিছুদিন পর নিজের গোলাম ইয়ারফার সাথে একটি উটনীতে আরোহণ করে বিপদ-আক্রান্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শামে রওনা হন। রাস্তায় কখনো গোলাম আবার কখনো হজরত উমর সওয়ার হচ্ছিলেন।

আইলা (শাম) পৌঁছার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করতে থাকে আমিরুল মুমিনিন কে? হজরত উমর রা. তখন উটনীর লাগাম ধরে ছিলেন আর

গোলাম ইয়ারফা উটনীর উপর ছিল। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলে লোকজন পেরেশান হয়ে যায়। হজরত উমর ফারুক রা. কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। মৃত ব্যক্তিদের স্বজন এবং অসুস্থদের সান্ত্বনা প্রদান করেন।

হজরত বেলাল রা.-ও সেই বাহিনীতে ছিলেন। হজরত উমর রা. এর বলার কারণে এ দিন তিনি আজান দেন। প্লেগের কারণে মানুষের মন তখন এমনিতেই ভগ্ন ছিল। এই অবস্থায় যখন অবিকল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানার আজান শুরু হলো, লোকজন তখন অঝোরধারায় ক্রন্দন করতে লাগল। এ আজান দ্বারা হজরত উমর ফারুক রা. সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি উঠে গিয়েছিল।

হজরত উমর রা. শামের সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো নতুন করে বিন্যস্ত করেন। হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. কে শামের গভর্নর নিয়োগ করেন। এই প্লেগে হজরত ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. এর মৃত্যুর পর দামেশক ও তার আশপাশের এলাকায় একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন ছিল। হজরত উমর ফারুক রা. হজরত ইয়াজিদ রা. এর ছোটভাই হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. কে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন থেকে ৪২ বছর পর্যন্ত দামেশক তার অধীনেই থাকে।[২৫৩]

---

[২৫৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে। আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৭৬-৩৭৯

মিসর বিজয়

হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে মিসর-বিজয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মিসর দুনিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহক। হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা এবং হজরত হারুন আ. এর মতো বড় বড় নবীর আবাসস্থল ছিল এটি। তৎকালীন যুগেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিশিল্পের অনেক বড় এক কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চল।

বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পর হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর অন্তরে মিসরের প্রতি অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে ইসলামপূর্ব জমানায় তিনি মিসর সফর করেছিলেন। মিসরের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। মিসরের অধিকাংশ এলাকাই ছিল গ্রামীণ। শুধু নীলনদ এবং রোমসাগরের উপকূলে গড়ে ওঠা দুই-তিনটি শহরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই গোটা দেশ করতলে আনা সম্ভব ছিল।

এখানে এ বিষয়টি অবগত হওয়া আবশ্যক যে, মিসরের কিবতি পাদরিরা হজরত ঈসা আ. এর ব্যাপারে রোমানদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করত। এ ছাড়া অন্য এক কারণে তারা রোমান সম্রাটের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। অসন্তুষ্টির কারণ হলো মিসরের শাসক মুকাওকিস রোমানদের খুশি করার জন্য স্থানীয় কিবতি বাসিন্দাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাত। এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা অধীর অপেক্ষায় ছিল। মিসর জয় করা এ কারণেও জরুরি ছিল যে, রোমের বাদশাহর মুকাওকিসকে নিয়ে শুধু শামের সীমান্তেই আক্রমণ করার আশঙ্কা ছিল না; বরং বিজিত এলাকায় বিদ্রোহ উসকে দেওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তাই রোম-সম্রাটের শক্তি খর্ব করতে এবং শামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করতে মিসরকে আয়ত্তে আনার কোনো বিকল্প ছিল না।

মোটকথা, মিসরের অবস্থা মুসলমানদেরকে সেখানে আক্রমণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিল। এ বিষয়গুলো সামনে রেখে হজরত আমর ইবনুল আস রা. পীড়াপীড়ি করে হজরত উমর রা. এর পক্ষ থেকে এখানে অভিযান পরিচালনার অনুমতি লাভ করেন। হজরত উমর রা. এর মধ্যে এই অভিযানের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা ছিল। দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ হিজাজ ও শামের মুসলমানদের দুর্বল করে ফেলেছিল। এ ছাড়াও তখন পর্যন্ত ইরানে ঘোরতর লড়াই অব্যাহত ছিল। তাই এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনো অভিযান শুরু করাটা বিচক্ষণতার পরিপন্থি ছিল। হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর পীড়াপীড়ির কারণে উমর রা. লিখে পাঠান যে, সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকো। কিন্তু মিসরের সীমান্তে প্রবেশের পূর্বেই যদি আমার দ্বিতীয় চিঠি চলে আসে তা হলে ফিরে আসবে।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. অনুমতি পাওয়া মাত্র চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে শাম থেকে মিসরের দিকে রওনা দেন। এটা ১৯ হিজরির ঘটনা। কিছুদিন সফরের পর হজরত উমর রা. এর নির্দেশ আসে যে, তোমরা ফিরে আসো। কিন্তু ততক্ষণে হজরত আমর ইবনুল আস রা. মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করে আরিশের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার পূর্ণ আস্থা ছিল যে, মিসর অভিযানে তিনি অবশ্যই সফল হবেন।

তার মিসরবাসীর সাথে সদাচরণের সেই নসিহত স্মরণ ছিল, যা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গিয়েছিলেন। কেননা মিসরবাসীদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আরবে মুসতারিবার দাদা হজরত ইসমাইল আ. এর মাতা হাজেরা মিসরীয় ছিলেন। এ ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দা অর্থাৎ কিবতিদের এক মেয়ে হজরত মারিয়া কিবতিয়া রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদি এবং তার ছেলে ইবরাহিম রা. এর জননী ছিলেন।

আমর ইবনুল আস রা. জানতেন, মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি চিঠির সম্মান করেছিলেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উত্তম আচরণের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের মন জয় করে নেন। মিসরের বড় পাদরি আবু মারিয়াম তার মোকাবেলার জন্য সৈন্যসামন্তসহ সীমান্তে এসেছিল। কিন্তু সে হজরত আমর ইবনুল আস রা. এবং মিসরবাসীদের

প্রতি তার উত্তম আচরণের কথা শুনে অনায়াসে বলে, এত দূরবর্তী আত্মীয়তার সম্পর্ক কেবল নবীরাই বহাল রাখেন।

পরিশেষে হজরত আমর ইবনুল আস রা. সীমান্তবর্তী আরিশ ও বিলবিস দুর্গ জয় করে নীলনদের তীরবর্তী মিসরের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যান, যাকে ব্যবিলন বলা হতো। মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস এখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ইউরোপ থেকে রোমান সম্রাটের নির্দেশ আসে যে, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মিসরের স্থানীয় বাসিন্দারাও সন্ধি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু রোমানদের নির্দেশের কারণে তারা চুপসে যায়।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. শহর অবরোধ করেন। দীর্ঘ সাত মাস এ অবরোধ চলে। তার সবচেয়ে বড় তাঁবুটি মিসরের দুর্গের সামনেই গাড়া হয়েছিল। দীর্ঘ সাত মাস পর্যন্ত এখানে তাঁবু রাখার কারণে কবুতর তাতে বাসা বানিয়ে ফেলেছিল। এইদিকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধও চলছিল। দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত ও উঁচু ছিল। এ কারণে দুর্গ-জয়ে সফল হতে সীমাহীন কষ্ট করতে হচ্ছিল। অবশেষে হজরত উমর রা. তাদের সাহায্যে ১৯ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে ১২ হাজার মুজাহিদের এক বাহিনী পাঠান, যার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হজরত উবাদা বিন সামেত, হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো সাহাবিগণ।

একদিন হজরত যুবাইর রা. কিছু জানবাজ সাথি নিয়ে সিঁড়ি লাগিয়ে একা দেয়ালের প্রাচীরে উঠে যান। লড়াই করতে করতে তারা ভেতরে নেমে দরজা খুলে দেন। এইভাবে ২০ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফেরাউনের জাঁকজমকপূর্ণ আস্তানা ইসলামের সামনে মাথা নত করে দেয়। মুকাওকিসসহ স্থানীয় কিবতি বাসিন্দা এবং রোমানদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

মুকাওকিস সোজা রোম উপসাগরের তীরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া শহরে গিয়ে দুর্গবন্দি হয়ে যায়। এটি মিসরের সবচেয়ে বড় শহর ছিল। হজরত ঈসা আ. এর সোয়া তিনশত বছর পূর্বে বাদশাহ সিকান্দার শহরটি আবাদ করেছিল। হজরত আমর ইবনুল আস রা. সেটা বিজয়ের ইচ্ছা পোষণ করে। রোমান সম্রাট মুসলমানদের পরিকল্পনা বুঝতে

প্রতি তার উত্তম আচরণের কথা শুনে অনায়াসে বলে, এত দূরবর্তী আত্মীয়তার সম্পর্ক কেবল নবীরাই বহাল রাখেন।

পরিশেষে হজরত আমর ইবনুল আস রা. সীমান্তবর্তী আরিশ ও বিলবিস দুর্গ জয় করে নীলনদের তীরবর্তী মিসরের রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যান, যাকে ব্যবিলন বলা হতো। মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস এখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ইউরোপ থেকে রোমান সম্রাটের নির্দেশ আসে যে, তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মিসরের স্থানীয় বাসিন্দারাও সন্ধি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু রোমানদের নির্দেশের কারণে তারা চুপসে যায়।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. শহর অবরোধ করেন। দীর্ঘ সাত মাস এ অবরোধ চলে। তার সবচেয়ে বড় তাঁবুটি মিসরের দুর্গের সামনেই গাড়া হয়েছিল। দীর্ঘ সাত মাস পর্যন্ত এখানে তাঁবু রাখার কারণে কবুতর তাতে বাসা বানিয়ে ফেলেছিল। এইদিকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধও চলছিল। দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত ও উঁচু ছিল। এ কারণে দুর্গ-জয়ে সফল হতে সীমাহীন কষ্ট করতে হচ্ছিল। অবশেষে হজরত উমর রা. তাদের সাহায্যে ১৯ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসে ১২ হাজার মুজাহিদের এক বাহিনী পাঠান, যার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হজরত উবাদা বিন সামেত, হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো সাহাবিগণ।

একদিন হজরত যুবাইর রা. কিছু জানবাজ সাথি নিয়ে সিঁড়ি লাগিয়ে একা দেয়ালের প্রাচীরে উঠে যান। লড়াই করতে করতে তারা ভেতরে নেমে দরজা খুলে দেন। এইভাবে ২০ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফেরাউনের জাঁকজমকপূর্ণ আস্তানা ইসলামের সামনে মাথা নত করে দেয়। মুকাওকিসসহ স্থানীয় কিবতি বাসিন্দা এবং রোমানদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

মুকাওকিস সোজা রোম উপসাগরের তীরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া শহরে গিয়ে দুর্গবন্দি হয়ে যায়। এটি মিসরের সবচেয়ে বড় শহর ছিল। হজরত ঈসা আ. এর সোয়া তিনশত বছর পূর্বে বাদশাহ সিকান্দার শহরটি আবাদ করেছিল। হজরত আমর ইবনুল আস রা. সেটা বিজয়ের ইচ্ছা পোষণ করে। রোমান সম্রাট মুসলমানদের পরিকল্পনা বুঝতে

পেরে তৎক্ষণাৎ প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। হজরত আমর ইবনুল আস রা. যখন আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে মার্চ করার ইচ্ছা করেন তখন দেখেন যে, কবুতরগুলো তাঁবুতে বাসা বানিয়ে ডিম পেরে রেখেছে। তাই তিনি তাঁবুগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দেন। সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার পথে রওনা হন।

আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধকালেই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুবরণ করে। এরপর তার ছেলে কনস্টান্টিন রোমের সম্রাট হয়। সে স্বল্প বয়স্ক হওয়ার পাশাপাশি অনভিজ্ঞও ছিল। এজন্য মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস তার ইচ্ছা ও আগ্রহ উপেক্ষা করে কিবতিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করেন। আলেকজান্দ্রিয়াকে মুসলমানদের নিকট সোপর্দ করে দেন। এখানে সন্ধিচুক্তিতে খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের জিজিয়া প্রদানের শর্তে তাদের জানমাল ও উপাসনালয় নিরাপদ রাখা এবং ধর্মপালনের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এও সিদ্ধান্ত হয় যে, রোমান সৈন্যরা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চলে যাবে। পরবর্তীতে মিসরবাসীরা তাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। রোমান বাদশাহ কনস্টান্টিন এই চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সে তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়।

রোমান সম্রাট এবং তার প্রতিনিধিদের ধর্মীয় বিষয়ে কঠোরতা, অতিরিক্ত করারোপ এবং জুলুম-নির্যাতনের কারণে মিসরের স্থানীয় জনগণ এক আজাবের মধ্যে ডুবে ছিল। রোমানরা এখানে নির্যাতনমূলক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, কিবতিরা শত শত বছর ধরে যার কবলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। মুসলমানরা তাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তাদেরকে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করেন।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের ফলে এশিয়া মাইনর ব্যতীত এশিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চলে রোমানদের নাক গলানোর সুযোগ খতম হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তাদের শক্তিতে বড় আঘাত লাগে। অপরদিকে শামে মুসলমানদের শক্তি মজবুত হয়ে ওঠে। আলেকজান্দ্রিয়ার পর মিসরের অবশিষ্ট দুর্গগুলো সাধারণ লড়াইয়ের পর বিজিত হয়ে যায়। হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. মিসর বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদিনায় আসেন। তিনি হজরত উমর

ফারুক রা. কে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। উমর রা. তা শোনামাত্র সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর তিনি ঘোষকের মাধ্যমে মদিনাবাসীদেরকে ডেকে একত্র করেন। হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. এর মুখে তাদেরকে এই বিজয়ের সংবাদ শোনান।

মিসর অভিযানে হাজার হাজার রোমান ও কিবতি গ্রেফতার হয়। হজরত উমর রা. বন্দিদের ব্যাপারে আমর ইবনুল আস রা. কে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, সকলকে একত্র করে তাদেরকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করো। যে চায় সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যায় আর যে চায় সে ইচ্ছা করলে আগের ধর্মের উপর বহাল থেকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাকে শুধু জিজিয়া প্রদান করতে হবে, যা ইসলামি শরিয়ত জিম্মিদের উপর আবশ্যক করে থাকে। হজরত আমর ইবনুল আস এই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেন। এতে একসাথে বহুসংখ্যক বন্দি মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমানগণ এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. এ বিজয়ের পর ফেরাউনদের রাজধানী ব্যবিলন ফিরে আসেন। তখন পর্যন্ত তার তাঁবু কবুতরের জন্য দুর্গের সামনে যেভাবে গাড়া ছিল সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। হজরত আমর ইবনুল আস রা. তাঁবু-গাড়া সেই ময়দানের জমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এর ফলে মানুষ দ্রুত সেখানে বিভিন্ন কাঁচাপাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। তাঁবুকে আরবিতে ফুসতাত বলা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ জায়গাকে ফুসতাত বলা হতে থাকে। পরবর্তীতে এটিই মিসরের রাজধানীর নাম হয়ে যায়।[২৫৪]

কিছুদিন পর হজরত উমর রা. মিসরের কর সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে দক্ষিণ অংশের গভর্নর

---

[২৫৪] হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে বনু ওবায়েদ যখন ফুসতাতের সন্নিকটে কায়রো আবাদ করে তখন ফুসতাত থেকে রাজধানীর মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. ফুসতাত ও কায়রো মিলিয়ে ফেলেন। এর ফলে ফুসতাত কায়রোর অংশ হয়ে যায়।

নির্ধারণ করেন। আর উত্তর অংশে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. কে গভর্নর নিযুক্ত করেন।[২৫৫]

নীলনদের দুলহান

এই সময়ে মিসরে একটি বিরল ঘটনা সংঘটিত হয়, যার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা এবং হজরত উমর ফারুক রা. এর মর্যাদার বিষয়টি বুঝে আসে। ঘটনাটি মুসলমানদেরকে সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মিসরের নিয়ম ছিল কিবতি মাস 'বুনাহ'র বারো তারিখ (২৫ মে) একজন কুমারী নারীকে নববধূর মতো উত্তম কাপড় এবং স্বর্ণ-গয়না দিয়ে সজ্জিত করে নীলনদে ফেলে দেওয়া হতো। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্যমতে এ প্রথাটি পালন না করা হলে নীলনদের পানি শুকিয়ে যায়।

লোকেরা হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে এই প্রথা পালনের সুযোগ প্রদানের আবেদন করে। হজরত আমর ইবনুল আস রা. তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন, ইসলামে এসবের কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। এ কারণে এ প্রথা-পালনের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাস্তবিকভাবেই নদীর পানি শুকিয়ে যেতে থাকে। জুন ও জুলাই মাস অতিক্রম করে যখন আগস্ট মাস শুরু হয় তখন নদীর সকল পানি শুকিয়ে যায়। খেত-খামার ফসলহীন হয়ে যেতে থাকে। স্থানীয় লোকেরা সংকটে পড়ে শহর থেকে বাড়িঘর স্থানান্তর করার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

হজরত আমর ইবনুল আস রা. চিঠির মাধ্যমে হজরত উমর রা. কে এ বিষয়ে অবগত করেন। উমর রা. উত্তরে লেখেন, তুমি যা করেছ তা সম্পূর্ণ ঠিক কাজ করেছো। এই চিঠির সাথে আমি একটি ছোট্ট কাগজের টুকরো দিয়ে দিয়েছি। তুমি সে টুকরোটি নীলনদে ফেলে দেবে।

---

[২৫৫] ফুতুহুল বুলদান, ২১০-২১৩; তারিখুত তাবারি, /১০৪-১১২; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১০০; ফাতহে মিশর, ১৪-৩৪

হজরত আমর ইবনুল আস রা. কাগজের ছোট্ট টুকরোটি দেখেন। তাতে লেখা ছিল, 'আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে মিসরবাসীদের নদী নীলের নামে। হে নীল, যদি তুমি তোমার খেয়াল-খুশিতে প্রবাহিত হয়ে থাকো তা হলে তোমার নিকট আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি একক পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়ে থাকো তা হলে আমরা আল্লাহর নিকট আবেদন করছি, তিনি যেন তোমার পানি প্রবাহিত করে দেন।'

হজরত আমর ইবনুল আস রা. রাতের বেলা কাগজের এই টুকরোটি নীলনদে ফেলে দিয়ে আসেন।

স্থানীয় লোকজন ঘরবাড়ি স্থানান্তর করার জন্য নিজেদের মালপত্র বেঁধে ফেলেছিল। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পায় নদীতে পানি থৈ থৈ করছে। পানি মেপে দেখা হয়। তাতে চব্বিশ ফুট পানি পাওয়া যায়। সেইদিন থেকে আজ অবধি কখনো নীলনদের পানি শুকায়নি।[২৫৬]

---

[২৫৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৯৬, ২০ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়াজদাগিরদের সর্বশেষ চেষ্টা... নিহাওন্দের যুদ্ধ

ইরাক ও পারস্য থেকে সাসানিদের বিছানা-পাটি গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইয়াজদাগিরদ তখনো বেঁচে ছিল। রায়, ইসফাহান, কিরমানসহ কিছু স্থানে সে সৈন্যসমাবেশ ঘটাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। সবশেষে খোরাসানের কেন্দ্রীয় শহর মার্ভে সে অবস্থান স্থির করার সুযোগ লাভ করে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিয়ে সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মার্ভে সে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে। অগ্নি-দেবতার নামে সে মানুষদের পুনরায় যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করে তোলে। অগ্নিপূজকদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, সাসানিবংশ সংরক্ষণ এবং নিজ ভূখণ্ডের সম্মানার্থে এক পতাকাতলে একত্র হওয়ার জন্য সে সাসানি সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসকারী লোকদের আহ্বান জানায়। দূরদূরান্তের এলাকায় সে এই আহ্বান পৌছে দেয়। এর ফলে চতুর্দিকে হইচই পড়ে যায়। ইসফাহান ও তাবারিস্তান থেকে নিয়ে মুকরান ও সিন্ধুর লোকেরা দলে দলে সেই পতাকার নিচে জমায়েত হতে থাকে। এইভাবে দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তৈরি হয়ে যায়। তাদেরকে আলে সাসানের প্রসিদ্ধ শাহজাদা মরদান শাহ বিন হুরমুজের নেতৃত্বে পাঠানো হয়। এই সময় তাদের প্রধান সেনাপতির মাথায় পবিত্র পতাকা 'দিরাফশ কাবিয়ানি' ঝুলছিল। এই বিশাল বাহিনী নিহাওন্দ নামক স্থানে এসে তাঁবু গাড়ে। বহু দূরদূরান্ত পর্যন্ত ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াজদাগিরদের এই প্রস্তুতির সংবাদ হজরত উমর ফারুক রা. কে অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি পরামর্শসভা আহ্বান করে মতামত প্রদান করতে বলেন। কাদিসিয়ার মতো পুনরায় কিছু সাহাবি এই মত প্রদান করেন যে, আমিরুল মুমিনিনকে এই চূড়ান্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু হজরত আলি রা. এর মত ছিল আমিরুল মুমিনিন কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। তিনি প্রত্যেক রণক্ষেত্র থেকে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পারস্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

হজরত উমর রা. এই মতটি গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে নেতৃত্বদানের জন্য কুফায় অবস্থানকারী হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. এর নাম নির্বাচন করেন। আমিরুল মুমিনিনের নির্দেশ আসামাত্র তিনি ত্রিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে নিহাওন্দ অভিমুখে অগ্রসর হন। হজরত উমর ফারুক রা. এর নির্দেশে মুসলমানদের একটি দল পারস্য থেকে পারসিকদের সাহায্য আসার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। এইভাবে কুফার ইসলামি বাহিনী কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হওয়া ব্যতীতই নিহাওন্দে পৌঁছতে পেরেছিল।

মুসলিম বাহিনীতে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত মুগিরা বিন শুবা, হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন, হজরত আমর বিন মাদিকারিব, হজরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো প্রসিদ্ধ সাহাবিগণ ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত মুগিরা বিন শুবা দূত হিসেবে পারসিক সিপাহসালারের সঙ্গে আলোচনা করেন; কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

অবশেষে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. সেনাদলের প্রত্যেক প্রথম কাতারের দায়িত্ব আপন ভাই হজরত নুয়াইম রা. কে প্রদান করেন। আর ডান ও বাম বাহু এবং পদাতিকদের দায়িত্ব হজরত হুজাইফা রা. এর কাঁধে এবং তার অপর ভাই হজরত সুআইদ রা. এর নিকট অর্পণ করেন।

পারসিকরা এবারের যুদ্ধে অত্যন্ত অদ্ভুত পদ্ধতিতে সেনা বিন্যাস করেছিল। পরিখা খনন করে পারসিক সৈন্যরা তাতে প্রবেশ করেছিল। তিরন্দাজরা তাতে আসন গ্রহণ করেছিল। পরিখার সামনে তারা অনেক দূর পর্যন্ত কাঁটা-গুল্ম বিছিয়ে দিয়েছিল। এই কারণে মুসলমানদের পক্ষে সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করাটা অত্যন্ত মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। পারসিকরা যখন ইচ্ছা করত তখনই পরিখা থেকে মাথা উঠিয়ে মুসলমানদের উপর তির নিক্ষেপ করত। এরপর তারা পরিখায় লুকিয়ে পড়ত। ফলে মুসলমানদের পালটা তিরের আক্রমণ থেকে তারা নিরাপদ হয়ে যেত।

কয়েকদিন পর্যন্ত এমন অবস্থা চলতে থাকে। মুসলমানরা তাদেরকে এই নিরাপদ জায়গা থেকে বের করতে পারছিলেন না। পরিশেষে চিন্তাভাবনা

করার জন্য তারা একদিন বৈঠকে বসেন। কয়েকটি বিষয় সামনে আসে। কিন্তু কোনোটাই বাস্তবায়ন করার মতো ছিল না। অবশেষে হজরত তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ বলেন, আজ পর্যন্ত শত্রুরা আমাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করতে দেখেনি। তাই আমার মত হলো, আমাদের অশ্বারোহীরা তাদের উপর একবার আক্রমণ করে পলায়ন শুরু করবে। তারা মনে করবে আমরা আসলেই পলায়ন করছি। এরপর তারা নিশ্চিন্তে আমাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ময়দানে বের হয়ে আসবে। তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালাব।

হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি হজরত কা'কা বিন আমর রা. কে এই জিম্মাদারি প্রদান করেন। তিনি অশ্বারোহীদের নিয়ে যতটা সম্ভব পারসিকদের পরিখার নিকটে চলে যান। এরপর তাদের উপর প্রবলভাবে তির বর্ষণ শুরু করেন।

জবাবে যখনই পারসিকরা তির চালনা শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মাঠ থেকে পলায়ন শুরু করেন। পারসিকরা মনে করে বসে যে, মুসলমানরা পরাজয় বরণ করেছে। তারা এখন প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন শুরু করেছে। এটা ভেবে তারা পরিখা থেকে বের হয়ে যায়। মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে। তাদের এক একজন সৈনিক সাতটি করে বর্ম পরিহিত অবস্থায় পাহাড়ের মতো সামনে অগ্রসর হতে থাকে। মরদানশাহ নিজের সৈন্যদের আগ্রহ ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের পেছনে পুরো ময়দানে কাঁটা-গুল্ম বিছিয়ে দেয়। যাতে করে পারসিকরা শত্রুদের সম্পূর্ণরূপে দমন করে দম নিতে পারে, তাদের যেন গর্তে আশ্রয় নেওয়ার চিন্তা না আসে এজন্য সে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

হজরত কা'কা বিন আমর রা. তাদেরকে বহুদূর পর্যন্ত পেছনে নিয়ে আসেন। পারসিকরা বহুদূর পর্যন্ত মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। যুদ্ধের ময়দানের অপরপ্রান্তে হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. মূল বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। সাথি-সঙ্গীদের বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি জোহর পর্যন্ত পালটা হামলার অনুমতি প্রদান করেননি।

জোহরের নামাজ আদায় করে হজরত নোমান রা. ঘোড়ায় চেপে বসেন। সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করে তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আপনার বান্দাদের আপনি সাহায্য করুন। ইসলামের বিজয় দান করে আমার চোখ শীতল করুন এবং আমাকে শহিদি মৃত্যু দান করুন।

এরপর তিনি সাথি-সঙ্গীদের বলেন, আমি শহিদ হয়ে গেলে হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন রা. তোমাদের আমির হবেন।

এটা বলে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী পরপর তিনটি তাকবির বলে শত্রুদের উপর জোরদার হামলা করেন। পারসিকরা ততক্ষণে পরিখা থেকে বহুদূর চলে এসেছিল। এখন তারা সম্মুখযুদ্ধে বাধ্য হয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ বাঁচা-মরার লড়াই করতে থাকে। লোহার সাথে লোহার সংঘর্ষের আওয়াজ কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। বহু রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্তের স্রোত বয়ে যায়। এমনকি রক্তের স্রোতে ঘোড়ার পা পিছলে যেতে থাকে।

এর মধ্যেই মুসলমানদের সেনাপতি হজরত নোমান রা. এর গায়ে একটি তির এসে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথেই তার ঘোড়া পিছলে যায়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু এই অবস্থায় তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, কোনো মুসলমান যেন যুদ্ধ বন্ধ করে আমার প্রতি মনোনিবেশ না করে। আমি শহিদ হয়ে গেলে তারা যেন দুঃখবোধ না করে।

ওইদিকে তার ভাই হজরত নুয়াইম বিন মুকাররিন রা. তার থেকে পতাকা নিয়ে তৎক্ষণাৎ হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন রা. এর হাতে তুলে দেন। আগের মতোই যুদ্ধ চলতে থাকে। কেউ বুঝতেই পারেনি যে, মুসলমানদের আমিরের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত!

রাতের বেলা পারসিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা পিছু হটা শুরু করে। কিন্তু পরিখায় যাওয়ার রাস্তায় কাঁটাগুল্ম বিছিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে তারা কাঁটার মাধ্যমে আহত হতে থাকে। মুসলমানরা তাদেরকে আক্রমণ করতে থাকেন। এভাবে প্রায় এক লক্ষ পারসিক মৃত্যুবরণ করে।

হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. এর প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। তাকে বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর এবং তার ইহসান। হজরত উমর ফারুককে সংবাদটি জানিয়ে দেবে। এটা বলে তিনি তার প্রকৃত মালিকের নিকট চলে যান।

হজরত কা'কা রা. নিহাওন্দ থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া পারসিকদের হামাদান পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। এমনকি তিনি হামাদান শহর জয়

করে ফিরে আসেন। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২১ হিজরিতে সংঘটিত হয়। নিহাওন্দে পরাজিত হওয়ার পর আলে সাসানের শক্তি চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়।

হজরত উমর ফারুক রা. এ যুদ্ধের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন ছিলেন। দিনরাত সর্বদা তিনি এ যুদ্ধের জন্য দোয়া করতে থাকেন। যখন তাকে বিজয়ের সুসংবাদ এর পাশাপাশি হজরত নোমান বিন মুকাররিন রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি অঝোরধারায় কাঁদতে থাকেন। এরপর তিনি বার্তাবাহককে জিজ্ঞেস করেন আর কে কে শহিদ হয়েছে? বার্তাবাহক কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন, তাদের ছাড়া অনেকেই শহিদ হয়েছেন, যাদের পরিচয় আপনি জানেন না। হজরত উমর রা. পুনরায় অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, আমি উমর যদি তাদেরকে না চিনি তা হলে এতে কী হয়েছে? আল্লাহ তায়ালা তো তাদেরকে চেনেন। তিনি তাদেরকে শাহাদাতের সম্মান প্রদান করেছেন। তাই উমরের তাদের চেনা বা না চেনায় কী আসে যায়?[২৫৭]

একসময়ের মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার ছিল তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ। তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মিথ্যা নবুওয়াত থেকে তাওবা করে ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করাটা প্রমাণ বহন করে যে, তুলাইহার তাওবা সত্য ছিল এবং তা কবুল হয়েছে।[২৫৮]

ইয়াজদাগিরদের লুকোচুরি

নিহাওন্দের যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে হজরত উমর রা. ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলে সাসান এবং তার শাসক ইয়াজদাগিরদকে গোটা পারস্য ও খোরাসান থেকে দখলমুক্ত না করা হবে ততক্ষণ পারসিকদের বিদ্রোহ শেষ হবে না। এজন্য তিনি ২১ হিজরিতে পূর্বদিকে ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি নেন। তিনি কয়েকটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তাদেরকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেন। হজরত

---

[২৫৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৩৯৫-৩৯৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১১৭-১২৪; আল ইবার, ২১।

[২৫৮] তারিখুল ইসলাম, ৩/২২৯, ২৩০

আহনাফ বিন কায়েসকে খোরাসানে, হজরত সারিয়া বিন যুনাইমকে কিরমানে, হজরত আসেম বিন আমরকে সিস্তানে (আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল), হজরত হাকাম বিন আমর তাগলিবিকে মুকরান ও বেলুচিস্তানে পাঠানো হয়। হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. এবং হজরত উতবা বিন ফারকাদ রা. আজারবাইজান অভিমুখে অগ্রসর হন। অল্প সময়েই এ এলাকাগুলো বিজয় হয়ে যায়। এ ছাড়াও হজরত সুয়াইদ বিন মুকাররিন রা. তাবারিস্তান এবং হজরত আলা বিন হাদরামি রা. পারস্য উপকূলবর্তী এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন।

ইয়াজদাগিরদের সঙ্গে সর্বশেষ যুদ্ধ মার্ভের নিকটে মুরগাব নদীর তীরে সংঘটিত হয়। মুসলমানদের আমির ছিলেন হজরত আহনাফ বিন কায়েস রা.। এক্ষেত্রে ইয়াজদাগিরদের সাহায্যের জন্য চীনের সম্রাট নিজেই সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ইয়াজদাগিরদ তখন ময়দানে উপস্থিত ছিল না। চীন সম্রাট ব্যাপক আকারে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ব্যক্তিগত মোকাবেলায় মুসলমানদের বাহাদুরি প্রত্যক্ষ করেই মনোবল হারিয়ে ফেলে। সে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। ইয়াজদাগিরদ তখন মনোবল হারিয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে। সাসানিদের ধনভাণ্ডার নিয়ে সে চীন সম্রাটের আশ্রয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তাই সে খোরাসান থেকে তুর্কিস্তানের দিকে রওনা হয়। কিন্তু তার সভাসদরা রাস্তায় এ ধনভাণ্ডার ছিনিয়ে নেয়। তারা বলে এই ধনভাণ্ডার আমাদের পারসিকদের সম্পদ। আমরা এটা আপনাকে তুর্কিস্তান নিয়ে যেতে দেব না।

ইয়াজদাগিরদ প্রাণ নিয়ে চীনের রাজধানী ফারগানায় পৌঁছে। সেখানে সে এক শরণার্থীর মতো জীবন কাটাতে থাকে। হজরত উমর ফারুক রা. তার পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'জেনে রেখো, অগ্নিপূজকদের বাদশাহি খতম হয়ে গেছে। এখন তারা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাদের ভূখণ্ড, ধনদৌলত ও শহরের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। যদি তোমরা নিজেদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে ফেলো তা হলে আল্লাহ তোমাদের রাজত্ব ছিনিয়ে অন্যকে প্রদান করবেন।[২৫৯]

[২৫৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪০৫-৪১৭

মুকরানে মুসলিমবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয়

হজরত উমর রা. এর খেলাফতকালের শেষ কয়েক বছর পারস্যের সংযুক্ত এলাকা এবং বেলুচিস্তানের কিছু প্রদেশ বিজিত হয়। এরপরই ছিল মুকরান এবং কানদাবিল। মুজাহিদরা গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে এলে হজরত উমর রা. অন্যান্য এলাকার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। সেনাপতি সাহারুল আবদা তখন অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় উত্তর দেন। তিনি বলেন, সেখানকার পানি অত্যন্ত স্বল্প, খেজুর অমিষ্ট আর ডাকাতদের দৌরাত্ম্য অনেক। যদি বেশি সৈন্য পাঠান তা হলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে আর যদি কম সৈন্য পাঠান তা হলে তাদের মেরে ফেলা হবে।

হজরত উমর রা. এটা শুনে সামনে অভিযান পরিচালনা স্থগিত রাখেন।[২৬০]

---

[২৬০] তারিখুত তাবারি, ৪/১৮২, উয়ুনুল আখবার, ২/২১৭, আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৫

আল্লামা বালাজুরি রহ. ফুতুহুল বুলদানে এ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হজরত উসমান রা. এর নির্দেশে সিন্ধু বিজয়ের জন্য হাকিম বিন জাবালার নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানী কাফেলা পাঠানো হয়। ফিরে এসে হাকিম বিন জাবালা উসমান রা. এর সামনে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। অন্যান্য ইতিহাসপ্রণেতার মতে বেলুচিস্তানের ব্যাপারে সাহারুল আবদা এটা বলেছে। বালাজুরি রহ. ঘটনাটিকে আলি বিন মুহাম্মদ (আবুল হাসান মাদায়েনির) মুনকাতি সনদে বর্ণনা করেছেন। খলিফা বিন খাইয়াতও এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে সনদ উল্লেখ নেই। সনদগত সমস্যা ছাড়াও যৌক্তিকভাবেই এটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা হাকিম বিন জাবালা হজরত উসমান রা. এর যুগে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখেননি; বরং উলটো সে সাবায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। সে উসমান রা. এর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে সামনের কাতারে ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ ছাড়াও এটা স্পষ্ট যে, যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে এটা সিন্ধুর ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য হয় না। বলা হয়েছে, সেখানকার খেজুর মিষ্টি নয়। এটা বেলুচিস্তানের খেজুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, সিন্ধুর নয়। পানিস্বল্পতার বিষয়টি সিন্ধুর পরিবর্তে বেলুচিস্তানের ক্ষেত্রেই বেশি প্রয়োগ হয়। কেননা সিন্ধুনদীর কারণে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ এলাকা সবসময় শস্য-শ্যামল থাকে। পক্ষান্তরে বেলুচিস্তানে সমুদ্র ও নদী নেই। তাই সেখানে সজীব-শ্যামল বৃক্ষলতা নেই। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, এ ঘটনা মুকরান ও বেলুচিস্তান সম্পর্কেই হবে। হজরত উমর রা. এর যুগেই এটি

হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে মুসলিমবিশ্ব

২২ হিজরি। হজরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফতের নবম বছর। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই খেলাফতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সেটা পূর্বে পামিরের উঁচু অঞ্চল, পশ্চিমে আফ্রিকার বিশাল মরুভূমি, উত্তরে কাসপিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভারতসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। যার ফলে মোট সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (৩৬ লাখ ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার) অঞ্চলে শরয়ি নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের এ বিজয়দৃশ্য কুরআন মাজিদে প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দান করেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এত বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমন মহান সাম্রাজ্য কায়েম হয়, যাতে আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ধর্ম ছিল বান্দাদের জন্য হেদায়েত, রহমত, শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এই প্রথমবার আল্লাহর বান্দাদের জন্য তার জমিনে পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার সাথে জীবনযাপনের সুযোগ তৈরি হয়। এই সময় তাদের জন্য আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার পুরোপুরি সুযোগ লাভ হয়।

এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে কেউ কখনো না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে না। কেউ দরিদ্রতার কারণে আত্মহত্যা করে না। কারো আইনের অপপ্রয়োগ এবং অবিচারের অভিযোগ করতে হয়নি। কেউ কারো উপর কোনো প্রকার জুলুম করার দুঃসাহস দেখায় না। কোনো নারী চাইলে অলংকারে সজ্জিত হয়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একাই নির্ভয়ে সফর করতে পারে। কেউই তার প্রতি কামুক দৃষ্টি প্রসারিত করবে না। ইনসাফের সামনে আমির-গরিব, সিপাহি-অফিসার, বাদশাহ-গোলাম, মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান।

ঘটেছিল আর অলংকারপূর্ণ এ শব্দগুলো হাকিম বিন জাবালার নয়; বরং তা সাহারুল আবদার।

এ সাম্রাজ্যে কোনো বাদশাহ নেই। নেই কোনো শাহজাদা। তাদের প্রধানব্যক্তি হলেন আমিরুল মুমিনিন। কোনো ধরনের পাহারা ব্যতীতই তিনি সফর করে থাকেন। তার দরজায় কোনো মোসাহেব বা চাটুকার নেই। তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেন তিনি। তিনি শুকনো রুটি খান। তার অন্তরে একদিকে সৃষ্টিজীবের প্রতি কল্যাণকামিতা এবং তাদের সেবা করার প্রবল বাসনা রয়েছে। অন্যদিকে পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতিতে তিনি কম্পিত থাকেন। তিনি আল্লাহকে অত্যন্ত ভয় করেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি বলে ওঠেন, আফসোস, যদি আমি কোনো ঘাসপাতা হতাম! হায়, যদি আমি পরীক্ষার জগতে সৃষ্টি না হতাম![২৬১]

নামাজে তেলাওয়াত করতে গিয়ে তিনি কাঁদতেন। তার কান্নার আওয়াজ কয়েক কাতার পেছন থেকেও শোনা যেত। হাশরের ময়দান, হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর আজাবের কথা শুনে বিভিন্ন সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন।[২৬২]

এটা হলো সেই আমিরুল মুমিনিনের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য, যেখানে পরামর্শের মাধ্যমে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। পরামর্শের এ রীতি কুরআন-হাদিস থেকে গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি আরবের সংস্কৃতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তদুপরি এটি মনুষ্য-স্বভাব ও সামাজিক রীতিনীতির বেশ অনুকূল। পরামর্শের আরব্য গোত্রীয় রীতিনীতিকে হজরত উমর ফারুক রা. একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার রূপ দিয়েছেন, যার মধ্যে হজরত উসমান, হজরত আলি, হজরত তালহা, হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত উবাই বিন কাব, হজরত যায়েদ বিন সাবেত, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সাহাবিগণ শামিল ছিলেন।[২৬৩]

আমিরুল মুমিনিনের কোনো প্রাসাদ বা কোনো দরবার ছিল না। মসজিদে নববিই তার সকল কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি

---

[২৬১] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৩২-৪৩৬; তারিখুল খুলাফা, ১০৩, ১০৪, ১১৪

[২৬২] হায়াতুস সাহাবা, ৩/৪২৩, ৪২৪

[২৬৩] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১০০, ১০১

নিজেই নামাজ পড়াতেন। মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের পর উন্মুক্ত পর্যালোচনা করা হতো এখানেই। সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো দলিলের আলোকে।[২৬৪]

মুসলমানদের কোনো সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য, কোনো বিশেষ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কিংবা তাদেরকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য আমিরুল মুমিনিন বিভিন্ন সময় নিজে মসজিদে নববিতে লোকজনকে সম্বোধন করতেন। স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং হিসাব-নিকাশ চাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ ছিল। যেকেউই জনসম্মুখে শাসকের পোশাক-পরিচ্ছদ, আমদানি খরচসহ অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারত। আমিরুল মুমিনিন তখন তাকে সদুত্তর দিয়ে প্রশান্ত করা আবশ্যক মনে করতেন। প্রজাদের প্রয়োজন জানার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান নিজেই রাতের বেলা অলিগলিতে হেঁটে হেঁটে খোঁজখবর নিতেন। রাস্তায় কোনো বয়স্ক নারীও যদি তাকে তিরস্কার করত; তবু তাকে মন্দ বলা হতো না।[২৬৫]

আরবের রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যবস্থাপনা খুব সাধারণ ছিল। অপরদিকে রোমান ও পারসিকরা বহু পদ ও পদবির স্তর তৈরি করে বিভিন্ন সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করেছিল। হজরত উমর ফারুক রা. রাজত্ব বিস্তৃত করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রতি পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। তিনি উন্নত ব্যবস্থাপনার উত্তম আদর্শ পেশ করেছিলেন।

তিনি মুসলিমবিশ্বকে আটটি প্রদেশে ভাগ করেন : মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, শাম, আলজাজিরা, ফিলিস্তিন এবং মিসর। এরপর তিনি প্রতিটি প্রদেশকে বিভিন্ন জেলায় ভাগ করে দিয়েছিলেন। সব জায়গায় তিনি ভালোভাবে যাচাই করে উত্তম ব্যক্তিদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করেছিলেন। তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। এই কারণে তারা জীবিকার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভার হয়ে দীন ও উম্মাহর খেদমতে দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকতেন। মক্কায় হজরত খালিদ বিন আস, কুফায় হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, বসরায় হজরত আবু মুসা আশআরি, শামে হজরত মুয়াবিয়া, আলজাজিরায় হজরত ইয়াজ বিন গনাম, ইয়েমেনে হজরত

---

[২৬৪] তারিখুত তাবারি, ৪/২০১, ২০২

[২৬৫] তারিখুত তাবারি, ৪/২০৩-২০৪; তারিখুল খুলাফা, ১০৩

ইয়ালা বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

হিসাব-নিকাশ এবং নগর-শৃঙ্খলা বিভাগ, যাকে আজকাল পুলিশ বিভাগ বলা হয়, এটা ওই জমানায় আহদাস নামে পরিচিত ছিল। হজরত আবু হুরাইরা রা. এর মতো বিদগ্ধ সাহাবি এ বিভাগের প্রধান ছিলেন।[২৬৬]

গভর্নর অফিসার ও দায়িত্বশীলদের উপর হজরত উমর ফারুক রা. এর কড়া দৃষ্টি থাকতো। কোনো দায়িত্বে ত্রুটি থাকলে তিনি দরবারে খেলাফতের পক্ষ থেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।[২৬৭]

হজরত উমর ফারুকই সর্বপ্রথম বাইতুল-মালের নীতি নির্ধারণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলিমরাষ্ট্রের আমদানি এবং সকল স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম তৈরি করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থসম্পদ মুসলমানদের প্রয়োজনে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য তিনি নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশের বাইতুল-মালের সকল অর্থসম্পদ এবং দ্রব্য ও জিনিসপত্র যেন সংরক্ষিত থাকে এজন্য তিনি প্রশস্ত এবং মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।

হজরত উমর রা. জনকল্যাণ খাতের ভিত্তি স্থাপন করেন, যার অধীনে মুসলিমবিশ্বের প্রতিটি প্রদেশ এবং জেলাশহরে সরকারি ভবন নির্মাণ, নদী-নালা খনন, সড়ক এবং পুল তৈরি, হসপিটাল নির্মাণের ধারা জারি থাকে। মদিনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতিটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নিরাপত্তা-চৌকি নির্মাণ করেন। সরাইখানা ও পানির হাউজের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরকারি হিসাব-নিকাশের দফতর—বাইতুল-মাল এবং সরকারি অতিথিশালা হিসাবে বিভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।[২৬৮]

---

[২৬৬] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪১ উসদুল গাবাহ, আবু হুরায়রার জীবনী দ্রষ্টব্য।

[২৬৭] তারিখুত তাবারি, ৪/২০৩-২০৮; তারিখুল খুলাফা, ১০৩

[২৬৮] তারিখুত তাবারি, ৩/৫৯; আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ২৫০, ২৫২; শিবলি নোমানি কৃত আল-ফারুক, ২২৮-২৩০

যদিও তখন অপরাধীর সংখ্যা অনেক কম ছিল; কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ করে অপরাধীদের সাজা দেওয়ার জন্য তিনি কয়েদখানা নির্মাণ করেন।[২৬৯]

ইরাকের কুফা, বসরা, মুসেল; মিসরের ফুসতাত, জিযা প্রভৃতি নতুন শহরের উন্নতি-অগ্রগতি সাধন করা হতে থাকে।[২৭০]

গোটা রাজ্যের আদমশুমারি করা হয়। সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানকে দুই ভাগ করা হয়। এক অংশকে রীতিমতো সেনাবাহিনীভুক্ত করে তাদের ভাতা নির্ধারণ করা হয়। অপর অংশকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকার সুযোগ প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও এরা যেকোনো সময় চাইলেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে পারত। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের যেকোনো সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তলব করা হতো। তারাও বার্ষিক ভাতা পেতো।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তি কিংবা প্রয়োজনগ্রস্ত এমনকি নারীদের জন্য সরকারি ভাতা নির্ধারিত ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য কমপক্ষে একশত দিরহাম (বর্তমান হিসেবে যা প্রায় দুইশো ডলার বা বিশ হাজার রুপি) নির্ধারিত ছিল। সম্মানীভাতাও চালু করা হয়েছিল। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্মান নির্ধারণ করে ভাতা প্রদান করা হতো।[২৭১]

মদিনা, কুফা, বসরা, ফুসতাত, দামেশক, হিমসে বড় বড় সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়, যা মুজাহিদদের বসবাসের স্থান ছিল।[২৭২]

উন্নতমানের ঘোড়া প্রতিপালনের জন্য আস্তাবল তৈরি করা হয়। মাঠে-ময়দানে পশু চড়ানোর স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি আস্তাবলে সবসময় চার হাজার ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হতো।[২৭৩]

---

[২৬৯] ফাতহুল বারি, ৫/৭৬

[২৭০] তারিখুত তাবারি, ৩/৫৯০; আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ, ২৪৮-২৫০; মুজামুল বুলদান, বসরা কুফা মুসেল, জিজা, ফুসতাত

[২৭১] ডক্টর আকরাম জিয়া উমারি কৃত আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ২৩৪

[২৭২] আল্লামা শিবলি নোমানি কৃত আল-ফারুক, ২৪২; এ ছাড়াও মুজামুল বুলদানে উল্লিখিত শহরগুলোর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[২৭৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৩২০৫২

নিজেদের ও অন্যদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়। হজরত উমর ফারুক রা. মদিনায় অবস্থান করে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল দূরত্বের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত হতে পারতেন। প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য এবং তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন।[২৭৪]

যেহেতু তখন গোটা মুসলিমবিশ্বের ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত কার্যক্রম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এজন্য মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করা হয়। শহরে শহরে নতুন নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জিকির-তেলাওয়াতের পাশাপাশি ধর্ম প্রচার-প্রসারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা হতো। নামাজের সময় মসজিদে তিলধারণের জায়গা হতো না। কেউ জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় থেকে পিছিয়ে থাকত না। যদি দুয়েক ব্যক্তি এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতো তা হলে লোকেরা তার ব্যাপারে মুনাফিক হওয়ার সন্দেহ করত।[২৭৫]

সে সমাজে সাহাবিগণই ছিলেন সকলের অনুসৃত ব্যক্তি। তারাই মানুষের ইলম-আমলের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। তাদের মজলিসগুলোতে কুরআন-সুন্নাহ, হেকমত, মারেফাত পরকালের ভীতির মতো মূল্যবান সম্পদ বণ্টন করা হতো। শামে হজরত আবু দারদা, হজরত উবাদা বিন সামেত, হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম, বসরায় হজরত মা'কিল বিন ইয়াসার, হজরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, কুফায় হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এবং তার সাথে ৭০জন বদরি সাহাবি কুরআন, হাদিস এবং ফিকহের আলো বিলাতেন। তাদের দরসের একটি মজলিসেই হাজার হাজার ছাত্র অংশগ্রহণ করত।[২৭৬]

---

[২৭৪] ফুতুহুশ শাম, ১৫৪

[২৭৫] সহিহ মুসলিম, ১৫১৯

[২৭৬] প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সাহাবিদের সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন সা'দ রহ. তাবাকাতে ইবনে সাদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাবাকাতুল কুবরা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ডে মদিনা, মক্কা, তায়েফ, ইয়ামান, বাহরাইন, কুফা প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষার জন্য নিয়োজিত

হজরত আবু দারদা রা. এর মজলিসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ষোলোশতাধিক ছিল।[২৭৭]

শুধু মুসলিমই নয়; বরং অমুসলিমদেরও অধিকার সংরক্ষণ করা হতো। তাদের জানমাল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হতো না। তাদের জানমালকে মুসলমানদের জানমালের মতো সমান নিরাপদ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

হজরত উমর রা. প্রজাদের খোঁজখবর নিতে গিয়ে মুসলিম-অমুসলিমে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। এক দরিদ্র বৃদ্ধকে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জানতে পারলেন যে, সে ইহুদি। তার সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে জিজিয়া, দরিদ্রতা এবং বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করে। হজরত উমর রা. তাকে সাথে নিয়ে যান। তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। এরপর তিনি বাইতুল-মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এর দায়িত্বশীলকে বলেন, এই ধরনের লোকদের তালাশ করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেবে।

এরপর তিনি ওই সময় বৃদ্ধ অমুসলিমদের জিজিয়া মওকুফ করার ফয়সালা করেন। তিনি বলেন, এটা ইনসাফের কথা নয় যে, আমরা যৌবনে তাদের থেকে জিজিয়া আদায় করব আর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীতই ছেড়ে দেব।[২৭৮]

অমুসলিমদের উপর কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তিনি ইনসাফের ব্যবস্থা করতেন। মিসরের এক কিবতি হজরত উমর রা. কে চিঠির মাধ্যমে জানায় যে, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর ছেলে তাকে প্রহার করেছে। হজরত উমর রা. বাদি-বিবাদি উভয়কে ডেকে পাঠান। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি নিজের সামনেই ওই অভিযোগকারীকে তার থেকে বদলা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।[২৭৯]

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সবিস্তারে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য)

[২৭৭] গায়াতুন নিহায়াহ ফি তাবাকাতিল কুবরা, ১/৬০৬

[২৭৮] কাজি আবু ইউসুফ কৃত আল খারাজ, ১৩৯

[২৭৯] সুয়ুতি কৃত জামিউল আহাদিস, ২৫/৪৭১

সাহাবিগণ অমুসলিমদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য যেতেন।[২৮০]

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বকরি জবাই করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সেই গোশত প্রতিবেশীদের পাঠাতেন। কেউ আপত্তি জানালে তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখার প্রতি এতটাই গুরুত্বারোপ করেছিলেন যে, আমাদের মনে হচ্ছিল উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের বুঝি অংশ প্রদান করা হবে।[২৮১]

মোটকথা, তখন চতুর্দিকেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। মানুষ যেন জান্নাতের মধ্যে জীবনযাপন করছিল। তাদের না কোনো বহির্বিশ্ব থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল আর না ভেতরগত কোনো ফেতনা-ফাসাদের ভয় ছিল। কিন্তু তবু হজরত উমর ফারুক রা. সবসময় এ ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন যে, কোথাও হয়তো কারো অধিকার খর্ব করা হচ্ছে! কিংবা কোনো মজলুম হয়তো ফরিয়াদ নিয়ে আমার নিকট পৌঁছাতে পারছে না![২৮২]

---

[২৮০] আদ দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া, ২/২৩৯
বর্তমান যুগে জিম্মিদের সাথে আচরণের ব্যাপারে জানার জন্য গালিদ দাহাবির প্রবন্ধ, معاملة غير المسلمين في المجتمع الاسلامي পৃষ্ঠা ১১০-১১৪
তা ছাড়া ইসলামি শরিয়তে জিম্মিদের অধিকারের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সালেহ বিন গানেম সাদলানের
وجوب تطبيق الشريعةالإسلامية في كل عصر পৃষ্ঠা ২৩০-২৫০

[২৮১] আল আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ৫৮

[২৮২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৩৩

শাহাদাতের ঘটনা

২৩ হিজরি শেষ হচ্ছিল। মুসলিমবিশ্বের যেকেউ যেন অনায়াসে নিজ-নিজ অভিযোগ নিয়ে আসতে পারে এজন্য হজরত উমর রা. গোটা মুসলিমবিশ্ব সফর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এ সময় প্রতিটি প্রদেশে দুই মাস করে অবস্থানের খেয়াল করেন।[২৮৩]

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তা হলে আমি ইরাকের মিসকিনদের জন্য এমন ব্যবস্থা করবো যে, আমার পর তাদের আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন থাকবে না।[২৮৪]

এটা সে সময়ের কথা যখন ইসলামের তরবারি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল জায়গা থেকেই ট্যাক্স উসুল করছিল। দীনের বিজয় অর্জিত হচ্ছিল। সুস্পষ্ট দীন চতুর্দিকে আমানত, দিয়ানত, আদল, ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছিল। অনিষ্টের অন্ধকার মুখ লুকিয়ে জনসম্মুখ থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। উমর ফারুক রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের এ বিজয় দেখে দারুণ আনন্দিত ছিলেন। তবু তার দুটি ইচ্ছা রয়ে গিয়েছিল। একটি হলো আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়া। দ্বিতীয়টি নিজের পরম প্রিয় বন্ধু হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমতলে শেষশয্যায় ঠাঁই পাওয়া।

খলিফার দোয়া

২৩ হিজরিতে উমর ফারুক রা. হজের জন্য মক্কায় আসেন। ফেরার সময় তিনি আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার শক্তি এখন দুর্বলতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রজারা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

---

[২৮৩] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৩৪

[২৮৪] সহিহ বুখারি, ৩৭০০

রয়েছে। আমার আশংকা হয়, আপনি আমাকে বলবেন, তাদের অধিকার আদায়ে যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

এরপর তিনি আল্লাহর নিকট একসঙ্গে তার দুটি আকাঙ্ক্ষার কথা পেশ করেন। তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

> হে আল্লাহ, আমাকে আপনার রাস্তায় শাহাদাত নসিব করুন এবং আপনার রাসুলের শহরে মৃত্যু দান করুন।[২৮৫]

বাহ্যিকভাবে এ দুটি বিষয় একসঙ্গে হওয়া মুশকিল। শাহাদাত আবার সেটাও মদিনাতে! এটা আবার কীভাবে সম্ভব? কারণ, মদিনায় তখন বাইরের আক্রমণের কোনো আশঙ্কা ছিল না। আর সেখানে তো যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কারণে হজরত উমর রা. এর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করাটাও মুশকিল বিষয় ছিল। যদি তিনি মদিনা থেকে বের হয়ে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেন এবং শহিদ হয়ে যান তখন মদিনায় মৃত্যু বা দাফন কোনো কিছুই হতো না। কেননা মৃত ব্যক্তির দাফনের জন্য অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী অনুচিত কাজ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হজরত উমর ফারুক রা. এর জন্য উভয় সৌভাগ্যের ফয়সালা করে দিয়েছিলেন। তিনি তার দোয়া কবুল করে নেন। তাই পরবর্তীতে সংঘটিত শাহাদাতের ঘটনা হজরত উমরের জন্য সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু পাশাপাশি এটা ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট এক দুর্ঘটনা, যার প্রভাব অর্ধশত বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এমনকি আজও তার পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

গোপন ষড়যন্ত্র

ফারুকি-যুগের শেষবছরগুলোতে মুসলমানদের বিজয়ের ধারা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। পারস্য সম্রাটের বাদশাহি তখন বিস্মৃত উপাখ্যান হয়ে পড়েছিল। রোমান সম্রাট এশিয়ার সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পারস্যের অগ্নিপূজকদের অগ্নিকুণ্ড তখন শীতল হয়ে পড়েছিল। ইহুদিদেরকে আরবভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়েছিল। শাম ও মিসর থেকে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের প্রভাব মুছে

---

[২৮৫] সহিহ বুখারি, ১৮৯০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১৭০

যাচ্ছিল। এসব এলাকায় কাউকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়নি। অধিকাংশ মানুষ—ইতিপূর্বে যারা বাইজেন্টাইন ও সাসানিদের হাতে জুলুমের শিকার হয়েছিল—মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, ইসলামি শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আগ্রহে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। বহুলোক পূর্বের ধর্ম পালন করা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি আস্থাশীল ছিল।

কিন্তু নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মের উপর একটা শ্রেণি তখনও রয়ে গিয়েছিল, যাদের হিংসা-বিদ্বেষের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা ইসলামের প্রতি শুধু এই কারণেই ঘৃণা পোষণ করত যে, এই ধর্ম তাদের পিতৃপুরুষের রাজত্ব ধ্বংস করে ফেলেছে। তাদের প্রবৃত্তিপূজার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলামি খেলাফতের বিজয় এবং উত্থানকে তারা দু'চোখে দেখতে পারত না।

কিছু কিছু লোক মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মুখে কালিমা পড়ে নিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে তারা মুমিনদের মতো জীবনযাপন করছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। যেহেতু কালিমা পাঠকারী সকলেই মুসলমান বলে গণ্য হতো এই কারণে কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চিতভাবেই এটা বলতে পারেন না যে, কারা এই ধরনের গাদ্দার ছিল? কারা ইসলামের পোশাক পরে মুসলমানদের শেকড় কাটায় ব্যস্ত ছিল? কিন্তু ইতিহাসে এক্ষেত্রে দুয়েকজন কাফেরের আলোচনা তো অবশ্যই পাওয়া যায়, এই ব্যাপারে যাদের কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল।

হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ... কেন... কীভাবে...?

তেমনই একজন হলো হুরমুজান, যে ছিল পারস্য সম্রাট ইয়াজদাগিরদের নিকটাত্মীয়। সে মদিনায় জীবনযাপন করছিল। এই লোক খাঁটি মনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা আজ চৌদ্দশত বছর পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অসম্ভব। কেননা অন্তরের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কিন্তু বাহ্যিক প্রমাণাদির প্রতি লক্ষ করলে তার ইসলামগ্রহণের বিষয়টি অবশ্যই সন্দেহযুক্ত; বরং এটাও সম্ভব যে, এ ধরনের লোকের ইয়াজদাগিরদের সঙ্গে তখনও যোগসাজশ ছিল। ইয়াজদাগিরদ তখনো বেঁচে ছিল। হাতছাড়া হওয়া রাজত্ব পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারে

নিরাশ হয়ে তার প্রতিশোধমূলক আক্রমণ চালানো অসম্ভব কিছু নয়। পৌত্তলিক শাসকরা মুসলিমবিশ্বে বসবাসকারী অনুসারীদের ব্যবহার করে এই মহান খলিফাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পায়তারা করাটা আসলে অসম্ভব কিছু নয়।

হজরত উমর ফারুক রা. হজ থেকে ফিরে এসে রীতিমতো সরকারি জিম্মাদারি পালনে ব্যস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, মদিনায় অগ্নিপূজক গোলাম ফিরোজ আবু লুলু বসবাস করত। সে দুই বছর পূর্বে ২১ হিজরিতে পারস্যের সর্বশেষ সীমান্তে সংঘটিত ঐতিহাসিক নিহাওন্দের যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল। সে গোলাম হিসাবে হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. এর ভাগে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে সে একজন চিত্রকর, কাঠমিস্ত্রি এবং কামার ছিল। বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

হজরত উমর ফারুক রা. রাজধানী মদিনাতে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অমুসলিমকে থাকার অনুমতি দিতেন না। কিন্তু তার শৈল্পিক গুণের মাধ্যমে মদিনাবাসীর উপকৃত হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে হজরত মুগিরা রা. উমর ফারুক রা. এর নিকট সুপারিশ করলে তিনি ফিরোজকে মদিনায় থাকার অনুমতি প্রদান করেন।

তখনকার নিয়ম ছিল, এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন গোলামদের দ্বারা ব্যক্তিগত সেবা নেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে নিজ নিজ কাজ ও পেশা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা। কাজের মাধ্যমে সে যে পারিশ্রমিক লাভ করবে তার একটি অংশ মনিবকে দেবে, যাকে খারাজ (কর) বলা হতো।

হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. ফিরোজের লাভ থেকে প্রতিদিন দুই দিরহাম (প্রায় দুইশ' রুপি) অর্জন করতেন। কেননা তার কারবার অনেক বেশি পরিমাণ চলতো। ফিরোজের জন্য এ পরিমাণ টাকা কর হিসেবে প্রদান করাটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। এজন্য সে একদিন হজরত উমর ফারুক রা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে যে, মনিব আমার থেকে অধিক পরিমাণে কর উসুল করে থাকেন!

হজরত উমর রা. জিজ্ঞেস করেন, কত উসুল করেন?

সে উত্তর দেয়, প্রতিদিন দু দিরহাম।

হজরত উমর রা. বলেন, তুমি কোন কোন কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকো?

সে বলল, কাঠ ও লোহার আসবাব নির্মাণ এবং চিত্রকর্মের মাধ্যমে।

এটা শুনে তিনি বলেন, আয়ের হিসেবে তো উসুল কৃত টাকার পরিমাণ বেশি না।

ফিরোজ তখন এই বলে চলে যায় যে, তার ইনসাফের পাল্লা আমি ছাড়া সবার জন্যই অবারিত।

তা সত্ত্বেও হজরত উমর রা. একজন বিচারপ্রার্থীকে নিরাশ করতে চাননি। এজন্য তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন হজরত মুগিরা রা. এর নিকট তার কর কমিয়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করবেন। দু-চার দিন পর ফিরোজকে কোথাও যেতে দেখে তার মনস্তুষ্টির জন্য উমর রা. বলেন, শুনলাম তুমি নাকি ভালো ধরনের চাক্কি বানাতে পারো, আমাকে কি বানিয়ে দেবে?

সে তখন আশ্চর্য ভঙ্গিতে বলে, আমি এমন চাক্কি বানাবো পূর্ব এবং পশ্চিমে বসবাসকারী সকলেই তা দেখতে থাকবে।

উমর রা. অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তার বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রতিশোধের সুপ্ত ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন। সাথি-সঙ্গীদের তিনি বলেন, শোনো, এই গোলাম আমাকে হুমকি দিয়ে গেল! তা সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেননি।[২৮৬]

তিনি আইনকানুনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানতেন অপরাধ প্রমাণ হওয়া ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত ফিরোজের কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। শাসকের জন্য নিছক সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না।

হজরত উমরের হত্যাকাণ্ড : ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নাকি ষড়যন্ত্র?

সাধারণত ঐতিহাসিকগণ ঘটনাকে এভাবে উল্লেখ করে থাকেন যে, হজরত উমর রা. তার ফরিয়াদে সাড়া না দেওয়ায় সে উমর রা. এর প্রতি রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তাই সে উত্তেজিত হয়ে খলিফাকে হত্যা করে। কেউ এ ঘটনার আড়ালের রহস্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার

---

[২৮৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৩৪৭

প্রয়োজন অনুভব করেননি। যদি কেউ সেদিকে নজর দিয়েও থাকে তবু এর বস্তুনিষ্ঠ ও সারগর্ভ গবেষণা হয়নি। অথচ এর সমস্ত দিক ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। বিশেষত এ বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া উচিত যে, এক ব্যক্তি সামান্য কিছু দিরহামের জন্য কীভাবে এত বড় পদক্ষেপ নিতে পারে! যদিও এমনটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু ইতিহাস, সভ্যতা-দর্শন, মানবিক প্রবৃত্তি বিশেষত মানবিক আচরণ এবং মস্তিষ্কের পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি এতোটুকুতে কখনো আশ্বস্ত হতে পারে না।

একজন সাধারণ মানুষের এ ধরনের সামান্য বিষয়ে নিজের মতোই কোনো সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে পারাটা সম্ভবপর বিষয়। কিন্তু এ কারণে তার চেয়েও উঁচু স্তরের কাউকে হত্যা করা আপাতদৃষ্টিতে এক অসম্ভব বিষয়; বরং মৃত্যুঘাটে পৌঁছে গেলে কিংবা অসহনীয় পর্যায়ের জুলুম-নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে গেলেই কেবল মানুষ এমন পদক্ষেপ নিতে পারে। হত্যার পরিণাম সম্পর্কে কমবেশ সকলেই জানে। এর ফলে কী কী বিপদ আসতে পারে, ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে—এসব হিসাবনিকাশ করেই মানুষ এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। আলোচ্য ব্যক্তি কোনো অফিসার ছিল না। ছিল এক সামান্য গোলাম। এটা এক গোলাম এবং সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইলের শাসকের মধ্যকার মনোমালিন্যের ঘটনা ছিল। যদি আমরা এ হত্যাকাণ্ডকে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলি, তা হলে এই সামান্য কারণে এমন বিশাল শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির উপর ক্ষোভের ঝাল মেটানোটা কি আদৌ সম্ভব?!

মানবপ্রবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে। সাধারণত মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদের কারণে কথা কাটাকাটি ও গালিগালাজের ঘটনা ঘটে। বেশির থেকে বেশি তা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াতে পারে। উত্তেজনার চরম পর্যায়ে একজনের হাতে অপরজন খুন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি একপর্যায়ে গিয়ে ঝগড়া থেমে যায় তা হলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই তা হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়ায় না।

চিন্তাভাবনা করার মতো সময় না পাওয়া গেলেই উত্তেজনাবশত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি মাঝখানে চিন্তাভাবনার

মতো সময় পাওয়া যায় তা হলে মানুষ নিজের বোকামির কথা বুঝতে পারে। চূড়ান্ত ও আত্মঘাতী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সে বিরত থাকে।

উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে এখন চলুন আমরা আলোচ্য ঘটনাটি পর্যালোচনা করি। এই ঘটনার আসামি ফিরোজ হজরত উমর রা. এর সাথে কথা বলা এবং হত্যাকাণ্ড ঘটাবার মাঝখানে পূর্ণ তিন দিন সময় পেয়েছিল।[২৮৭] এই দীর্ঘ সময় চিন্তাভাবনা করার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট ছিল। কেউ সাধারণ কারণে ভেতরে ভেতরে এত দীর্ঘ সময় উত্তেজনা রাখতে পারে না। সে পাগল হলে ভিন্ন কথা। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি ফিরোজের পাগলামির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং শৈল্পিক দক্ষতাই তার বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

হজরত উমর রা. ও ফিরোজের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল, আমাদেরকে বিশেষভাবে সেদিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে। আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন, ধমকি প্রদান প্রভৃতি কোনোকিছুই সংঘটিত হয়নি। এই আলোচনায় এমন কোনো কথাও বলা হয়নি, ফিরোজ যার কারণে উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে।

সে একজন পেশাজীবী মানুষ ছিল। গোলামদের থেকে গৃহীত করের পরিমাণ সম্পর্কে সে ভালোভাবেই জানত। যদি হজরত মুগিরা বিন শুবা রা. অস্বাভাবিক কর আরোপ করতেন তা হলে হজরত উমর রা. অবশ্যই বিস্মিত হতেন। কেননা তিনিও বাজারের লেনদেন সম্পর্কে জানেন। কিন্তু তার কর স্বাভাবিক ছিল। এজন্যই তিনি বলেছেন, তোমার কাজের হিসাবে এই কর অতিরিক্ত নয়। এটা বাস্তবতার সম্পূর্ণ অনুকূল।

হতে পারে ফিরোজ হজরত উমর রা. এর ব্যাপারে ধারণা করে এসেছিল যে, তিনি বাজার এবং শিল্প সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না; তাই তিনি মিথ্যা অভিযোগকে সঠিক মনে করে তার পক্ষে রায় দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার লজ্জা বেশির চেয়ে বেশি তাকে হতাশ করতে পারে। কিন্তু কখনোই এটা তাকে একজন খলিফার প্রাণসংহারের দিকে ঠেলে দিতে পারে না।

[২৮৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৮

নিছক ফরিয়াদ না শোনার কারণে ফিরোজের হজরত উমর রা. কে হত্যা করে ফেলাটা যেন এরকম হয়ে দাঁড়ালো যে, কোনো শ্রমিক তার মালিকের পক্ষ থেকে সঠিক পারিশ্রমিক পেয়ে আসছিল। কিন্তু একবার সে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক চাইল আর না দেওয়ায় তাকে হত্যা করে ফেলল! কিংবা কোনো শ্রমিক কারখানার মালিকের পক্ষ থেকে সঠিক সময়ে বেতন পেয়ে আসছিল; কিন্তু একবার সময়ের পূর্বেই সে বেতন দাবি করল, মালিক তার দাবি পূরণ না করায় সে তাকে হত্যা করে ফেলল!

এ বিষয়-দুটি যেমন অস্বাভাবিক, সাধারণত যা ঘটে না; তেমনিভাবে উপরের বিষয়টিও ঘটেনি।

মোটকথা পুরো বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করলে এই আশংকাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ফিরোজ পূর্ব থেকেই হজরত উমর রা. কে শহিদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে কেন এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো শক্তিশালী কারণ বিদ্যমান ছিল, যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনেক বেশি, ফিরোজ যার সামনে প্রাণ চলে যাওয়ার নিশ্চিত বিপদকেও মাথা পেতে মেনে নিয়েছিল। তাই সে সর্বসম্মুখেই আমিরুল মুমিনিনের উপর হামলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

মানবপ্রবৃত্তি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিমাত্র জানেন যে, সাধারণত ধর্ম ও গোত্রই মানুষকে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজের দিকে ঠেলে দিয়ে থাকে। শাসকদের উপর আক্রমণ করার কয়েক ডজন ঘটনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে। দেখা যাবে প্রায় সবকটির পেছনে কোনো জাতিগত, ভূখণ্ডগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষ কার্যকর ছিল। ব্যক্তিগত দুশমনির ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা এত প্রবল হয় না। বরং সাধারণত লুকিয়ে লুকিয়ে এ ধরনের হামলা করা হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রেও মানুষ আত্মগোপনের মতো নিরাপদ ব্যবস্থা করে রাখে। কিন্তু ফিরোজের হামলাটা এক ধরনের আত্মাহুতির শামিল।

এর দ্বারা বোঝা যায় সে নিজের গোত্র, ভূখণ্ড ও ধর্মীয় কারণে উত্তেজিত হয়েই এমনটা করে থাকতে পারে। তার মধ্যে জাতিগত প্রতিশোধ-স্পৃহার উপাদান বিদ্যমান থাকার বিষয়টি এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, সে মদিনায় নিয়ে আসা অল্পবয়সি অগ্নিপূজক বন্দিদের মাথায় হাত

বুলাতো আর কেঁদে কেঁদে বলতো, আরবরা আমার কলিজা টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।[২৮৮]

আমাদেরকে ফিরোজের ধমকিমূলক বাক্যটি স্মরণ রাখতে হবে। সে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে বলেছিল, আমি এমন চাক্কি বানাবো, পূর্ব থেকে পশ্চিম সকলেই তা দেখতে থাকবে। এমন গভীর অর্থবহ বাক্য সেই ব্যক্তিই বলতে পারে, যে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছে। এজন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। কোনো কারণে হঠাৎ রাগান্বিত হয়ে-যাওয়া-ব্যক্তি এমন গভীর অর্থবহ বাক্য উচ্চারণ করে না। বরং এমন ব্যক্তি তো সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, তোমাকে ছাড়বো না আমি, প্রাণে মেরে ফেলব।

আরেকটি প্রশ্ন দাঁড়ায়। ফিরোজ এই হত্যাকাণ্ড তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে ঘটিয়েছে নাকি এর পেছনে কোনো শক্তি সক্রিয় ছিল?

উভয়ই হতে পারে। তবে এর পেছনে কোনো বহিঃশক্তির যোগসাজশ থাকার আশংকা বেশি। এর দুটি কারণ রয়েছে।

এক. ফিরোজের মতো একজন গোলাম প্রায় দুই বছর যাবৎ ইসলামি সমাজে নির্বিঘ্নে বসবাস করে আসছিল। এর মধ্যেই তার অন্যান্য অমুসলিমের মতো ইসলামি খেলাফত এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু সে শুধু ব্যক্তিগতভাবেই এ সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করেনি; বরং সে একজন গাদ্দারে পরিণত হয়েছে। সাধারণত বহিঃশক্তির ক্রীড়নক বা তার গোয়েন্দাদের পক্ষেই এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া সম্ভব। এজন্য এ আশংকাও রয়েছে যে, শুরু থেকেই ফিরোজ কোনো বহিঃশক্তির এজেন্ট ছিল।

এখন জানার বিষয় হলো সেই শক্তিটি কে বা কারা?

মদিনায় বসবাসকারী পারসিক শাহজাদা হুরমুজানের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। ইতিপূর্বে ফিরোজের অগ্নিপূজক থাকাটা এ আশংকাকে আরো ঘনীভূত করে তোলে যে, সে হয়তো পরাজিত অগ্নিপূজারি পারসিক রাজবংশের ক্রীড়নক ছিল। তাদের পক্ষ থেকেই হয়তো তাকে এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

---

[২৮৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৩৪৭

এই আশংকা পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পর এটাও যৌক্তিক যে, ফিরোজ প্রকৃতপক্ষে কোনো অভিযোগ শোনানোর জন্য হজরত উমর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। হজরত উমর রা. এর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা যাচাই করাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসের মাধ্যমে হজরত উমর রা. এর সঙ্গে তার দু'বার সাক্ষাতের কথা জানা যায়। বলাবাহুল্য, কোনো অমুসলিম বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আমিরুল মুমিনিনের নিকট আসা-যাওয়া করলে সে সন্দেহের পাত্র হয়ে যেতে পারে। যেহেতু নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিম-অমুসলিম সকলেই আমিরুল মুমিনিনের নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে এজন্য ফিরোজ করের পরিমাণ বৃদ্ধির বাহানা নিয়ে হজরত উমর রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এর মাধ্যমে সে উমর রা. এর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ও ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতে চাচ্ছিল।

এ বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে যে, এই হত্যাকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য ফিরোজ এক বিশেষ ধরনের খঞ্জর কোথাও থেকে পেয়েছিল কিংবা সে নিজেই তা প্রস্তুত করেছিল। মদিনা ও আরবসমাজে এ ধরনের কোনো খঞ্জরের প্রচলন ছিল না। এর সামন-পেছন উভয় দিকই ধারালো ছিল। হাতলি ছিল মাঝখানে। আক্রমণ যাতে ব্যর্থ না হয় এজন্য সে খঞ্জরে বিষ মিশিয়ে নিয়েছিল।[২৮৯]

এসব ব্যবস্থাপনা তার অস্বাভাবিক পরিকল্পনার প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করে।

আক্রমণ

২৭ জিলহজ বুধবার আমিরুল মুমিনিন রীতিমতো ফজরের নামাজ পড়ানোর জন্য মেহরাবে উপস্থিত হন। যখনই তিনি তাকবিরে তাহরিমা বলেন তখন লুকিয়ে-থাকা ফিরোজ বেরিয়ে আসে। সে হজরত উমর ফারুক রা. এর পিঠে খঞ্জর দ্বারা পরপর ছয়টি আঘাত করে। অসম সাহসী এবং হিম্মতের অধিকারী হজরত উমর ফারুক রা. কোনো ধরনের চিৎকার বা আর্তনাদ করেননি। আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে যান।

আক্রমণটি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে করা হয়েছিল। পেছনের কাতারের কেউই টের পাননি আসলে কী ঘটে চলেছে?! যখন তারা হজরত উমর

---

[২৮৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৯; তারিখুল খুলাফা, ১০৮

ফারুক রা. এর কেরাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন না তখন পেছনের কাতারের লোকেরা কিছুক্ষণ পর সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে লোকমা দিতে থাকেন। এর মধ্যেই হত্যাকারী ফিরোজ পলায়ন করতে থাকে। কেউ কেউ বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেদিন বুঝা যায় যে, খঞ্জর চালনায় ফিরোজ অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি। এগিয়ে আসা তেরো ব্যক্তিকে সে মুহূর্তেই রক্তাক্ত করে ফেলে। যাদের মধ্যে নয়জন আঘাত সহ্য করতে না পেরে শহিদ হয়ে যান। অবশেষে একজন চাদর নিক্ষেপ করে তাকে আটকে ফেলেন। গ্রেফতারি থেকে বাঁচার জন্য সে তৎক্ষণাৎ নিজ গলায় খঞ্জর চালিয়ে আত্মহত্যা করে বসে।

খঞ্জর চালনায় ফিরোজের অসাধারণ দক্ষতা সেই বহিঃবিশ্বের এজেন্ট হওয়ার আশংকাকে পাকাপোক্ত করে দেয়। কেননা কেবল ওই ব্যক্তিই এমন কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে, যাকে কোনো বাদশাহ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

তার আত্মহত্যা করে বসাটা পর্দার পেছনের শক্তি সম্পর্কে জানার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এতটুকু তো অবশ্যই বোঝা যায় যে, কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন বিশাল কাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদ হলে এই ষড়যন্ত্রের হোতাদের পরিচয় বেরিয়ে আসতে পারত এজন্য ফিরোজকে সেই মুহূর্তে নিজ মনিবকে বাঁচানোর জন্য কী করা উচিত- তার প্রশিক্ষণ প্রদান করেই পাঠানো হয়েছিল।

আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ফারুক রা. আহত হয়ে মেহরাবে পড়ে ছিলেন। কিন্তু তখনো তার হুঁশ-জ্ঞান বাকি ছিল। হজরত উমর রা. নামাজ পড়ানোর জন্য আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর হাত ধরে তাকে সামনে বাড়িয়ে দেন। তিনি সংক্ষেপে দু রাকাত নামাজ পড়ান। দুধারী খঞ্জর খলিফাতুল মুসলিমিনের পেট ফেঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অসীম হিম্মতের অধিকারী। এই অবস্থায়ও তার চেতনা ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি আওয়াজ দেন, ইবনে আব্বাস, দেখো তো আমাকে আক্রমণকারী লোকটা কে?

তিনি দেখে এসে বলেন, মুগিরা বিন শুবার গোলাম।

হজরত উমর রা. বলেন, আচ্ছা, তা হলে সে-ই এর কারিগর!

উত্তরে বলা হলো, জি, হ্যাঁ, সেই।

হজরত উমর রা. বলেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুক। আমি তো তার ব্যাপারে ইনসাফের ফয়সালা করেছিলাম।

এরপর তিনি বলেন, সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তায়ালার, যিনি ইসলামের কালিমা উচ্চারণকারী কারো হাতে আমাকে মৃত্যুদান করেননি।[২৯০]

শেষ অসিয়ত

হজরত উমর রা. কে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। রক্ত তখন পর্যন্ত বন্ধ হচ্ছিল না। এজন্য বারবার তিনি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে খাবার হিসেবে প্রথমে নাবিজ (খেজুর ভেজানো পানি) আর দুধ দেওয়া হয়। কিন্তু সবকিছু ক্ষতস্থান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। এটা দেখে চিকিৎসক তার জীবনের ব্যাপারে নিরাশা প্রকাশ করেন। তখনও তাকে নামাজের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে নামাজ ছেড়ে দেয় ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। তখনও ইসলাহে খালকের (মানুষের সংশোধন) প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তার শুশ্রূষার জন্য আগত এক যুবকের কাপড় টাখনুর নিচে দেখে তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে বলেন, বেটা, সেলোয়ার উপরে রাখবে। এতে কাপড় পরিষ্কার থাকবে। আর এটা খোদাভীতির আলামত।

পুত্র হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর তার দায়িত্বে থাকা ঋণের হিসাব করেন। দেখা যায় তার পরিমাণ ৮৬ হাজার দিরহাম। এগুলো কোনটির পর কোনটি আদায় করতে হবে ছেলেকে তা বুঝিয়ে দেন।[২৯১]

তখন কেউ তার প্রশংসা করে যে, আপনি তো বড়মাপের সাহাবি, আবার একজন ন্যায়বিচারক শাসক। এখন আপনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছেন!

তিনি তখন প্রশংসা দ্বারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে আফসোসের সঙ্গে বলেন, হায়, যদি হিসাব বরাবর হয়ে যেত! কোনো শাস্তি বা প্রতিদান কিছুই যদি না মিলতো![২৯২]

---

[২৯০] সহিহ বুখারি, ৩৭০০

[২৯১] প্রাগুক্ত

[২৯২] সহিহ বুখারি, ৩৭০০, আল মুনতাযাম, ৪/৩২৯

এই সময় তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সাথিরা পরামর্শ দেন যে, আপনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করুন। তিনি বলেন,

اکره ان اتحملها حيا و ميتا

> জীবিত বা মৃত কারো উপর এ বোঝা চাপিয়ে দেওয়াটা আমার অপছন্দ।[২৯৩]

তবু পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের চিন্তা অবশ্যই তার ছিল। এজন্য তিনি অত্যন্ত যৌক্তিক ফয়সালা করেন। তিনি ছয়জন মহান সাহাবির নাম উল্লেখ করেন। হজরত উসমান, হজরত আলি, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত তালহা, হজরত যুবায়ের, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সমন্বয়ে তিনি একটি কমিটি গঠন করে দেন। তিনি বলেন, আমার মৃত্যুর তিনদিনের মধ্যেই যেন উনারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কাউকে আমির নির্বাচন করে নেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও হজরত উমর ফারুক রা. এর পর এ ছ' ব্যক্তি গোটা উম্মাহর সবচেয়ে উত্তম এবং সাহাবিদের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, যাদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমৃত্যু সন্তুষ্ট থাকার কথা সকলের জানা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানিতে তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

আশারায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) সপ্তম ব্যক্তি, যিনি তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু এ কমিটিতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তিনি হলেন হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা.। হজরত উমর রা. সতর্কতাবশত তাকে এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেননা তিনি হজরত উমর রা. এর ভগ্নীপতি ও চাচাতো ভাই ছিলেন। তার ছেলে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. কে এ বিষয়ে কেবল মতামত প্রদানের জন্য পরামর্শসভায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন; খেলাফত গ্রহণের জন্য নয়।[২৯৪]

---

[২৯৩] তারিখে দিমাশক, ৪২/৪২৮

[২৯৪] সহিহ বুখারি, ৩৭০০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২০৮

অসিয়ত

হজরত উমর রা. অন্তিমমুহূর্তে বলেন, আমার পরে নির্বাচিত খলিফাকে আমি অসিয়ত করছি, তিনি যেন প্রথমদিকে হিজরতকারী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় করেন। তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখেন।

যেসকল আনসার ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এবং ঈমানের ক্ষেত্রে প্রথম সারির ছিলেন, তাদের সাথে যেন তিনি উত্তম আচরণ করেন। তাদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করবেন, তাদের ভালোকে সাধুবাদ জানানোর আর তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণ করবে, তাদের বিষয়টি তাকে এড়িয়ে যাওয়ার অসিয়ত করছি।

আমি তাকে বিভিন্ন জনপদে অবস্থানকারী মুসলমানদের ব্যাপারে উত্তম আচরণের অসিয়ত করছি। তারা ইসলামের প্রাচীরতুল্য। তারা আমাদের করের উৎস। কাফেরদের ক্রোধের কারণ। তাদের থেকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রয়োজন-অতিরিক্ত সম্পদের কর গ্রহণ করবে।

আমি গ্রাম্য আরবদের সাথে উত্তম আচরণের অসিয়ত করছি। কেননা তারা আরবের মূল। ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে যেন তাদের দরিদ্রদের উপর খরচ করা হয়।

আমি অসিয়ত করছি- পরবর্তী খলিফা যেন আল্লাহ এবং তার রাসুলের জিম্মায় আগমন করা অমুসলিম বাসিন্দাদের প্রতি লক্ষ রাখেন। তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারের পাবন্দি করেন। তাদের হেফাজতের জন্য যেন যুদ্ধ করেন। তাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেন।[২৯৫]

শেষ ইচ্ছা

হজরত উমর রা. এর প্রবল আগ্রহ ছিল প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে দাফন হওয়ার। তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর নিকট আবেদন করলে তিনি বলেন, 'জায়গাটি আমার দাফনের জন্য পছন্দ করে রেখেছিলাম। কিন্তু উমরকে আমার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।' এই বলে তিনি অনুমতি প্রদান করেন। হজরত উমর ফারুক রা. যখন জানতে পারেন, বলেন, আমার এর চেয়ে বড় কোনো তামান্না ছিল না।[২৯৬]

---

[২৯৫] প্রাগুক্ত

[২৯৬] সহিহ বুখারি, ১৩৯২

রুহ বের হয়ে যাওয়ার সময় আমিরুল মুমিনিন আপন ছেলে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. কে বলেন, আমার মাথা বালিশ থেকে সরিয়ে মাটিতে রেখে দাও। আশাকরি আমার অবস্থার উপর আল্লাহ তায়ালার রহম হবে। আল্লাহর শপথ, আজকের দিনের ভীতি থেকে বাঁচা সম্ভব হলে আমি সারা দুনিয়া কোরবান করে দিতাম।[২৯৭]

মৃত্যু

তিনদিন পর্যন্ত আহত থেকে ২৩ হিজরির মহররম মাসের ১ তারিখে পৃথিবীর ইতিহাসের এই নজিরবিহীন শাসক মৃত্যুর ডাকে লাব্বাইক বলেন। হজরত সুহাইব রুমি, যিনি তার পরিবর্তে তিনদিন মসজিদে নববির ইমামতি করেছিলেন, তার জানাজার নামাজ পড়ান। তিনি সর্বশেষ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আয়েশা রা. এর কামরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর পাশে সমাহিত হন।[২৯৮]

---

[২৯৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৯, ৪৩০

[২৯৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২৩ হিজরির অধীনে এ আলোচনা করা হয়েছে। আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪২৯, ৪৩০, তারিখুল খুলাফা, ১০৯

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হজরত উমর রা. এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। এটি হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, হাদিস নং- ৩৫৬৫, উসদুল গাবাহ, ৪/১৫৬)। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন। যার মধ্যে হজরত উমর রা. নিজেই মৃত্যুর এক বছর পূর্বে নিজের বয়স ৫৭/৫৮ বলেছিলেন। এই হিসাব অনুযায়ী তার বয়স ৫৮/৫৯ এর বেশি নয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই রেওয়ায়েতের সনদকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা বয়সের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক অবগত। (তাহযিবুত তাহযিব, ৭/৪৪১)

হজরত উমর ফারুক রা. এর মৃত্যু হয়েছিল চব্বিশ হিজরির মহররম মাসের এক তারিখে। এটি প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু এই মতটি কোথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এটা এক প্রবল ধারণা; সুনিশ্চিত বক্তব্য নয়। ইমাম আবু নুয়াইম ইসফাহানি সনদের সূত্রসহ হজরত উমর রা. এর শাহাদাতের তারিখের ব্যাপারে সাহাবি ও তাবেয়িদের বিভিন্ন মত একত্র করেছেন। (মারিফাতুস সাহাবা, ১/৪৩-৪৬)

তেমনিভাবে আল্লামা ইবনুল আসির জাযারি ও হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এ ধরনের বিভিন্ন উক্তি একত্র করেছেন। (উসদুল গাবাহ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২৩ হিজরির মৃত্যুপঞ্জিকা)

এ ব্যাপারে বর্ণিত উক্তিগুলো নিম্নরূপ, →

স্থলাভিষিক্তি

হজরত উমর ফারুক রা. মৃত্যুর পূর্বে আপন স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য হজরত উসমান, হজরত আলি, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সমন্বয়ে যে কমিটি গঠন করেছিলেন তার সদস্যরা সকলে এক স্থানে বসে পরামর্শ করতে থাকেন।

হজরত উমর রা. এর অসিয়ত অনুযায়ী হজরত আবু তালহা আনসারি রা. বাইরে পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। কারো জন্যই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। সিদ্ধান্ত হতে বিলম্ব হচ্ছিল। হজরত আবু তালহা আনসারি রা. বলেন, এই বিলম্বের কারণ এই নয় যে, তারা খেলাফতের পদ লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন; বরং তাদের প্রত্যেকেই অপরকে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন।[২৯৯]

তার এই ধারণা সঠিক ছিল। কেননা পরামর্শের শুরুতে হজরত তালহা রা. হজরত উসমান রা. কে, হজরত যুবাইর রা. হজরত আলি রা. কে,

---

১. অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেছেন, জিলহজ মাস শেষ হওয়ার চার দিন পূর্বে বুধবার তিনি ইনতেকাল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তিন দিন পূর্বে ইনতেকাল করেছেন।
২. হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী জিলহজ মাসের ২৭ তারিখ বুধবার তার উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এরপর তিন দিন আহত থেকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
৩. কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, মহররম মাসের এক তারিখ রবিবার তাকে দাফন করা হয়। (এখানে তার শাহাদাতের দিনটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে ধারণা করা যায়, তার মৃত্যু, জানাজার নামাজ এবং দাফনকার্য সম্পন্ন করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়নি। আর এটাই হলো সুন্নত তরিকা। অতএব জিলহজ মাসের ২৭ তারিখে তার উপর আক্রমণ করা হয়েছে। চার দিন তিনি আহত অবস্থায় ছিলেন। এরপর মহররম মাসের এক তারিখে শাহাদাত বরণ করেন এবং সেদিনই তাকে দাফন করা হয়)।
এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ঐ বছর জিলহজ মাস ২৯ তারিখে শেষ হয়েছিল। হজরত উমর রা. তিন দিন আহত ছিলেন। এরপর মহররম মাসের এক তারিখে শাহাদাত বরণ করেন। ঐদিনই তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু মাস যদি ৩০ তারিখে হওয়াটা সাব্যস্ত হয় তা হলে দুটি সুরত হতে পারে। হয়তো বলা হবে, জিলহজ মাসের ৩০ তারিখে তিনি শাহাদত বরণ করেছেন কিংবা এটা বলা হবে যে, তিনি চার দিন আহত থেকে মহররম মাসের এক তারিখে শাহাদাত বরণ করেছেন।

[২৯৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২০৭

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ রা. কে এ দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেরা মুক্ত হয়ে যান। তখন খেলাফতের জন্য শুধু তিন ব্যক্তি ছিলেন। হজরত উসমান, হজরত আলি এবং হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এই অবস্থায় হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. হজরত উসমান ও হজরত আলি রা. কে বলেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে যেকোনো একজন নিজের অধিকার ছেড়ে দিন। যিনি অধিকার ছেড়ে দেবেন এ বিষয়ে তিনি ফয়সালা করবেন। তিনি আল্লাহ এবং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে সবচেয়ে উত্তম মনে করবেন, তার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।

হজরত উসমান রা. ও আলি রা. উভয়কে নিশ্চুপ দেখে তিনি নিজেই বলেন, আচ্ছা তা হলে কি আপনারা আমাকে ফয়সালা করার অধিকার প্রদান করবেন? আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নির্বাচনে কোনো ধরনের ত্রুটি করব না?

হজরত উসমান রা. এবং হজরত আলি রা. আনন্দচিত্তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩০০]

এখন হজরত উসমান রা. এবং আলি রা. মধ্যে ফয়সালা করার প্রয়োজন ছিল। ফয়সালা প্রদানের দায়িত্ব ছিল হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর কাঁধে। তারা উভয়ে ছিলেন উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। উভয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সময়ের সাথি এবং উন্নত গুণাবলি ও উত্তম যোগ্যতার অধিকারী। হজরত উমর ফারুক রা. শুরাকমিটি গঠনের সময় নিজেই বলেছিলেন, আমার ধারণা লোকেরা উসমান এবং আলির মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিবে।[৩০১]

এটা তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিষয় যে, তাদের দুজনের মধ্যে যাকেই নির্বাচন করা হতো, সেটাই উম্মতের জন্য কল্যাণপ্রসূ হতো। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. অভিজ্ঞতার আলোকে তৎক্ষণাৎ ফয়সালা করে

---

[৩০০] সহিহ বুখারি, ৩৭০০

[৩০১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২০৯

দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার রীতি-পদ্ধতিকে সামনে রেখে বিচক্ষণ লোকদের এই নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় শামিল করেন।

এটা সকলেরই জানা ছিল যে, উম্মতের মধ্যে তখন হজরত উসমান এবং হজরত আলি রা. এর চেয়ে উত্তম এবং অধিক যোগ্য কেউ ছিল না। এমনকি হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. যখন হজরত আলি রা. কে একাকী জিজ্ঞেস করেন, যদি আপনাকে ব্যতীত কাউকে খলিফা বানানো হয় তা হলে কে উত্তম হবে? আলি রা. সঙ্গে সঙ্গে বলেন উসমান।

এই প্রশ্ন তিনি হজরত উসমানকেও করেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন আলি।[৩০২]

এই জিম্মাদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নাজুক হওয়ায় হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. পরপর তিনদিন তিনরাত সঠিক মত যাচাইয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি শুধু নামাজ এবং ঘুমের সামান্য সময় ব্যতীত কোনো সময় নীরব বসে থাকেননি। পাশাপাশি তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন। ইসতিখারার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বড় বড় সাহাবি ছাড়াও আনসার এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হজরত উসমান ও হজরত আলির মধ্যে কাকে নির্বাচন করা যায়? এই ব্যাপারে সাধারণ জনগণ, সেনাছাউনিতে অবস্থানরত মুজাহিদ, গ্রামের বেদুইন এবং মদিনায় আগমনকারী কাফেলার সরদারের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের অভিমত জানতে চেয়েছেন। সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল- এই পদের জন্য হজরত উসমান অধিক উপযুক্ত।[৩০৩]

জনগণের এ সিদ্ধান্ত আশাতীত ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশায় হজরত উসমানের ব্যাপারে খেলাফতের সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, মসজিদে নববি নির্মাণ শুরু হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ইট উঠান এরপর হজরত আবু বকর, তৃতীয় পর্যায়ে হজরত উসমান ইট উঠান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন,

---

[৩০২] তারিখুত তাবারি, ৪/২৩৭

[৩০৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২১১

هؤلاءِ الخُلَفاءُ من بعدي
তারা আমার পর খলিফা হবে।[৩০৪]

সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও বলতেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর কাউকে হজরত আবু বকরের সমতুল্য মনে করতাম না। এরপর হজরত উমর রা. এর পর হজরত উসমান রা. কে সর্বোত্তম মনে করতাম।[৩০৫]

সকল দিক দিয়ে নিশ্চিত হয়ে হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. চতুর্থ দিন ফজর নামাজের পর মিম্বরে আরোহণ করেন। প্রথমে তিনি হজরত আলি রা. এর হাত ধরে বলেন, আপনার আল্লাহর রাসুলের আত্মীয়তা এবং প্রথম ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য রয়েছে। আমি আল্লাহর নামে আপনার থেকে ওয়াদা নিচ্ছি, যদি আমি আপনার ব্যাপারে খেলাফতের ফয়সালা করি তা হলে অবশ্যই আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি আমি উসমানকে আমির বানাই তা হলে আপনি সন্তুষ্টচিত্তে তার আদেশ-নিষেধ মান্য করবেন।

এরপর তিনি হজরত উসমানকেও একই কথা বলেন। উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

এরপর তিনি হজরত আলি রা. কে সম্বোধন করে বলেন, হে আলি, আমি লোকজনকে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করেছি, তাদেরকে যাচাই করেছি। তারা উসমানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে; তাই আপনি সামান্যও কষ্ট নিবেন না।

এরপর তিনি বলেন, উসমান, আপনি হাত বাড়ান। এরপর তিনি তার হাত ধরে এই বলে বাইয়াত হন যে, আমরা আপনার নিকট আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী দুই খলিফার রীতিতে বাইয়াত হচ্ছি।

---

[৩০৪] মুসতাদরাকে হাকিম, ৪৫৩৩

[৩০৫] সহিহ বুখারি, ৩৬৯৭ এক বর্ণনায় পাওয়া যায় হজরত মিকদাদ রা. এবং হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. হজরত আলি রা. এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে আওয়াজ তুলেছিলেন। (তারিখুত তাবারি, ৪/২৩৩)। কিন্তু এটি আবু মিখনাফের বর্ণনা। সে ছিল রাফেজি এবং মিথ্যুক। তাই এ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। অন্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই দুই সাহাবিও অন্য সকলের সাথে হজরত উসমান রা. এর হাতে বাইয়াত হয়েছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২১১)

হজরত আলিও বাইয়াত হন। সেই মজলিসেই মুহাজির-আনসার সকলেই একত্র হয়ে হজরত উসমান রা. এর হাতে বাইয়াত হয়ে যান।

বাইয়াতের পূর্ণ ঘটনাটি দুটি সহিহ রেওয়ায়েত থেকে নেওয়া হয়েছে।[৩০৬]

যার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে হজরত উসমান রা. এর খেলাফতের ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ সৃষ্টি হয়নি। হজরত আলি রা.-ও এটা আনন্দচিত্তে মেনে নিয়েছেন।

এই কারণেই ইমাম আহমদ বিন হামবল রহ. বলেছেন, হজরত উসমান গনির মতো মজবুত ও দৃঢ় বাইয়াত কোনো খলিফার ক্ষেত্রে হয়নি। এতে সকলের ঐকমত্য ছিল।[৩০৭]

---

[৩০৬] এই রেওয়য়েত দুটি হলো-

১. সহিহ বুখারি, ৩৭০০

২. সহিহ বুখারি, ৭২০৭

এখানে সহিহ হাদিসের বিপরীতে অন্য কিছু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। এসব বর্ণনার কোনো কোনো অংশ থেকে এটা বোঝা যায় যে, হজরত উসমান রা. এর খেলাফত বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতভিন্নতা ছিল। লক্ষ করা গেছে, হজরত আলি, হজরত আব্বাস, হজরত মিকদাদসহ আরও কিছু সাহাবি একে দুর্নীতি মনে করেন। এই বর্ণনায় হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে হজরত আলি রা. কে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে শপথ করতে বলেন। হজরত আলি রা. তখন বলেন, আমি সাধ্যানুযায়ী করব। এরপর হজরত উসমান রা. থেকে শপথ গ্রহণ করলে তিনি কোনোরূপ শর্তারোপ ব্যতীতই শপথ করেন। তাই হজরত আবদুর রহমান রা. তার ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন। এ রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য হলো হজরত আলি রা. শরিয়তের উপর আমল করার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। নাউজুবিল্লাহ। এ কারণে তাকে খেলাফত প্রদান করা হয়নি। এই বর্ণনায় সামনে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত উসমানের পক্ষে খেলাফতের ফয়সালা হওয়ার পর হজরত আলি রা. অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার দল পাকাবার করার এটাই প্রথম চিত্র নয়। আপনি আগামীকাল শাসক হবার জন্যই এ ফয়সালা করেছেন। যাই হোক, আমরা সবসময় সবর করব। এটা বলে তিনি বাইয়াত হওয়া ব্যতীতই বের হয়ে যান। হজরত মিকদাদ, হজরত আম্মার ও হজরত আলি রা.-ও এ ফয়সালায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। হজরত তালহা রা. ও হজরত আলি রা. পরবর্তীতে বাইয়াত হয়েছেন। (তারিখুত তাবারি, ৪/২৩০-২৩৪)

মোটকথা আবু মিখনাফ প্রমুখের এই বর্ণনা গোঁজামিল ও দুর্বলতার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু এটি সহিহ রেওয়ায়েতের পরিপন্থি। এজন্য গবেষক আলেমগণ এই বর্ণনা গ্রহণ করেননি।

[৩০৭] আল লাসনা, ৩২০

উসমান বিন আফফান রা. এর খেলাফতকাল

মহররম ২৪ হিজরি থেকে জিলহজ ৩৫ হিজরি

৬৪৪-৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

হজরত উসমান বিন আফফান রা.

হজরত উসমান বিন আফফান রা. কুরাইশের বনু উমাইয়া শাখার অত্যন্ত সম্মানিত এবং ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। হস্তীবাহিনীর ঘটনার ছয় বছর পর তায়েফে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩০৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ঘোষণা প্রদানের সময় হজরত উসমান রা. এর বয়স ছিল ৩৪ বছর। তিনি তখন পূর্ণ যৌবনকাল অতিক্রম করছিলেন। ততদিনে তার পিতার ইনতেকাল হয়ে গিয়েছিল। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তিনি বহু মূল্যবান সম্পদ লাভ করেন। এগুলোকে তিনি পিতার ব্যবসায় লাগিয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু তার কানে ইসলামের আওয়াজ পৌঁছামাত্র তিনি ধনসম্পদ, মর্যাদা-শান্তি ও নিরাপদ জীবন উপেক্ষা করে কালিমা তাইয়েবা পড়ে নেন। এভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সারির ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তার চাচা হাকাম বিন আবুল আস তার উপর বহু নির্যাতন চালায়। তিনি ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে সত্য ধর্মে অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৩০৯]

---

[৩০৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২১৩
তার সংক্ষিপ্ত বংশধারা হলো, উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের ছেলে হাশেমের বংশ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অপর ছেলে আবদে শামস থেকে হজরত উসমান রা. জন্মগ্রহণ করেন। মারওয়ানিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনকারী মারওয়ানের পিতা হাকাম বিন আবুল আস তার চাচা ছিলেন। মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা হলো উরওয়া বিনতে কুরাইয বিন রবিয়া। তার নানি উম্মে হাকিম আল বাইযা আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে ছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৫৩

[৩০৯] আল ইসাবা, ৪/৩৭৭, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৫৫

দুনিয়াতে থাকতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩১০]

তিনি সেই ছ' বিশিষ্ট ব্যক্তির একজন, যাদের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১১]

হজরত উসমান রা. দুটি বিষয়ে অন্যদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। একটি হলো তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কন্যার জামাতা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত রুকাইয়া রা. কে তার নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর মেয়ে উম্মে কুলসুম রা. কেও তার নিকট বিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি ইনতেকাল করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমার আর কোনো মেয়ে থাকতো তা হলে আমি তাকেও তার নিকট বিয়ে দিতাম।[৩১২]

এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হজরত উসমান রা. এর মহৎ গুণ এবং তার ব্যক্তিত্বের উপর পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ। কেননা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিজের মেয়েকে কোনো নীচ বা দোষী লোকের নিকট বিবাহ দেয় না।

হজরত উসমান রা. এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, লজ্জাশীলতার দিক থেকে তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আরাম করছিলেন। এ সময় তার পায়ের গোছা উন্মুক্ত ছিল। তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক, এরপর হজরত উমর ফারুক রা. আগমন করেন। তিনি তখন সেভাবেই শুয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন। তারা উভয়ে চলে গেলে হজরত উসমান রা. দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সম্পূর্ণ উঠে বসে যান এবং কাপড় ঠিক করতে থাকেন।

---

[৩১০] সুনানে আবু দাউদ, ৪৬৪৯

[৩১১] সহিহ বুখারি, ১৩৯২

[৩১২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২১৪

জিজ্ঞেস করা হলো, আবু বকর ও উমর আসা সত্ত্বেও আপনি পূর্বের অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু উসমান আসার সাথে সাথে আপনি উঠে বসে গেলেন এবং কাপড় ঠিক করতে লাগলেন?! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি ওই ব্যক্তির ব্যক্তির ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করব না, ফেরেশতারা যার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করেন।[৩১৩]

এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, উসমান অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আশংকা হয় সে আমাকে এই অবস্থায় দেখে আর কথা বলতে পারবে না।[৩১৪]

এই লাজুক স্বভাবের কারণে হজরত উসমান গনি রা. আবদ্ধ গোসলখানায়ও কখনো পাজামা খুলে গোসল করেননি।[৩১৫]

তিনি ইসলামের জন্য মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেন। তার সম্মানিত স্ত্রী হজরত রুকাইয়াও তখন তার সাথে ছিলেন।[৩১৬] কিছুদিন পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। তখন তিনি সস্ত্রীক মদিনায় চলে যান।[৩১৭]

উসমান রা. আল্লাহর রাস্তায় অঢেল সম্পদ খরচ করতেন। মদিনায় মিঠা পানির জন্য মুসলমানদের অত্যন্ত কষ্ট করতে হতো। হজরত উসমান রা. এক ইহুদির থেকে তার চাওয়া দামেই মিঠা পানির কূপ-বিরে রুমা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।[৩১৮]

তাবুকের যুদ্ধে তিনি জিহাদের রসদপত্রসহ তিনশত উট দান করেন। এ ছাড়াও আল্লাহর রাসুলের ঝুলিতে তিনি এক হাজার দিনার প্রদান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে বলেন, আজকের পর উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি হবে না।[৩১৯]

---

[৩১৩] সহিহ মুসলিম, ৬৩৬২

[৩১৪] সহিহ মুসলিম, ৬৩৬৩

[৩১৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২৩০

[৩১৬] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৫৫০

[৩১৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২১৪

[৩১৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/১৯১

[৩১৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/২১৪

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর, হজরত উমর ও হজরত উসমানকে নিয়ে উহুদপাহাড়ে যান। পাহাড় হঠাৎ কম্পন শুরু করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি থেমে যাও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহিদ ব্যতীত কেউ নেই।[৩২০]

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনার মাধ্যমে তার সঠিক মর্যাদা পরিমাপ করা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট পাঠান। এরপর যখন তার শাহাদাতের সংবাদ রটে যায় তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহণ করেন, যাকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। কেননা এতে অংশগ্রহণকারী সকলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সুরা ফাতাহতে নিজের সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২১]

এই কারণে অধিকাংশ সাহাবি হজরত আবু বকর, হজরত উমর এবং হজরত উসমানকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করতেন।

হজরত উসমান বিন আফফান রা. কে আপন শাসনকালে ফেতনা এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সহিহ বুখারিতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হজরত আবু বকর ও হজরত উমর পর্যায়ক্রমে আগমন করেন। হজরত আবু মুসা আশআরি রা. তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। এরপর হজরত উসমান রা. আগমন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তবে তাকে কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।[৩২২]

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ-ফেতনার আলোচনা করছিলেন। ওই সময় হজরত উসমান রা. চাদর মুড়ি দিয়ে

---

[৩২০] সহিহ বুখারি, ৩৬৯৯

[৩২১] সুরা ফাতাহ, আয়াত ১৮, তাফসিরে ইবনে কাসির, সহিহ বুখারি, ৩৬৯৮, সুনানে তিরমিজি, ৩৭০২

[৩২২] সহিহ বুখারি, ৩৬৯৫

যাচ্ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, সেসময় এই ব্যক্তি হকের উপর থাকবে।[৩২৩]

খেলাফতের দায়িত্ব

হজরত উসমান রা. এমন সময় খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। খোরাসান, পারস্য, ইরাকের অনারব অংশ, ইরাকের আরব অংশ, আলজাজিরা, শাম, মিসর, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের বিভিন্ন এলাকা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ইসলামি মানচিত্রে যুক্ত হয়েছে। এসব এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় বসবাস করত, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, তামাদ্দুন, অভ্যাস এবং স্বভাবপ্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের সকলকে একটি নিয়মের অধীনে রাখা, তাদের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা অটুট রাখা, হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালের মতো সমতার মাপকাঠি বহাল রাখা কোনো সহজ কাজ ছিল না।

পাশাপাশি উমর ফারুক রা. এর যুগে বিজয়ের যে ধারা শুরু হয়েছিল, সে ধারায় বিজয়ের জন্য তখনো বহু ময়দান বাকি ছিল। ইসলামের শত্রুদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার পর তারা ধারাবাহিকভাবে পশ্চাদপসরণ করছিল। এই অবস্থায় ইসলামের শৌর্য-বীর্য অবশিষ্ট রাখার জন্য সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযান স্থগিত না করাটা আবশ্যক ছিল।

হুরমুজানের হত্যা... এক নাজুক মামলা

যদিও সে-সময় মুসলমানদের অবস্থা একটা ভালো পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, যেখান থেকে হজরত উসমান গনি রা. এর জন্য রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পেরেশানিতে পড়ার কথা ছিল না। কিন্তু তখন হজরত উসমান রা. কে কিছু চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যার মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, ইসলামের শত্রুরা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এর দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছিল যে,

---

[৩২৩] মুসনাদে আহমদ, ১৮১১৮

আগামী দিনগুলোতে তারা সম্মুখসমরে আক্রমণ করবে না; বরং তাদের আক্রমণ হবে গোপনভাবে।

মদিনায় আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর এক অগ্নিপূজকের হাতে নিহত হওয়া সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না। বড় ধরনের ভুল না হলে অবশ্যই এ ষড়যন্ত্রের রহস্য পৃথিবীবাসীর নিকট প্রকাশ হয়ে যেত। এই হত্যা ছিল বড় ধরনের একটা ভুল। যার মাধ্যমে শুধু হজরত উমর রা. এর হত্যাকারীদের পরিচয় সর্বদার জন্য হারিয়েই যায়নি; বরং এ কারণে হজরত উসমান রা. এর খলিফা হওয়ামাত্র তাকে অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যদি তিনি আল্লাহপ্রদত্ত বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান না করতেন তা হলে পূর্বের খলিফার শহিদ হওয়ার সাথে সাথে অপর একটি ফেতনা সৃষ্টি হয়ে যেত।

হজরত উসমান রা. তখনো খেলাফতের বাইয়াত নেওয়া শেষ করতে পারেননি, এর মধ্যেই তার নিকট হজরত উমর ফারুক রা. এর ছেলে হজরত উবাইদুল্লাহর মোকাদ্দমা চলে আসে। তিনি এক মুসলমান-হুরমুজানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলেন। ঘটনা হলো, উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. কে তার বন্ধু হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. বলেছেন যে, হজরত উমর রা. কে হত্যার জন্য যে খঞ্জর ব্যবহার করা হয়েছে, তিনি হজরত উমর রা. এর উপর আক্রমণকারী অগ্নিপূজক আবু লুলুকে আক্রমণের আগের দিন সেই খঞ্জরসহ হুরমুজানের সাথে দেখেছেন। হুরমুজান তখন ফিরোজ আবু লুলুকে খঞ্জরটা দিয়েছিল। হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. দেখে ফেললে তারা ঘাবড়ে যায়। খঞ্জরটা মাটিতে পড়ে যায়। পরদিন সকালে সেই খঞ্জর দিয়ে আবু লুলু হজরত উমর ফারুক রা. এর উপর আক্রমণ করে। উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. যখন এ খবর জানতে পারেন তখন হজরত উমর ফারুক রা. এর প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল। উমর রা. এর মৃত্যু নিশ্চিত দেখে প্রতিশোধের স্পৃহায় তিনি হুরমুজানকে হত্যা করে ফেলেন।

কেননা তার জানা অনুযায়ী সেও হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তার নিকট কোনো প্রমাণ ছিল না। এ কারণে হজরত

উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. কে গ্রেফতার করা হয়। তাকে হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়।

হজরত উমর রা. এর শাহাদাতের পর এই মোকাদ্দমাটি হজরত উসমান রা. এর সামনে পেশ করা হয়। হজরত উসমান রা. প্রবীণ সাহাবিদের একত্র করে পরামর্শে বসেন। এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সোজা ছিল। উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. এক কালিমা পাঠকারী মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন অতএব কিসাসস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে—কিছু সাহাবি এ মত পোষণ করছিলেন। ওইদিকে উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. হজরত উমর রা. এর হত্যাকাণ্ডে হুরমুজানের শরিক থাকার কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারছিলেন না। ফলে বিচারের ক্ষেত্রে তার পাল্লা দুর্বল হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও হজরত উসমান রা. আপন দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করছিলেন। হুরমুজান উমর রা. এর হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে শরিক ছিল এ বিশ্বাস থেকেই উবাইদুল্লাহ রা. তাকে হত্যা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস তার সামনেই ছিল। যদি আকাশ এবং পৃথিবীর সকলে মিলে কোনো এক মুসলমানের হত্যার ক্ষেত্রে শরিক থাকে তা হলে আল্লাহ তাদের সবাইকে উলটো করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩২৪]

হজরত উমর ফারুক রা. এর এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ ছিল। যদি সানআ এলাকার সকল বাসিন্দা এক ব্যক্তির হত্যার ক্ষেত্রে শরিক থাকে তা হলে আমি তাদের সবাইকে কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করব।[৩২৫]

---

[৩২৪] সুনানে তিরমিজি, ১৩৯৮

[৩২৫] সহিহ বুখারি, দিয়াত অধ্যায়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হানাফি ফুকাহায়ে কেরাম এ সকল হাদিসের সাথে অন্যান্য শরয়ি দলিলাদি সামনে রেখে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তি হত্যার ক্ষেত্রে অংশীদার একাধিক ব্যক্তিকে কিসাস স্বরূপ তখন হত্যা করা হবে যখন সকলেই হত্যা করার জন্য আক্রমণে অংশীদার থাকবে। যদি কেউ হত্যা করার আক্রমণে অংশীদার না থাকে; বরং এই ক্ষেত্রে শুধু সহায়তা করে থাকে তা হলে শাসক তাকে তাযির হিসেবে উপযোগী কোন শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান রহ. তার কিতাব 'আল হুজ্জা আলা আহলিল মাদিনা'য় এই বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। তিনি আবু হানিফা রহ. ফতোয়া নকল করেছেন যে, সহযোগীদেরকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে না। পক্ষান্তরে তিনি মদিনাবাসীদের মাযহাব বর্ণনা করেছেন যে, হত্যাকাণ্ডে সহযোগীদেরও হত্যা করা হবে। এরপর তিনি→

হজরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. পিতৃহত্যার বদলা নিয়েছিলেন। তার ধারণা হুরমুজান এ হত্যাকাণ্ডে সমানভাবে শরিক ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি নিছক ধারণাবশত এটা করেছিলেন, হুরমুজানের অপরাধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি কোনো দলিল পেশ করতে পারছিলেন না, উপরন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার তার কোনো অধিকার ছিল না; তাই তার এ পদক্ষেপ ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি মাথায় তরবারি পড়তে দেখে কালিমা পড়ে নিয়েছিল। তবু উসামা বিন যায়েদ রা. তাকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উসামা বিন যায়েদ রা. কে শুধু শাসিয়েছিলেন। হজরত উসামা বিন যায়েদ রা. মনে করেছিলেন সে প্রাণ রক্ষার জন্য কালিমা পড়ে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা রা. এর প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হন। বলেন, তুমি কি তার অন্তর চিড়ে দেখেছিলে?[৩২৬]

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উসামা রা. কে কোনো সাজা প্রদান করেননি। কেননা উসামা রা. এর মনে এই কাজটি বৈধ হওয়ার কারণ বিদ্যমান ছিল। এ সন্দেহের মাধ্যমে তিনি শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

হজরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. এর ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে। কেননা হজরত উসামা রা. এর কাছে আপন কাজের বৈধতার কারণ স্পষ্ট ছিল, যা তাকে সন্দেহজনিত অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং এই অবকাশও সৃষ্টি করে যে, তার থেকে শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে।[৩২৭]

মদিনাবাসীদের এই মতটি খণ্ডনের জন্য হানাফিদের পক্ষ থেকে দলিল পেশ করেছেন। (আল হুজ্জা আলা আহলিল মাদিনা, ৪/৪০৪)
এর মাধ্যমে জানা গেল যে, উবায়দুল্লাহ বিন উমর রা. এর হুরমুযানকে কেসাসের উপযুক্ত মনে করাটা ভিত্তিহীন ছিল না; বরং এ সন্দেহের পেছনে কিছু একটা দলিল অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।

[৩২৬] সহিহ বুখারি, যুদ্ধ অধ্যায়।

[৩২৭] ফকিহগণের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো-

الاسباب الموجبه للعقوبات من الحدود و القصاص و العقوبة تندرى بالشبهات

দণ্ডবিধি এবং কিসাস আবশ্যককারী বিষয়গুলো সন্দেহের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। (আত তাকরির ওয়াত তাহবির, ২/২০২) (বর্তমান বিচার-ব্যবস্থায়ও এটি স্বীকৃত→

এজন্য এ বিষয়টি অন্যান্য মোকাদ্দমার মতো ছিল না। আর এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'জানের বদলায় জান' মূলনীতির ভিত্তিতে হত্যা করা প্রকৃতপক্ষে সতর্কতামূলক কানুনের পরিপন্থি ছিল। এ ছাড়াও হজরত উমর রা. এর শাহাদাতের পেছনে অনারব ষড়যন্ত্রের হাত থাকার পেছনে বড় ধরনের আশংকা ছিল। ফিরোজের আত্মহত্যা এবং হুরমুজানের হত্যার পর ঘটনার মূল হোতার পরিচয় লাভের সকল পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে বহিঃশক্তির হাত থাকার আশংকা অবশ্যই ছিল। বিষয়টি হজরত উসমান রা. এর দূরদৃষ্টির আড়াল হওয়ার কথা নয়। তাই হুরমুজানকে মজলুম বলাটাও দুর্বল হয়ে যায়।

পরিশেষে হজরত উসমান বিন আফফান রা. চিন্তাভাবনা করে অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যা শরিয়তের নীতির সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়ার সাথে সাথে সেই পরিস্থিতিতে সকলের নিকট প্রশংসনীয় ছিল। তিনি হজরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. কে ভুলবশত হত্যাকারী সাব্যস্ত করে তাকে এ হত্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নিজের পকেট থেকেই এ বিশাল অর্থ হজরত উবাইদুল্লাহ বিন উমর রা. এর পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রদান করেন।

এইভাবে একদিকে বাদিপক্ষের পরিবার ইনসাফ পেয়ে যায় অপরদিকে হজরত উমর রা. এর শাহাদাতের পর দুঃখভারাক্রান্ত মুসলমানগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাদের জন্য পিতৃহত্যার পর তৎক্ষণাৎ ছেলেরও মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হওয়া খুবই বেদনাদায়ক বিষয় ছিল।[৩২৮]

কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী হুরমুজানের ছেলে হজরত উসমান রা. এর এই সিদ্ধান্তের পর উবাইদুল্লাহ রা. কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এই কারণে মদিনাবাসীরা আনন্দে তাকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিল।[৩২৯]

বিষয়। কেউ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি লঘু হয়ে যায়। আদালতের ভাষায় একে 'বেনিফিট অব ডাউট' বলা হয়। -অনুবাদক।)

[৩২৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২১৭

[৩২৯] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪৩

কেউ কেউ উবাইদুল্লাহ রা. এর ভুলক্রমে হুরমুজানকে হত্যার বিষয়টি উপেক্ষা করে উসমান রা. এর এ সিদ্ধান্তকে আপত্তিকর মনে করেছিল। কিন্তু হজরত উসমান রা. শরিয়ত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মানুষের আগ্রহ, রাজনৈতিক নীতি ও ইনসাফ—সবকিছু সামনে রেখে সবচেয়ে উপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞোচিতও ছিল। এই ফয়সালার মাধ্যমে হজরত উসমান রা. খেলাফতের শুরুতেই প্রমাণ রেখেছেন যে, তিনি একজন আদর্শ শাসক, শাসকের সকল গুণ তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম খুতবা

খলিফা হওয়ার পর হজরত উসমান রা. মুসলমানদের সম্মুখে সর্বপ্রথম প্রদত্ত খুতবায় বলেন, 'লোকসকল, তোমরা একটি অস্থায়ী ঘরে আছো। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তোমরা পূরণ করছো। মৃত্যুর পূর্বেই নেক কাজ করে নাও। সকাল-সন্ধ্যা যেকোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। সাবধান! দুনিয়ার জীবন পুরোটাই ধোঁকা। লক্ষ রেখ, যেন তোমরা কোথাও ধোঁকা না খাও। শয়তান যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের ধোঁকায় ফেলে না দেয়। বিগত লোকদের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করো। দুনিয়াদাররা কোথায় গেল? যারা একসময় দুনিয়ার পাগল ছিল, যারা দুনিয়া আবাদ করেছে, তাতে উন্নতি অগ্রগতি সাধন করেছে, তারা কিছুকাল মাত্র ভোগ করেছে। তারা কি দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়নি? আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছেন, তেমনই তোমরাও দুনিয়াকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখো। পরকালের প্রত্যাশী হও।[৩৩০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হজরত উসমান মক্কি-জীবনের প্রাণসংহারক বহু কষ্ট-মুসিবত সহ্য করেছেন। একসময় তিনি হিজরত করে মদিনায় আসেন। ইসলাম নামক বৃক্ষের প্রবৃদ্ধির বহু স্তর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। একজন অহি-লেখক এবং হাফেজে কুরআন হওয়ার সুবাদে কালামুল্লাহর প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। দিবারাত্রি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর সাহচর্যলাভের ফলে তিনি শরিয়তের মেজাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ

---

[৩৩০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২১৫

করতে পেরেছিলেন। তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জমানায় উদ্ভূত বড় বড় ফেতনা এবং তার দমন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। হজরত উমর ফারুক রা. এর বিজয়কাল সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। মুসলমানদের প্রতিটি বিজয়াভিযানে খেলাফতের পক্ষ থেকে পরামর্শের মধ্যে তিনিও অংশীদার ছিলেন। এজন্য খেলাফতের লাগাম হাতে নেওয়ার পর একজন খলিফা হিসেবে তার করণীয় সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালে তার জন্য খেলাফতের জিম্মাদারি পালন করাটা সামান্যও কষ্টসাধ্য ছিল না। কেননা সেটা ইসলামের বিজয়কাল ছিল। পূর্ব থেকে পশ্চিম কোথাও ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা ওঠানোর মতো কোনো শক্তি ছিল না। হজরত উমর ফারুক রা. নিজের অসাধারণ পরিচালনাগত যোগ্যতার মাধ্যমে উম্মতকে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন। এই উত্তম ব্যবস্থায় কোনো ধরনের ফাটল সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না দেওয়াই তখন হজরত উসমান রা. এর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল (৩৬ লক্ষ ২১ হাজার বর্গকিলোমিটারের) এই বিশাল সাম্রাজ্যের সকল বিষয় দেখাশোনা করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন জিম্মাদারি ছিল। মুসলমানদের আমিরকে আল্লাহর সামনে যেমন জবাবদিহি করতে হয় তেমনিভাবে সাধারণ জনগণের সামনেও তার জবাবদিহিতার একটি বিষয় থাকে। এটা অনেক বড় পরীক্ষা ছিল। হজরত উমর রা. তার শাসনকালের শেষবছর (যখন তার বয়স ষাটও হয়নি) দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার শক্তি কমে গেছে। আমার জনগণ বহু দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। কারো অধিকারে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি কিংবা ত্রুটি আমার দ্বারা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।[৩৩১]

ওইদিকে খেলাফতের শুরুতেই হজরত উসমান রা. এর বয়স ছিল সত্তর বছর। সুস্থতা এবং শারীরিক শক্তির দিক থেকে তিনি হজরত উমর রা. এর সমতুল্য ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের দেখাশোনা, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং খেলাফতের কেন্দ্র মজবুত করার জন্য

---

[৩৩১] তারিখুল খুলাফা, ১০৭

নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এর পেছনে তার অসাধারণ ঈমানি শক্তি, আত্মোৎসর্গের স্পৃহা, কোরবানি ও বিপদ সহ্য করার যোগ্যতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সক্রিয় ছিল।

ফেতনার গন্ধ

উসমান রা. গভীর দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর সকল বিষয় লক্ষ করছিলেন। ফলে বিশেষ দুটি বিষয় তার দৃষ্টিগোচর হয়, যে-জন্য তার প্রস্তুতি গ্রহণ করাটা জরুরি ছিল। একটি বিষয় হলো, হজরত উমর ফারুক রা. এর শাহাদাত একটি বড় ফেতনার সংকেত দিচ্ছিল।

হজরত হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে হজরত উসমান রা. অবগত ছিলেন। হজরত উমর রা. হজরত হুজাইফা রা. কে বলেছিলেন, আমাকে সেই ফেতনার ব্যাপারে সংবাদ দাও, যা উম্মাহকে ঢেউয়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

হজরত হুযাইফা রা. উত্তর দেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনার এবং সেই ফেতনার মাঝে একটি মজবুত দরজা প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়েছে, আপনার জীবদ্দশা পর্যন্ত যা বন্ধ থাকবে।

পরবর্তীতে হজরত হুজাইফা রা. নিজেই বলেছিলেন, হজরত উমর রা. নিজেই সেই দরজা ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ফেতনাগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে।[৩৩২]

হজরত উসমান রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার ব্যাপারে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তাকে পরীক্ষাসহ সুসংবাদ দাও, তাকে যার মোকাবেলা করতে হবে।[৩৩৩]

মৃত্যুর পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উসমান রা. কে একা ডেকে নিয়ে তাকে কিছু রহস্যের কথা বলেছিলেন, যা শুনে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[৩৩৪]

---

[৩৩২] সহিহ বুখারি, ৭০৯৬
[৩৩৩] সহিহ বুখারি, ৩৬৯৫
[৩৩৪] মুসনাদে আহমদ, ২৪২৫৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, অচিরে আল্লাহ তোমাকে একটি পোশাক (খেলাফতের দায়িত্ব) পরিধান করাবেন। মুনাফিকরা যদি তোমার থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে চায় তা হলে তুমি একদম খুলবে না। অবশেষে তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।[৩৩৫]

হজরত উসমান রা. এবং তার পরামর্শক সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে চাক্ষুষ বিষয়ের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। উমর ফারুক রা. এর পর বিভিন্ন ফেতনার প্রকাশ ঘটার ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। এইসকল হাদিস ছাড়াও স্বয়ং খলিফার মসজিদের মেহরাবে শহিদ হওয়া, হত্যাকারী সম্পর্কে জানার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় বলে দিচ্ছিল যে, শত্রুরা এখন সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে গোপন লড়াই শুরু করেছে। এখন বিভিন্ন ফেতনা-ফাসাদ তৈরি করা এবং তা উসকে দেওয়ার পথ অবলম্বন করাকেই তারা নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করে নিয়েছে।

এটা নিশ্চিত যে, এসব ফেতনার রাস্তা আর বন্ধ করা যাবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের সঙ্গে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। যথাসম্ভব ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। এতে অবশ্যই সফলতার আশা ছিল। আর সাহাবিগণ চেষ্টাপ্রচেষ্টার জন্য নির্দেশিতও ছিলেন। হজরত উসমান বিন আফফান রা. এর সামনে এটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আর নিঃসন্দেহে খেলাফতের জিম্মাদারি গ্রহণ করার সাথে সাথেই তিনি এ সকল ফেতনা মোকাবেলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। এজন্য তিনি আপন প্রতিরক্ষামূলক পলিসিতে সবসময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন।

---

[৩৩৫] মুসনাদে আহমদ, ২৪৫৬৬

হজরত উসমান গনি রা. এর চমৎকার পলিসি

হজরত উসমান গনি রা. ভবিষ্যতের ফেতনা মোকাবেলা এবং খেলাফতকে মজবুত করার জন্য একটি পলিসি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে নম্রতা প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রাচ্যবিদ এবং সেক্যুলার ঐতিহাসিকরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হটকারিতাবশত একে সমালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত করে।

তৃতীয় খলিফা উসমান রা. এর পলিসি বোঝার জন্য আমাদেরকে একটি মৌলিক কথা মাথায় রাখতে হবে। তা হলো রাষ্ট্র দুইভাবে ফেতনার দ্বার রুদ্ধ করতে পারে।

১. কঠোরতা এবং দমন-পীড়নের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে। এবং

২. নম্রতা এবং আলোচনা-পর্যালোচনার পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে।

কঠোরতার পলিসি অবলম্বনের অর্থ হলো বিরোধীশক্তি এবং ফেতনাবাজদের মূলোৎপাটন করা। তাদেরকে খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করা, বন্দি করা ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। অন্যরা যাতে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ফেতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই পলিসি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতার মুখ দেখেছে। বিভিন্ন শাসক এই পন্থা অবলম্বন করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেদের মুকুট এবং সিংহাসন বহাল রাখতে পেরেছেন; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, ধরপাকড়, জেল-জুলুম এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কোনো রাষ্ট্রকে ভবিষ্যৎ-স্থায়িত্ব এনে দেয় না; বরং পরিণামে সে রাষ্ট্র একসময় ধ্বংস হয়ে যায়।

কেননা শহরের লোকদের পক্ষ থেকে ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে দমনের পলিসি গ্রহণ করলে বহু নিরপরাধ মানুষও শাস্তির তালিকায় চলে আসে। তখন ব্যাপকভাবে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সাধারণ পযার্য়ের মানুষকে সামান্য অপরাধের জন্য বড় ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হলে সে রাষ্ট্রের চরম বিরোধী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রদ্রোহকে সে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। রাষ্ট্রপক্ষ তখন প্রত্যুত্তরে অধিক

কঠোরতা করে আর রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিদ্রোহও তখন বৃদ্ধি পায়। এভাবে পরিশেষে একটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়।

এর পরিবর্তে যদি নম্রতা, আলোচনা-পর্যালোচনা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণের পন্থা অবলম্বন করা হয় তা হলে বিশৃঙ্খল লোকজন হয়তো কিছুটা ছাড় পেয়ে যাবে; কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলতে সফল হবে না। কেননা প্রত্যেকেই তখন নিজ অধিকার সংরক্ষিত দেখতে পাবে। শুধু শুধু কারো উপর বিপদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যত হবে না। এটাই মানুষের স্বভাব। বিশৃঙ্খলাকারীদের অনেকেই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে থাকে। ভুল বুঝে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এক্ষেত্রে যখন তারা প্রত্যুত্তরে শাসকদের পক্ষ থেকে ন্যায়নিষ্ঠা, অনুগ্রহ-অনুকম্পা এবং নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে আলোচনা-পর্যালোচনার পথ উন্মুক্ত দেখতে পাবে তখন অবশ্যই তারা নিজেদের ভুল কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসবে। এক্ষেত্রে অবাধ্য শ্রেণির লোক ও বহিঃরাষ্ট্রের এজেন্টরা আইনের অধীনেই শাস্তি ভোগ করে থাকে। আর অবশিষ্ট কেউ থাকলেও সমাজে তারা বেশি একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

হজরত উসমান গনি রা. নিজের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং ঈমানি দূরদর্শিতার মাধ্যমে এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যার ফলে আত্মগোপনকারী বিশৃঙ্খল লোকেরা—হজরত উমর ফারুক রা. এর শাহাদাতের পরই যাদের পক্ষ থেকে ফেতনা-ফাসাদ শুরু হওয়ার আশঙ্কা ছিল—হজরত উসমান রা. এর ১২ বছর খেলাফতের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত তারা সামান্য পরিমাণ সফল হতে পারেনি। এই দীর্ঘ সময়ে তারা বিশৃঙ্খলা এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো সুযোগ পায়নি।

বর্তমান যুগের কিছু নামধারী মুহাক্কিক দাবি করছে যে, প্রকৃতপক্ষে উসমান রা. এর নম্রতা এবং তার কর্মপন্থা ইসলামি খেলাফতকে ফেতনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তাদের এ দাবি আগাগোড়া বাস্তবতা-পরিপন্থি। তারা এমনও দাবি করে যে, হজরত উমর ফারুক রা. থাকলে এ ফেতনাগুলো শক্ত হাতে দমন করতেন। অথচ বাস্তবতা হলো হজরত উসমান রা. এর গৃহীত পলিসি সময়ের বিচারে সর্বোত্তম ছিল। এক্ষেত্রে তিনি বড় বড় সাহাবির সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন। যদি হজরত

উমর ফারুক রা. আরো দশ থেকে বারো বছর শাসন করতেন তা হলে সৃষ্ট এই অবস্থায় তার কর্মপন্থা সম্ভবত হজরত উসমান রা. এর কর্মপন্থার চেয়ে বেশি ভিন্ন হতো না।

উসমান রা. এর গৃহীত পলিসির বৈশিষ্ট্য

এই ধারণা করা সম্পূর্ণ অমূলক যে, হজরত উসমান গনি রা. হজরত উমর ফারুক রা. এর রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। বাস্তবতা হলো, তিনি ফারুকি রাষ্ট্রব্যবস্থাই বহাল রেখেছিলেন। উমর রা. এর রাষ্ট্রীয় নীতিমালারই তিনি অনুসরণ করতেন। তার সময়েও মুসলমানদের বিজয়ধারা পূর্বের মতো অব্যাহত থাকে। ইলম ও মারেফাতের মারকাজগুলো আবাদ থাকে। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। প্রজাসাধারণ সকলেই নিজ নিজ অধিকার সমানভাবে ভোগ করতে থাকে। গভর্নর এবং অফিসারদের রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করা হতে থাকে। অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি হলে জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকে। কেউ দায়িত্ব পালনে গাফলতি করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতে থাকে।

পরিচালনাগত এবং রাষ্ট্রীয় এই সমস্ত নীতি সংরক্ষণের পাশাপাশি হজরত উসমান রা. এর নতুন পদক্ষেপ কেবল দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তিনভাবে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

১. হজরত উমর ফারুক রা. এর কর্মপন্থা কঠোর ছিল। কেননা তার স্বভাবে আল্লাহ তায়ালার জালাল ও ক্রোধগুণ প্রবল ছিল। পক্ষান্তরে হজরত উসমান রা. এর মেজাজ নরমপ্রকৃতির ছিল। তার মেজাজে নববি নম্রতাগুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। স্বভাবগতভাবে তিনি অত্যন্ত কোমল এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তার এই নম্র আচরণ এবং কোমলতার পেছনে ব্যবসায়িক জীবন এবং লেনদেনের প্রভাব রয়েছে। তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। প্রয়োজনের কথা পরিষ্কার ভাষায় সংক্ষিপ্ত শব্দে ভদ্রভাবে বলে দিতেন।

২. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ও হজরত উমর ফারুক রা. ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কাউকে পুরস্কৃত করতেন না। এর একটি কারণ হলো, তারা ব্যক্তিগতভাবে সচ্ছল ছিলেন না। আর বাইতুল-মাল থেকে টাকা খরচ করে পুরস্কার দেওয়া তাদের নিকট সতর্কতার পরিপন্থি ছিল।

হজরত উসমান রা. মানুষকে দান করাটা ভালো মনে করতেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে তার অর্থসম্পদের কোনো স্বল্পতা ছিল না। তিনি এগুলো জমা করে রাখার পরিবর্তে খরচ করতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি অধিক পরিমাণে দান-সদকা করতেন। যারা তার নিকট আসতো, তিনি তাদেরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে হাদিয়া দিতেন (কিন্তু এর অর্থ কখনোই এই নয় যে, তিনি বাইতুল-মাল থেকে অনর্থক খরচ করতেন। বাইতুল-মাল থেকে তিনি একটি দিরহামও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজের প্রয়োজনে কাউকে এগুলো দিতেন না। এমনকি বিগত দুই খলিফা বাইতুল-মাল থেকে যে ভাতা গ্রহণ করতেন, তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রা. তাও নিজের নামে জারি করাননি।)।

৩. দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের তৃতীয় বহিঃপ্রকাশ হলো তিনি মুসলিম উম্মাহর বিশেষ এবং সাধারণ সকলকেই জীবনমান উন্নত করার সুযোগ প্রদান করেছিলেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জমানায় খুব বেশি সংখ্যক শহর বিজিত হয়নি। ফলে তখন পর্যন্ত ধনসম্পদের প্রবাহ শুরু হয়নি। হজরত উমর রা. এর জমানায় রোম এবং পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের পদতলে চলে এসেছিল; কিন্তু হজরত উমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণার্থে মুসলমানদের, বিশেষত নিজের গভর্নর এবং অফিসারদের, সাদাসিধা জীবনযাপন পছন্দ করতেন। মুসলমানরা ধনসম্পদের আধিক্য সত্ত্বেও যেন আরবদের অকৃত্রিম সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকে- তিনি সে চেষ্টা করতেন। হজরত উমর রা. এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। হজরত উসমান রা. অত্যন্ত বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য এই সুযোগ প্রদান করেন যে, তারা আল্লাহপ্রদত্ত হালাল মালের মধ্য থেকে বৈধটা গ্রহণ করতে পারে। তার দৃষ্টি শুধু সেসব হাদিসের উপরই নিবদ্ধ ছিল না, যাতে দুনিয়াদারি, আরাম-আয়েশ অপছন্দ করা হয়েছে; বরং তার ফকিহসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদিসের ঐসব নির্দেশনার প্রতিও নিবদ্ধ ছিল, যাতে হালাল নেয়ামতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেছেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জা, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহ, কে হারাম করেছে?[৩৩৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে নেয়ামত দান করলে তিনি বান্দার শরীরে সেই নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ পছন্দ করেন।[৩৩৭]

এটা ঠিক বিষয় যে, হজরত উমর ফারুক রা. মুসলমানদেরকে উত্তম ও ভালো ভালো পোশাক-সৌন্দর্য অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু ধনসম্পদের মোহে ডুবে না যাওয়াটাই তার এ নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় এইসব নেয়ামতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার বৈধতার কথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। এ কারণেই তিনি বাইতুল মাকদিস বিজয়ের সময় কিছু সেনাপতিকে মূল্যবান ও উত্তম পোশাক-পরা দেখে তাদেরকে তিরস্কার করেন। কিন্তু উত্তরে যখন তাকে বলা হলো এখানে এ ধরনের পোশাক পরিধানের প্রয়োজন রয়েছে তখন হজরত উমর ফারুক রা. নীরবতা অবলম্বন করেন।[৩৩৮]

উসমান রা. এর এই কর্মপন্থার সবচেয়ে বড় কারণ হলো বৈধ আরাম-আয়েশের উপকরণের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে বাইতুল-মালে অঢেল সম্পত্তি জমা পড়ে যেত। আর এর পরিমাণও এত বেশি ছিল যে, লোকজনের মধ্যে বণ্টন করা হলেও দেখা যেত তাদের নিকট সম্পদের স্তূপ তৈরি হয়ে গেছে।

সাম্রাজ্যবাদের মতো জুলুম করে বাইতুল-মালের এ সম্পত্তি লুট করে আনা হয়নি; বরং এর বড় একটি অংশ প্রতিবছর ইরাক, পারস্য, খোরাসান এবং মিসর থেকে কর হিসেবে বাইতুল-মালে জমা হতো, বর্তমান হিসাবে যার মূল্যমান বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হবে। ওই সময় মুসলিমবিশ্বের মোট জনসংখ্যা এক কোটিরও কম ছিল। বাইতুল মালের সে সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। হজরত উমর রা. এর যুগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাতার মাধ্যমেই মানুষের প্রয়োজন বেশ

---

[৩৩৬] সুরা আরাফ, আয়াত ৩২

[৩৩৭] শুয়াবুল ঈমান, ৮/২৬৩

[৩৩৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৬৫৮

ভালোভাবেই পূরণ হয়ে যেত। মোটকথা বাইতুল-মাল থেকে যখন জনসাধারণকে অধিক পরিমাণ অর্থ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে তা হলে কেন তাদেরকে দেওয়া হবে না?

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাউকে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তা খরচ করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে অঢেল সম্পদের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এটাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপন্থা আখ্যা দেওয়া যায়, যা মোটেই ইসলামি শাসন ব্যবস্থার মর্যাদা উপযোগী নয়। এই কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে পরিমাণে গনিমত এবং বিজিত এলাকার শস্য-ফলাদি আসছিল, উসমান রা. সেই পরিমাণেই জনসাধারণকে হাত খুলে খরচ করার অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেন। তিনি সকলকে বৈধভাবে আরামদায়ক জীবনোপকরণ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন।

এ কারণেই দেখা যায় হজরত উসমান রা. খলিফা হওয়ার পরপর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রত্যেকের বার্ষিক ভাতা দুইশ দিরহাম করে বৃদ্ধি করার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল (আজকালের হিসাবে যা প্রায় পঁচিশ হাজার রুপির সমান)।[৩৩৯]

হজরত উমর ফারুক রা. রমজান মাসে সাহরি ও ইফতারের জন্য সবাইকে এক দিরহাম করে প্রদান করতেন। একজন তাকে বলল, আপনি কেন সকলের ইজতিমায়ি খাবারের ব্যবস্থা করেন না?

তিনি বলেন, আমি ঘরে রেখেই মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে চাই।

হজরত উসমান রা. হজরত উমর ফারুক রা. এর সম্পদ-বণ্টনপদ্ধতি বহাল রাখার পাশাপাশি সাহরি ও ইফতারে সকলের একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বলেন, মুসাফির, অচেনা দূরাগত লোক এবং মসজিদে ইবাদতের লক্ষ্যে আগত মুসল্লিদের জন্য এই আয়োজন।[৩৪০]

সম্পদব্যয়ের এই যৌক্তিক, সহমর্মিতাপূর্ণ ও সচ্ছল পদ্ধতি অবলম্বনের ইতিবাচক প্রভাব প্রকাশ পায়। হজরত উসমান রা. এর কর্মপন্থা মানুষের মন জয় করে নেয়। ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন, এ পদক্ষেপের ফলে জনগণ তাকে হজরত উমর রা. এর চেয়েও বেশি ভালোবাসা শুরু

---

[৩৩৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৫৩

[৩৪০] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪৫

করে। কেননা তারমধ্যে উমর রা. শাসনকালের মতো পূর্ণ ইনসাফ, দৃঢ় ও উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার পাশাপাশি সচ্ছলতা, দানশীলতা ও নম্রতার মহৎ গুণাবলি বিদ্যমান ছিল, বহু ক্ষেত্রেই যা দুশমনের মন জয় করে থাকে।[৩৪১]

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, আমি হজরত উসমান গনি রা. কে খুতবা প্রদান করতে দেখেছি। ওই সময় আমি বয়ঃসন্ধিকালের নিকটবর্তী ছিলাম। আমি হজরত উসমান রা. এর মতো সুন্দর, সুঠাম এবং চমৎকার চেহারার কোনো পুরুষ বা নারী—কাউকে দেখিনি। আমি হজরত উসমান রা. কে বলতে শুনেছি, 'হে লোকসকল, আসুন, আপনাদের ভাতা নিয়ে যান।' লোকেরা তখন ভরপুরভাবে মাল নিয়ে যেত। বলা হতো, 'লোকসকল, আসুন, পোশাকআশাক নিয়ে যান।' লোকেরা আসতো, তাদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ বণ্টন করা হতো। আল্লাহর কসম, আমার কান এমনও শুনেছে যে, বলা হচ্ছে, লোকসকল আসুন, ঘি এবং মধু নিয়ে যান। লোকজনের মধ্যে ঘি এবং মধু বণ্টন করা হতো। মানুষ আসতো এবং মেশক, আম্বর প্রভৃতি সুগন্ধি নিয়ে যেত। হজরত উসমান রা. এর শাসনকালে মানুষের মধ্যে শত্রুতার কোনো নামগন্ধ ছিল না। হাদিয়া-তোহফা ও দান-সদকার বৃষ্টি বর্ষিত হতো। পৃথিবীতে এমন কোনো মুসলমান ছিল না, যার সাথে অন্যকারো মনোমালিন্য ছিল। মুসলমানরা একে অপরকে ভাই-বন্ধু, সহযোগী এবং হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করত।[৩৪২]

---

[৩৪১] ইবনে কুতাইবা কৃত আল ইমামা ওয়াস সিয়াসা, পৃষ্ঠা ৪৫

[৩৪২] ইবনে কুতাইবা কৃত আল ইমামা ওয়াস সিয়াসা, পৃষ্ঠা ৪৫, ৪৬

জিহাদের ময়দানে হজরত উসমান রা. এর বাহাদুর সিপাহিগণ

হজরত উমর ফারুক রা. এর মৃত্যুর মাধ্যমে জিহাদের পতাকা হেলে যায়নি; বরং পূর্বের মতোই বিজয়ধারা অব্যাহত ছিল। আল্লামা ইবনে জারির তাবারি হজরত উসমান রা. এর শাসনকালের সামরিক ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'কুফার সেনাছাউনিতে সবসময় ৪০ হাজার মুজাহিদ প্রস্তুত থাকত, যাদের মধ্যে প্রতিবছর ১০ হাজার মুজাহিদ সীমান্তে নিয়োজিত থাকত। তাদের মধ্যে ৬ হাজার আজারবাইজানে আর ৪ হাজার রায় শহরে অবস্থান করত।[৩৪৩]

হজরত উসমান রা. এর শাসনকালের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ হজরত উমর ফারুক রা. এর জমানা থেকেই হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. আলজাজিরার গভর্নর ছিলেন। তিনি আপন সেনাপতি সালমান বিন রাবিয়া রহ. কে ১২ হাজার মুজাহিদ দিয়ে আর্মেনিয়া পাঠিয়েছিলেন, যারা কয়েকটি অঞ্চল জয় করে প্রচুর গনিমত নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।[৩৪৪]

রোমান সরদারের তাঁবুতে

মুসলমানগণ এই বছর শামের সীমান্তে রোমানদের উচিতশিক্ষা দেন। এ শিক্ষা তারা কখনো ভুলতে পারেনি। রোমানরা হজরত উমর ফারুক রা. এর শাহাদাতের ফলে মুসলমানদের দুর্বল মনে করে শামের সীমান্তে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হজরত উসমান রা. এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে চিঠি লেখেন। তাকে শামের মুসলমানদের সাহায্যে ৮-১০ হাজার মুজাহিদ পাঠাবার জরুরি নির্দেশ প্রদান করেন।

হজরত ওয়ালিদ বিন উকবা রা. তৎক্ষণাৎ সালমান বিন রবিয়া রহ. এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীকে শামের সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। হজরত হাবিব

---

[৩৪৩] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪৬

[৩৪৪] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪৭

বিন মাসলামা আল ফিহরি রা. সেখানে স্থানীয় মুজাহিদদের সাথে সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলেন। ওইদিকে রোমান সিপাহসালার ৮০ হাজার রোমান এবং তুর্কি সেনা নিয়ে সীমান্তে শিবির স্থাপন করেছিল।

হজরত হাবিব বিন মাসলামা রা. পরিকল্পনা পরিবর্তন করে লড়াই চালিয়ে যেতে বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি শত্রুদেরকে রাতের অন্ধকারে রক্তে ডুবিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেন। যখন তিনি নিজের তাঁবু থেকে বের হতে লাগলেন তখন তার সম্মানিত স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে ইয়াজিদ জিজ্ঞেস করেন, এরপর আবার কোথায় সাক্ষাৎ হবে?

তিনি বলেন, রোমান সেনাপতির তাঁবুতে কিংবা জান্নাতে।

তিনি রাতের অন্ধকারে রোমানদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এসময় তার স্ত্রী বেশভূষা পরিবর্তন করে প্রাণোৎসর্গকারী মুজাহিদদের মধ্যে শামিল হয়ে যান। হজরত হাবিব বিন মাসলামা রা. বিজলির মতো আকস্মিক শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন। তিনি লড়াই করতে করতে রোমান সেনাপতির তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যান। তিনি দেখতে পান তার স্ত্রী তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। এই যুদ্ধে রোমানদের পরাজয় হয়। মুসলমানরা বিজয়ের পতাকা ওড়াতে ওড়াতে ফিরে আসেন।[৩৪৫]

এ পরাজয় সত্ত্বেও রোমানরা মনে করছিল হজরত উমর রা. এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতায় অবশ্যই কিছুটা দুর্বলতা এসেছে। এই কারণে এখন তাদের থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু সীমান্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করা যাবে। শামের সীমান্তে পরাজিত হওয়ার পর তারা মিসরের উপকূলবর্তী শহর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করার পরিকল্পনা করে। তাদের সেনাপতি মুনায়েল সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী নৌবাহিনী নিয়ে পৌঁছে যায়। স্থানীয় রোমান বাসিন্দারা ইতিমধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিল। এর ফলে রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়ার উপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

মিসরের গভর্নর হজরত আমর বিন আস রা. তাদেরকে বেশি দিন বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দেননি। তিনি ২৫ হিজরির

---

[৩৪৫] তারিখুত তাবারি, ৪/২৪৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২২০, ২২১

রবিউল আউয়াল মাসে পালটা হামলা করে রোমান নৌবাহিনীকে পরাজিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি পুনরায় সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন।[৩৪৬]

আলেকজান্দ্রিয়ার স্থানীয় কিবতি জনগোষ্ঠী বিদ্রোহে রোমানদের সঙ্গ দেয়নি। এ কারণে রোমানরা পালানোর সময় তাদের অনেক আর্থিক ক্ষতি সাধন করে। হজরত আমর ইবনুল আস রা. যথাসম্ভব তাদের এই ক্ষতি পূরণ করেন।[৩৪৭]

হজরত উসমান গনি রা. এর খেলাফতের প্রথম দুই বছরে সংঘটিত এ বড় দুটি যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রতিরক্ষামূলক পলিসি গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে হার-জিতের বিষয়টি শত্রুদের পক্ষ থেকে ছিল। এ ছাড়াও তার খেলাফতকালে বিভিন্ন সময় সীমান্ত এলাকায় বহু অভিযান প্রেরণ করা হয়; কিন্তু এগুলো ছিল গেরিলা পর্যায়ের। মুসলমানদের ছোট ছোট দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী শত্রু-এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাদের খোরাক এবং রসদপত্র ছিনিয়ে আনত। তাদের নিরাপত্তা-চৌকিতে আক্রমণ করত। এভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে কোনো এলাকা বা দুর্গ জয় করা ব্যতীতই তারা ফিরে আসত।

এ ধরনের অভিযানের চারটি উদ্দেশ্য ছিল।

১. নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দেওয়া।

২. প্রতিপক্ষের শক্তি যাচাই করা।

৩. শত্রুদের আর্থিকভাবে দুর্বল করে ফেলা।

৪. নিজেদের সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে তা নিরাপদ রাখা।

প্রাচ্যবিদরা মুসলমানদের এই কার্যক্রমকে লুটপাট এবং ডাকাতি বলে উল্লেখ করে থাকে। অথচ এ ধরনের কার্যক্রম বাইজেন্টাইনরাও চালাত। উভয় পক্ষ থেকে চলমান এই কার্যক্রমকে যুদ্ধই বলতে হবে, যা ছিল অন্যান্য যুদ্ধ থেকে কিছুটা ভিন্ন। এটাকে লুটপাট, ডাকাতি বলে আখ্যা দেওয়া রাজনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে।

---

[৩৪৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২২৩

[৩৪৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/২৫৫

হজরত উসমান রা. বিজয়ের পরিসীমা বিস্তৃত করার উপকারিতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরিণামের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। হজরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফতের শুরু সাত বছর মুসলিমবাহিনী প্লাবনের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। হজরত উমর ফারুক রা. এই বিজয়াভিযানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ভৌগোলিক সীমানার প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন। পূর্ব দিকে তিনি খোরাসান পর্যন্তই বিজয়ধারা সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। মুজাহিদদেরকে তিনি উচ্চভূমি পামির কিংবা আমুদরিয়া অতিক্রম করে তুর্কিদের ভূখণ্ড এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে দেননি। এক্ষেত্রে সম্ভবত তার সামনে ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী,

اتركوا التُّرْكَ ما تركوكم

> যতক্ষণ পর্যন্ত তুর্কিরা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে ততক্ষণ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করো না।[৩৪৮]

পশ্চিম দিকে তিনি রোম উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অভিযান সীমাবদ্ধ করেছিলেন। হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি সমুদ্রাভিযানের অনুমতি দেননি। এই সতর্কতার একটি বড় কারণ এই ছিল যে, মুসলিমরা নিয়মকানুনের প্রতি অনুগত, বীরত্ব ও সাহসিকতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হজরত উমর রা. মুজাহিদদের জন্য সমুদ্রকে ভীতিকর মনে করতেন। তার আশঙ্কা ছিল, মুসলমানরা কোনো সমুদ্রঝড়ে আক্রান্ত হতে পারে। আর মুসলমানরা তখনো সমুদ্র-সফর, জাহাজ নির্মাণ ও পরিচালনা এবং সমুদ্রপথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবগত ছিল না। হজরত উমর রা. মুজাহিদদেরকে সমুদ্রের এই মৃত্যু-উপত্যকায় ধ্বংস করার মতো বিপদ মাথায় নিতে চাননি। আর বাস্তবতা এমনটাই ছিল, সমুদ্রাভিযানের জন্য যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও সেনাপতি এবং যে ধরনের সামুদ্রিক জাহাজ প্রয়োজন ছিল, মুসলিমবাহিনীর সেগুলো ছিল না। এজন্য সমুদ্রাভিযানে বের হওয়ার মানে ছিল নিজেদেরকে বাইজেন্টাইন জাহাজ নাবিকদের হাতে গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত করা।

---

[৩৪৮] তাবারানি কৃত আল মুজামুল কাবির, ১০/১৮১

সতর্কতার এ দিকটি হজরত উসমান রা. এর সামনেও ছিল। এই কারণে শুরুর কয়েক বছর তিনি এই সামুদ্রিক দুর্বলতা দূর করা এবং সমুদ্রাভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ওই সময় মিসরের সঙ্গে সংযুক্ত আফ্রিকায় অভিযান পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। এজন্য তৃতীয় খলিফা উসমান রা. আপন খেলাফতের দ্বিতীয় বছর ২৫ হিজরিতে মিসরের মুজাহিদদেরকে পশ্চিম দিকে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করেন। পাশাপাশি তাদের সাহায্যে সেনা পাঠিয়ে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিলেন।

আফ্রিকা অভিযান

মিসর সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা রোমান শাসক জুরজিরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রথম দিকে তিনি রোমান সম্রাটের অধীনস্থ গভর্নর ছিলেন। কিন্তু এশিয়া থেকে রোমানদের নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পর তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার রাজ্য মিসর সীমান্ত থেকে নিয়ে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে এখানে তিউনিশিয়া, লিবিয়া, আলজাজিরা এবং মরক্কো অবস্থিত।

তৃতীয় খলিফার পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর মিসরের উত্তরাঞ্চলের গভর্নর হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে আফ্রিকার বিশাল মরুভূমি পাড়ি দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি জুরজিরের সীমান্তে প্রবেশ করেন। এখানে কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য বন্দি ও নিহত হয়। গনিমতের অঢেল সম্পদ অর্জিত হয়।

সেখানকার অধিকাংশ মানুষ জুরজিরের জুলুম-নির্যাতন এবং রোমানদের কঠোরতার মুখে করুণ জীবনযাপন করছিল। তারা ইসলামের সৌন্দর্য দেখে দলে দলে ইসলাম কবুল করতে থাকে। কোনো কোনো এলাকার লোকেরা যুদ্ধ ব্যতীতই সন্ধি করে ফেলে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. এর উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং এ ধর্মের বিজয় সাধন আর যুদ্ধ ছাড়া বড়মাত্রায় সেটা ইতিমধ্যে অর্জিত হয়ে গিয়েছিল; তাই তিনি আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন।[৩৪৯]

জুরজির মুসলমানদের এ বিজয় কীভাবে সহ্য করবে? সে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকে। এইদিকে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পরিকল্পনা করছিলেন। ২৭ হিজরিতে তিনি উসমান রা. কে নিজের পরিকল্পনার কথা

---

[৩৪৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২২৫

জানান। তার নিকট সেখানে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এটা অসাধারণ এক বিষয় ছিল, যাতে বিজয় অর্জিত হলে মরক্কো পর্যন্ত ইসলামি পতাকা উড্ডীন হতে পারে; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেলে মিসরও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

অন্যান্য খলিফার মতো হজরত উসমান রা. মসজিদে নববিতে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধারাবাহিক পরামর্শ করতেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও পরামর্শসভায় উত্থাপন করা হয়। অধিকাংশ সদস্য এই অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন।

হজরত উসমান রা. অভিযানের গুরুত্বের বিষয়টি লক্ষ রেখে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসসহ কয়েকজন প্রবীণ সাহাবিকে তাদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। মিসরের মুসলমানগণ অস্থিরভাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা মার্চ করে বারকা নামক স্থানে পৌছান। এখানে হজরত উকবা বিন নাফে রহ. সীমান্তবর্তী সৈন্যদের সাথে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকে ত্রিপলি পর্যন্ত এলাকা হজরত আমর ইবনুল আস রা. উমর ফারুক রা. এর শাসনকালে জয় করেছিলেন।

মুসলমানরা ২০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে এ সীমানা থেকে অগ্রসর হয়ে জুরজিরের এলাকায় প্রবেশ করেন। সে আপন রাজধানী সুবাইতিলা থেকে এক মঞ্জিল সামনে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।

অবশেষে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। জুরজিরের বাহিনী মুসলমানদের ছয় গুণ বেশি ছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের দেখে সামান্য পরিমাণও ভীত হননি। কেননা কাদিসিয়া এবং ইয়ারমুকের ফল প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, সৈন্যসংখ্যা কম ও বেশির মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয় না; বরং ঈমান এবং জিহাদের স্পৃহার মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়ে থাকে।

যুদ্ধের পূর্বে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. জুরজিরের নিকট ইসলাম কবুল করার কিংবা জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব রাখেন। সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে তুমুল লড়াই শুরু হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত থাকে। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত লড়াই হতো। এরপর উভয় দল নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসত।

হজরত উসমান রা. এ যুদ্ধের ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। এর মধ্যেই তার পক্ষ থেকে তাজাদম সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছয়। পঁচিশ বছরের যুবক হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে এর নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন। যেহেতু শিশুকাল থেকেই তার বরকতের কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল এজন্য মুসলমানরা তাকে দেখে অভ্যর্থনা জানিয়ে জোরে তাকবির দিতে লাগলেন। এই তাকবিরধ্বনি শুনে জুরজির ভীত হয়ে পড়ে। সে এই তাকবিরের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হয়, মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছেছে। জুরজির এতে ভীষণ পেরেশান হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য সে ঘোষণা করে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমির আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহকে হত্যা করতে পারবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেব। পাশাপাশি তাকে ১ লক্ষ আশরাফি পুরস্কার দেব।

এই ঘোষণার ফলে তার বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক স্পৃহা তৈরি হয়।

মুসলমানরা এ বিষয়টি জানতে পারলে তারা নিজেদের আমিরের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. সতর্কতাবশত একদিন যুদ্ধের ময়দানে অনুপস্থিত থাকেন। এই সময়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য সেনাপতিকে পরামর্শ দেন যে, আপনিও ঘোষণা দিয়ে দিন, যে ব্যক্তি জুরজিরকে হত্যা করতে পারবে জুরজিরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। তাকে ১ লক্ষ আশরাফি পুরস্কার দেব এবং তাকে জুরজিরের এলাকার শাসক নিযুক্ত করব। এই পরামর্শটি সেনাপতির পছন্দ হয়। তিনি এই ঘোষণা দেওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়। এর ফলে জুরজিরের বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

কয়েকদিন পর্যন্ত যুদ্ধের কোনো ফয়সালা হচ্ছিল না। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. যুদ্ধের কৌশলে পরিবর্তন আনার লক্ষে পরামর্শ দেন যে, আগামীকালের যুদ্ধে আমরা কিছু সৈন্য তাঁবুতে রাখবো। যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন এই তাজাদম সৈন্য এসে ক্লান্ত শত্রুর উপর আক্রমণ করবে।

কমান্ডাররা সকলে এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহও এই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

রীতিমতো সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। নির্বাচিত কিছু অশ্বারোহীকে তাঁবুতে আরাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সূর্য হেলে যাওয়ার সময় যখন উভয়পক্ষের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করতে থাকে, তখনও হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি যুদ্ধ শুরু করার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। অবশেষে বিকালে যখন উভয়পক্ষের সৈন্যরা বেহাল হয়ে যায় তখন আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কিছু বাহাদুর মুজাহিদ নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের কাতার লন্ডভন্ড করে তাদেরকে পেছন দিকে তাড়িয়ে দেন। জুরজির সেখানে ঘোড়ার উপর বসে ছিল। দুজন বাঁদি তাকে বাতাস দিচ্ছিল। জুরজির এবং তার দেহরক্ষীরা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে অশ্বারোহীসহ আসতে দেখে মনে করে যে, হয়তো শত্রুদের কোনো দূত আসছে। তাই সে পলায়ন কিংবা প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করেনি। কিন্তু একটু পর তাদেরকে হাতিয়ার কোষমুক্ত করতে দেখে সে ঘাবড়ে যায়। জুরজির ঘোড়া হাঁকিয়ে পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. তার নিকট পৌছে যান। তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডুপাত করেন। মাথাটি বর্শার মাথায় লাগিয়ে তাকবিরধ্বনি দিয়ে দ্রুত ফিরে আসেন।

বাদশাহকে নিহত হতে দেখে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। গোটা বাহিনী পলায়ন শুরু করে। তাদের শাহজাদিকে গ্রেফতার করা হয়। ওয়াদা অনুযায়ী হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর নিকট তাকে সোপর্দ করা হয়। মুসলিমবাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে রাজধানী সুবাইতিলা নিয়ন্ত্রণে নেন। আশপাশের কয়েকটি দুর্গ জয় করেন।

এই বিজয়াভিযানে স্থানীয় শাসকদের ধনভাণ্ডার থেকে বহু মালপত্র গনিমত হিসেবে অর্জিত হয়েছিল। তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, বিজয়ী বাহিনীর ২০ হাজার সৈনিকের প্রত্যেকের অংশেই কমপক্ষে ১ হাজার দিনার পড়েছে।[৩৫০]

---

[৩৫০] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৬২-৪৬৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/২২৬, ২২৭ পঁচিশ গ্রাম স্বর্ণের মাধ্যমে এক দিনার তৈরি হয়ে থাকে। এই হিসেবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈনিক ১ কোটি রুপি বা ১ লক্ষ ডলারের বেশি অর্থ পেয়েছিলেন।→

হজরত মুয়াবিয়া হজরত উমর ফারুক রা. এর জমানার প্রথম দিকে দামেশকের শাসক ছিলেন। হজরত উমর রা. তাকে পদোন্নতি দিয়ে গোটা শামের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এভাবে তার কাজের পরিধি মিসর সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল।[৩৫১]

ওয়াকিদি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত উসমান রা. এ গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে রাখার পরিবর্তে আলে হাকাম তথা মারওয়ান এবং তার বংশধরকে প্রদান করেছিলেন।[৩৫০]

কতক বর্ণনায় আছে যে, এই এক-পঞ্চমাংশ তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ রা. কে প্রদান করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন জাগে, এ ঘটনা কার সাথে সংঘটিত হয়েছে? মারওয়ানের সাথে নাকি আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহর সঙ্গে?

আল্লামা ইবনুল আসির রহ. এর উত্তর দিয়েছেন যে, এমন ঘটনা দুবার হয়েছিল। একবার মারওয়ানের সাথে, আরেকবার আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. এর সাথে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, হজরত উসমান রা. এর জন্য এ সম্পদ বাইতুল-মাল ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করার কোনো অধিকার ছিল কি না? এটা কি আমানতের অপব্যবহার নয়?

আল্লামা ইবনুল আসির বলেন, গনিমতের সম্পদকে মারওয়ান ৫ লক্ষ দিনারে ক্রয় করেছিল।[৩৫০]

আর আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. কে আফ্রিকার গনিমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া হয়নি; বরং সেই এক-পঞ্চমাংশের একটি অংশ তাকে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তাকে পুরস্কার হিসেবে পঁচিশ ভাগের এক ভাগ প্রদান করা হয়েছিল। কেননা আফ্রিকার অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল। এ অভিযানে তার মনোবল বৃদ্ধি করতে পূর্ব থেকেই এই পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

হজরত উসমান রা. এর ব্যাপারে এই বিষয়গুলো বেশ বাড়িয়ে-চড়িয়ে রটানো হয়েছিল। এগুলো শুনে লোকজন হয়রান হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা তখন হজরত উসমান রা. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সন্দেহ দূর করে বলেন, আমি আবদুল্লাহকে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ অর্থাৎ পঁচিশ ভাগের এক ভাগ প্রদান করেছি। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবৈধ কিছু নয়। এই ধরনের পুরস্কার হজরত আবু বকর এবং হজরত উমরও দিতেন। লোকেরা যখন এ ব্যাপারে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে তখন তিনি সেই পুরস্কার ফেরত নিয়ে নেন।

এটাও রটানো হয়েছিল যে, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে মারওয়ান বিন হাকামকে পনেরো হাজার পুরস্কার প্রদান করেছেন। তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে তাকে দিয়েছি। লোকেরা তখন শান্ত হয়। (তারিখুত তাবারি, ৪/৩৪৫)

নোট : হজরত উসমানের উপর আপত্তি এবং তার বিস্তারিত জবাব দ্বিতীয় খণ্ডে আসবে।

[৩৫১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৫৫

হজরত উসমান রা. তাকে এই পদে বহাল রাখেন। শামের অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্তের বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ছিল। গ্রীষ্মের মৌসুমে রোমানদের সাথে জিহাদের জন্য তিনি সৈন্য প্রেরণ করতেন। তাদের জানমালের ক্ষতি করে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য বহাল রাখতেন।

আফ্রিকায় হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহর বিজয়ের পর হজরত মুয়াবিয়া রা. জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্ণতাদানের জন্য তিনি হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. কে প্রেরণ করেন। তিনি মরক্কোর সীমান্তবর্তী কামুনিয়্যাহ (সুস)-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা জয় করেন।[৩৫২]

---

[৩৫২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৬৫

সমুদ্রাভিযান

এশিয়া মাইনর এবং আফ্রিকায় রোমানদের সাথে বারবারদের যুদ্ধের পেছনে কোনোভাবে অবশ্যই ইউরোপের হাত ছিল। ইসলামের শত্রুদের তারা হয়তো সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। রোম উপসাগরে বাইজেন্টাইন নৌবাহিনীর পদচারণা মুসলমানদের জন্য অবশ্যই বিপদের কারণ ছিল। তাই এখন সমুদ্রকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রোম উপসাগরে ইউরোপিয়ানদের মোকাবেলা করাটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এজন্য নৌবাহিনী গঠন করা আবশ্যক ছিল।

শামের তীরবর্তী অঞ্চলে হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, মিসরে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ এই প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-ও এই বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ২৮ হিজরির রজব মাসে হজরত মুয়াবিয়া রা. উসমান রা. এর নিকট নৌ-অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, যুদ্ধটি তেমন কঠিন হবে না। তখন খেলাফতের পক্ষ থেকে এ যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়; কিন্তু যেহেতু এটা ইসলামের প্রথম নৌবাহিনী ছিল, এজন্য হজরত উসমান গনি রা. মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। তিনি শর্তারোপ করেন যে, মুজাহিদরা নিজেদের সাথে স্ত্রীদেরও নিয়ে যাবে। মুজাহিদরা যাতে নিছক আবেগ-স্পৃহার বশে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে; বরং যথাসম্ভব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নেয় এজন্য তিনি এই শর্তারোপ করেছিলেন। পাশাপাশি এই হেকমতও বিদ্যমান ছিল যে, যেহেতু এটি প্রথম সমুদ্রাভিযান ছিল; তাই স্বাভাবিকভাবেই এতে প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি চলে আসতে পারে। এ সময় স্ত্রীরা সাথে থাকলে তারা পুরুষদের মনোবল ঠিক রাখতে পারবেন।

মুয়াবিয়া রা. অনুমতি পাওয়ামাত্র ভালোমানের নৌযান তৈরি করেন। এ জিহাদের জন্য তিনি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবক যুবকদের ভর্তি

করেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. ও হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. রোম উপসাগরের নকশা এবং ইউরোপিয়ান জাহাজগুলোর আনাগোনা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তারা মিসর এবং সিরিয়ার উপকূলবর্তী দুর্গ ব্যতীতও রোম উপসাগরের মাঝামাঝি মুসলমানদের কোনো হেডকোয়ার্টার থাকার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এজন্য তারা কুবরুস ভূখণ্ডকে নির্বাচন করেন, যা উত্তর শামের সীমান্তে বাইজেন্টাইনদের গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনির সন্নিকটেই ছিল।

২৮ হিজরির বসন্তকালে হজরত মুয়াবিয়া রা. নৌসেনাপতি আবদুল্লাহ বিন কায়েসের সাথে শামের উপকূল আক্কায় প্রথম নৌবাহিনী নিয়ে সমুদ্রসফর শুরু করেন। তার সঙ্গে স্ত্রী হজরত ফাখিতা বিনতে কুরাইজা রা. ছিলেন। এমনিভাবে হজরত উবাদা বিন সামেত রা. আপন স্ত্রী হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. কে সঙ্গে নিয়ে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে শামিল হন।[৩৫৩]

হজরত আবু তালহা রা. তখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তেলাওয়াত করতে করতে তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছান-

> انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
>
> তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।[৩৫৪]

এ আয়াত পড়ামাত্র তিনি এ জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকদের বলতে থাকেন, আমার মনে হচ্ছে, আমার রব চাচ্ছেন, আমরা বৃদ্ধ বা যুবক যাই হই না কেন, আমরা যেন জিহাদের জন্য বের হয়ে যাই। হে সন্তানেরা, আমার সামানা প্রস্তুত করে দাও। আমিও জিহাদে যাব।

সন্তানরা যুবক ছিল। তারা বলল, আব্বাজান, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদ

---

[৩৫৩] ফুতুহুল বুলদান, ১৫৩, ১৫৪

[৩৫৪] সুরা তাওবা, আয়াত ৪১

করেছেন, এরপর হজরত আবু বকর, হজরত উমর-এর যুগে জিহাদ করেছেন। এখন আপনি এখানে অবস্থান করুন। আপনার স্থলে আমরা জিহাদ করব। তিনি তাদের কথা মানতে নারাজ ছিলেন। যুদ্ধে শরিক হয়ে যান। হজরত আবু তালহা এ সফরেই জাহাজে মৃত্যুবরণ করেন। দাফন করার মতো আশপাশে কোনো উপকূল ছিল না। ন'দিন পর উপকূল দেখা যায়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এ দীর্ঘ সময়েও তার মৃতদেহ একদম তরতাজা ছিল।[৩৫৫]

এটাই ছিল সেই জিহাদ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যার দৃশ্য স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে আমি জাহাজে করে সমুদ্রে এমন অবস্থায় সফর করতে দেখেছি, যেমনভাবে বাদশাহ তার সিংহাসনে বসে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ স্বপ্নের কথা শুনে হজরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ যুদ্ধে শামিল হওয়ার আবেদন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ তামান্না পূরণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনিও এ অভিযানে শামিল ছিলেন। ফেরার সময় এক স্থানে তার খচ্চর লাফিয়ে উঠলে তিনি পড়ে যান। তার ঘাড়ের হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩৫৬]

মুসলিমবাহিনী কুবরুসের তীরে অবতরণ করলে স্থানীয় সৈন্যরা হাতিয়ার ফেলে দেয়। তাদের সাথে নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি হয়।

১. কুবরুসবাসী জিজিয়া হিসেবে প্রতিবছর ৭০ হাজার দিনার প্রদান করবে।

২. মুসলমানগণ তাদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেবে।

৩. কুবরুসবাসী রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সমুদ্রাভিযানে গমনাগমনের সুযোগ প্রদান করবে।

---

[৩৫৫] মুসতাদরাকে হাকিম, ২৫০৩; তাফসিরে ইবনে আবি হাতেম, ২৫/২২০; সুরা তাওবা।

[৩৫৬] সহিহ বুখারি, ২৭৮৮; আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৬৮-৪৭০

৪. মুসলমানদেরকে রোমানদের আনাগোনা সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করবে।[৩৫৭]

এই সন্ধি চার বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। সন্ধির সময়সীমা শেষ হওয়ামাত্র ৩২ হিজরিতে হজরত মুয়াবিয়া রা. কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি এশিয়া মাইনরের উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণ উপসাগরের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এরপর তিনি আবনায়ে কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু গাড়েন। সেখান থেকে রোম সম্রাটের রাজধানীর প্রাচীর সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।[৩৫৮]

---

[৩৫৭] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৬৯

[৩৫৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৪৩

এটাই কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে মুসলমানদের প্রথম অভিযান ছিল। এই সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এর পূর্বেই মুসলমানদের দ্বিতীয়বার কুবরুস অভিমুখে যাত্রা করতে হয়। মুহাক্কিকদের মতে উম্মে হারাম রা. থেকে বর্ণিত হাদিস,

أوَّلُ جَيْشٍ مِن أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لهم،

আমার উম্মতের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম রোমান সম্রাটের শহর অভিমুখে জিহাদে বের হবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এ হাদিস দ্বারা এই অভিযানই উদ্দেশ্য। কেননা কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে এটাই ছিল প্রথম অভিযান। এ অভিযানের কিছুদিন পূর্বে উম্মে হারাম জিহাদের সফরেই ইনতেকাল করেন। আর রাসুল সা. ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন উম্মে হারাম জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। হাদিসের কিছু অংশ গত হয়েছে। পুনরায় আমরা পূর্ণ হাদিসটি সামনে রাখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

أوَّلُ جَيْشٍ مِن أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ قدْ أوْجَبُوا، قالَتْ أُمُّ حَرامٍ: قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ أنا فيهم؟ قالَ: أنْتِ فيهم، ثُمَّ قالَ النبيُّ ﷺ: أوَّلُ جَيْشٍ مِن أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لهمْ، فَقُلتُ: أنا فيهم يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: لا.

আমার উম্মতের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম সমুদ্রে জিহাদে বের হবে তাদের জন্য জান্নাত বা মাগফেরাত আবশ্যক। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি তাদের মধ্যে রয়েছি? রাসুল সা. বললেন তুমি তাদের মধ্যে রয়েছে। এরপর তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম রোমান সম্রাটের শহরের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কি তাদের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, না। (সহিহ বুখারি, ২৯২৪)

রোম সম্রাট কনস্টান্টিন আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরে মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয় ও সফলতার কারণে অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত ছিল। সে আপন দুর্গ থেকেই মুসলিমবাহিনীর তাঁবু দেখতে পাচ্ছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সে কুবরুসবাসীদের সাথে যোগসাজশ শুরু করে। কুবরুসবাসীরা ওয়াদা ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানদের সহযোগিতা করে। তাদেরকে যুদ্ধজাহাজ প্রদান করে।

এই খবর পেয়ে মুয়াবিয়া রা. ৫০০ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে কুবরুসবাসীর উপর হামলা করেন। তিনি তরবারির মাধ্যমে পুরো কুবরুস জয় করে নেন। এখানে তিনি ১২ হাজার মুজাহিদকে পরিবার-পরিজনসহ আবাদ করেন। তারা এখানে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। এইভাবে কুবরুস রোমসাগরের পাশেই মুসলমানদের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৩২ হিজরিতে কুবরুস দ্বীপ বিজিত হয়।

যাতুস সাওয়ারা (মাস্তুল) যুদ্ধ

হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনকালের সবচেয়ে বড় এবং বিপজ্জনক যুদ্ধ হলো জাতুস সাওয়ারার যুদ্ধ, যা ৩৪ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে। সাওয়ারা সারিআতুন-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো জাহাজের মাস্তুল তথা পাল। এই যুদ্ধে যেহেতু উভয় পক্ষের সৈন্যরা জাহাজের মাস্তুল বেঁধে লড়াই করেছে এজন্য যুদ্ধটিকে জাতুস সাওয়ারা বলা হয়। অর্থাৎ এটি মাস্তুলের লড়াই।

ঘটনাটি হলো রোমান সম্রাট তার বুকের উপর মুসলিম-বিজেতাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভালোরকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সে এক বিশাল নৌবাহিনী প্রস্তুত করে তোলে। বলা হয়, এতে অংশগ্রহণকারী জাহাজের সংখ্যা ছিল ৫০০ থেকে ৬০০।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, রোমানরা ইতিপূর্বে এমন বিশাল সৈন্যসমাবেশ আর ঘটায়নি। এর মাধ্যমে রোমান সম্রাট পারস্যসাগরে চিরদিনের জন্য মুসলমানদের কর্তৃত্ব খতম করে দিতে চাচ্ছিল। অবশেষে সে এই অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি নিয়ে রোমসাগরে অবতীর্ণ হয়। অপরদিকে সে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীর দিয়ে স্থলভাগেও সৈন্য নিয়ে সামনে বাড়তে থাকে।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র হজরত মুয়াবিয়া রা. শাম থেকে এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ মিসর থেকে নিজেদের সামরিক শক্তি একত্র করেন। বাইজেন্টাইনরা ইসলামি ভূখণ্ডের তীরে অবতরণ করার পূর্বেই মুসলমানরা সমুদ্রের বুক চিরে তাদের সামনে পৌঁছান। কুবরুস এবং রোডস দ্বীপের মাঝামাঝি অবস্থিত তুর্কি তীর কিলিকিয়ায় এক রাতে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়।

মুজাহিদদের জাহাজসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। এই বাহিনী মাত্র কয়েক বছর পূর্বে তৈরি করা হয়েছিল। যার ফলে নাবিকদের জাহাজ পরিচালনার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। আবার মুজাহিদদেরও সমুদ্রযুদ্ধের তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। অপরদিকে বাইজেন্টাইনরা শত শত বছর যাবৎ সমুদ্রে অভিযান পরিচালনা করে আসছিল। তাদের জাহাজ চালনার যশখ্যাতির কথা গোটা দুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের নৌবাহিনী মুসলমানদের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড় ছিল।

তখন পর্যন্ত মুসলিম নৌবাহিনীর যুদ্ধের কার্যক্রম বলতে এতটুকুই ছিল যে, তারা সমুদ্রে সফর করে কোনো তীরে অবতরণ করতেন। সেখানে লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা শহর জয় করতেন। কিন্তু এবার সমুদ্রের উত্তাল ঢেউই হলো লড়াইক্ষেত্র। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে পূর্ণ হিম্মতের সাথে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন।

পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল রাতে কেউ কারো উপর কোনো ধরনের আক্রমণ করবে না। রাতভর মুসলমানগণ নামাজ, দোয়া, তেলাওয়াতে মগ্ন থাকেন। অপরদিকে বাইজেন্টাইনরা সামুদ্রিক নাকাড়া বাজাতে থাকে।

ভোর হলে মুজাহিদদের আমির হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. জাহাজের মাস্তুলগুলো একটি অপরটির সাথে বেঁধে সারি বানানোর নির্দেশ দেন। তিনি মুজাহিদদেরকে সবসময় তেলাওয়াত এবং জিকিরে মশগুল থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বাতাসের গতি মুসলমানদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাতাস তখন মুসলমানদের প্রতিকূলে আর রোমানদের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছিল। ফলে তাদের জাহাজগুলো পাল খুলে দ্রুতগতিতে মুসলমানদের দিকে ধেয়ে আসতে পারছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জাহাজগুলো অগ্রসর হতে চাইলে পাল খোলা

তাদের জন্য অধিক ক্ষতিকর ছিল। কেবল বৈঠা চালিয়ে সাধারণ গতিতেই জাহাজগুলোকে আগে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল। এটা দেখে মুসলিম সেনাপতি জাহাজ নোঙর করার নির্দেশ দেন।

শত্রুদের জাহাজগুলো এগিয়ে আসছিল। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এক সময় আকস্মিকভাবে বাতাস মুসলমানদের অনুকূলে এসে যায়। তাদের হিম্মত ও সাহস বৃদ্ধি পেয়ে যায়। হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ প্রতিপক্ষকে তীরে অবতরণ করে তরবারির মাধ্যমে হার-জিতের ফয়সালা করার প্রস্তাব রাখেন।

বাইজেন্টাইন-কমান্ডার ধারণা করে মুসলমানরা হয়তো অনভিজ্ঞতার দরুন সমুদ্রযুদ্ধের ব্যাপারে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। তাই সে দম্ভভরে উত্তর দেয় 'যুদ্ধ সমুদ্রে হবে, সমুদ্রে!'

এই উত্তর শুনে হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. নোঙর উঠিয়ে নেওয়ার এবং পাল খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের যুদ্ধজাহাজগুলো রোমানদের দিকে অগ্রসর হয় এবং দেখতে দেখতে প্রথম শতাব্দীর মাঝি-মাল্লারা নিজেদের জাহাজগুলো প্রতিপক্ষের জাহাজের সাথে মিলিয়ে দেন। এর সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের সেনারা তরবারি এবং খঞ্জরের মাধ্যমে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুসলমানরা সমুদ্রে এমন যুদ্ধ করেন, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। হাজার হাজার মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রে পড়তে থাকে। সমুদ্রের পানি রক্তে লাল হয়ে যেতে থাকে। হাজার হাজার মুসলমান শহিদ হন। কিন্তু রোমানদের ক্ষতি এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিল। এর মধ্যেই সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। উভয়পক্ষের জাহাজ খরকুটোর মতো দুলতে থাকে। ততক্ষণে মুসলমানরা রোমানদের বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে মৃত্যুর ঘাটে উপনীত করে দিয়েছেন। এর মধ্যেই সম্রাট কনস্টানটিন নিজেও আহত হন। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এক গৌরবময় বিজয় দান করেন। মুসলমানরা পার্শ্ববর্তী উপকূলে অবতরণ করেন। রোমানদের

নিহত লাশগুলো ভেসে ভেসে তীরে আসতে থাকে। এমনকি জায়গায় জায়গায় লাশের স্তূপ হয়ে যায়।[৩৫৯]

এক মতানুযায়ী এই যুদ্ধটি ৩১ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা

হজরত উসমান গনি রা. কয়েক বছর থেকে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপর কার্যকর আক্রমণ করার সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। যেহেতু কনস্টান্টিনোপল জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের জন্য হাদিসে ক্ষমা এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তা জয় করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। হজরত মুয়াবিয়া রা. ইতিপূর্বে কনস্টান্টিনোপল উপকূল পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সমস্যা হলো শহরটি তিন দিক থেকেই সমুদ্র-ঘেরা ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা এটা বুঝা যাচ্ছিল যে, শহরটিতে এই দিক থেকে আক্রমণ করাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু হজরত উসমান গনি রা. অত্যন্ত উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রথমে পুরো ইউরোপ জয় করে স্থলভাগ দিয়ে উত্তর দিক থেকে কনস্টান্টিনোপল ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি একটি নকশা প্রস্তুত করেন। প্রথমেই স্পেন এরপর ফ্রান্স এরপর পশ্চিম ইউরোপে অভিযান পরিচালনা করা হবে। এরপর পূর্ব ইউরোপকে আয়ত্তে এনে কনস্টান্টিনোপল পৌছাতে হবে। এ ভিত্তিতে উসমান রা. আফ্রিকার সিপাহসালার হজরত উকবা বিন নাফেকে চিঠি লেখেন, 'আন্দালুসের পথ ধরে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা যেতে পারে।'[৩৬০]

মুসলিমবাহিনী ওই সময় মরক্কো পর্যন্ত ভূখণ্ড নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। স্পেন এবং মরক্কোর মাঝে শুধু সমুদ্র প্রতিবন্ধক ছিল। ইতিপূর্বে হজরত উসমান গনি রা. এর নির্দেশে ২৭ হিজরিতে আফ্রিকার ইসলামি বাহিনী সমুদ্র অতিক্রম করে স্পেনে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মুসলমানরা তখন বিজয়ী হয়েই ফিরে এসেছিলেন। এই

---

[৩৫৯] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৮৮-৪৮৯, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/২৩৭-২৩৯

[৩৬০] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৬৬

অভিযানটি অবশ্য রীতিমতো যুদ্ধের নীতিমালা অনুযায়ী সংঘটিত হয়নি। এতে কোনো এলাকা বিজয় করাও উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এটি গেরিলা পর্যায়ের আক্রমণ ছিল। এর মাধ্যমে শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করা উদ্দেশ্য ছিল।

এটাই ইউরোপে মুসলমানদের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল। যদি হজরত উসমান রা. কে এরপর অভ্যন্তরীণ ফেতনার সম্মুখীন না হতে হতো তা হলে সম্ভবত কনস্টান্টিনোপল এবং তার পূর্বে গোটা ইউরোপ ওই সময়ে পদানত হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ৩৩ হিজরির পর থেকে অভ্যন্তরীণ ফেতনা জিহাদের এই ধারাকে এমনভাবে বন্ধ করে দেয় যে, এই কারণে এক দশক পর্যন্ত মুসলিম ভূখণ্ডের সীমারেখা বিস্তৃত হতে পারেনি।

পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্র

উসমান রা. এর শাসনকালে পশ্চিম দিকের পাশাপাশি পূর্ব দিকেও বিজয়ের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৯ হিজরিতে বসরাবাসী বিদ্রোহ করলে তৃতীয় খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত নতুন প্রশাসক হজরত আবদুল্লাহ বিন আমেরের সামনে আপন অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ এসে যায়। তিনি বসরা থেকে পারস্যের হেডকোয়ার্টার ইসতাখারে অভিযান পরিচালনা করেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করে দেন। এর মাধ্যমে তিনি পারস্যকে ইসলামি শাসনের অধীনে বহাল রাখেন।[৩৬১]

৩০ হিজরিতে কাসপিয়ান সাগরের নিকটবর্তী তাবারিস্তানে জিহাদ সংঘটিত হয়। কুফার শাসক হজরত সাঈদ বিন আস রা. এখানে অভিযান পরিচালনা করেন। হজরত হাসান, হজরত হুসাইন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হজরত হুযাইফা ইবনুল ইয়েমেন রা. এর মতো বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তার সঙ্গে ছিলেন। লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা তাবারিস্তান আয়ত্তে নিয়ে আসেন।[৩৬২]

এইদিকে ইয়াজদাগিরদের মৃত্যুর পর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের আশপাশের এলাকা জয় করে পারসিক ফেতনাবাজদের দুর্গ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ফয়সালা করেন। তিনি ৩১ হিজরিতে বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় করে নিশাপুর অবরোধ করেন। এক মাস পর নিশাপুরের শাসক সন্ধি করে নেয়।[৩৬৩]

---

[৩৬১] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৭৩, ৪৭৪
[৩৬২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৮০, ৪৮১
[৩৬৩] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৯০-৪৯৪

ইয়াজদাগিরদের মৃত্যু হলো কীভাবে?

সাসানি রাজবংশের সর্বশেষ শাহজাদা পারস্যের সাবেক বাদশাহ ইয়াজদাগিরদ পাঁচ বছর যাবৎ সিজিস্তানে (দক্ষিণ আফগানিস্তান) আত্মগোপন করে ছিল। উমর ফারুক রা. এর যুগে পারসিকদের সর্বশেষ পরাজয়ের পর সে ইসফাহানে আশ্রয় নেয়। সেখানকার পরিস্থিতি নাজুক হয়ে গেলে সে রায় শহরে চলে যায়। তাবারিস্তানের গভর্নর উপস্থিত হয়ে তাকে নিজের দুর্গে আসার দাওয়াত দেয়। কিন্তু ইয়াজদাগিরদ দাওয়াত কবুল না করে সিজিস্তান চলে যায়। মুসলমান সৈনিকরা তখনও তাকে তালাশ করছিলেন।

ইয়াজদাগিরদ তখন সিজিস্তানবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে মার্ভের দিকে যাচ্ছিল। তার সাথে এক হাজার লোকের ছোট্ট একটি বাহিনী এবং কয়েকজন আমির ছিল। মার্ভে পৌঁছে সে স্থানীয় অগ্নিপূজক শাসক মাহওয়াই এবং তার আমির থেকে আর্থিক সহায়তা চায়। কিন্তু তারা সাসানিদের পূর্বের জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ রাজনীতির কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। তারা কেবল সাহায্য করতেই অস্বীকৃতি জানায়নি; বরং তুর্কমানদের ডেকে ইয়াজদাগিরদের কাফেলার উপর আক্রমণ করে। ইয়াজদাগিরদের সকল সঙ্গী মারা যায়। সে ঘোড়া হাঁকিয়ে একাকী জঙ্গলের দিকে পলায়ন করে। এটা ৩১ হিজরির ঘটনা।

এক সময় তার আহত ঘোড়া রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে। সে পায়ে হেঁটে চলতে বাধ্য হয়। এই নিঃস্ব অবস্থায় সে মুরগাব নদীর তীরে মার্ভ থেকে দুই ফরসখ (প্রায় ১০ কিলোমিটার) দূরত্বে অবস্থিত এক পানির চাক্কির নিকট পৌঁছে। তার শাহি পোশাক, বাদশাহি মুকুট দেখে চাক্কির মালিক পেরেশান হয়ে যায়। সে তাকে নিজের কাছে আশ্রয় প্রদান করে। এর মধ্যেই মার্ভের শাসক মাহওয়াইহ ইয়াজদাগিরদের সন্ধান পেয়ে যায়। সে তার মুণ্ডুপাত করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। সৈন্যরা প্রথমে চাক্কির মালিককে প্রহার করে ইয়াজদাগিরদের তথ্য জানতে চায়। এরপর তাকে নিয়ে যায় পানি চাক্কির কুঠরীতে, ইয়াজদাগিরদ যেখানে আত্মগোপন করেছিল।

সৈনিকরা মালিককে বলে, তুমি ভেতরে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসো।

সে ভেতরে গিয়ে দেখে ইয়াজদাগিরদ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কাবু করার চেষ্টা করলে ইয়াজদাগিরদ উঠে বসে। সে চাক্কির মালিককে বলে, আমার এই আংটি এবং চুরি নিয়ে যাও। কিন্তু আমাকে কিছু বলো না।

চাক্কির মালিক এগুলোর মূল্য জানত না। সে বলে আমাকে চার দিরহাম দাও তা হলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।

ইয়াজদাগিরদের নিকট কোনো দিরহাম ছিল না। সে নিজের একটি অলংকার খুলে তাকে দিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকেরা তলোয়ার কোষমুক্ত করে ভেতরে প্রবেশ করে। ইয়াজদাগিরদ কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে, আমাকে হত্যা করো না! চাইলে তোমরা আমাকে তোমাদের বিচারকের নিকট হাওয়ালা করো কিংবা আরবদের নিকট সোপর্দ করে দাও!

সৈনিকরা তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তার মরদেহ মুরগাব নদীর ঢেউয়ে ফেলে দেয়। এই মরদেহ স্থানীয় এক পাদরি নদীর তীরে ঝোপঝাড়ে আটকে থাকতে দেখে নিজেদের রীতি অনুযায়ী দাফন করে দেয়। এভাবে সাসানি রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাটের মৃত্যু শিক্ষার উপকরণ হয়ে থাকে। তার মৃত্যুর মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের দাস্তানের পরিসমাপ্তি ঘটে। আজ তা বিস্মৃতির এক অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তার মৃত্যু আজ অবধি পৃথিবীর প্রতাপশালী ও শান-শওকতের অধিকারী ব্যক্তিদের ধ্বংসের কথাই প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৬৪]

খোরাসান বিজয়

নিশাপুরের পর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. সারখাসকে তরবারির মাধ্যমে এবং তুসকে সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন। এরপর হেরাত এবং বাগদিসও তার সামনে মাথা নত করে। মার্ভের অগ্নিপূজক শাসক বার্ষিক ২২ লক্ষ দিরহাম জিজিয়া হিসেবে প্রদানের শর্তে সন্ধি করে। এরপর হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. তার সুদক্ষ জেনারেল হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. কে সামনে অগ্রসর করেন, যিনি বলখ, জুযাজান, ফারইয়াব, তাখারা এবং তালিকানের মতো দুর্গম অঞ্চল

---

[৩৬৪] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৯০-৪৯৪

যুদ্ধবাজ তুর্কি এবং অগ্নিপূজকদের থেকে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করেন। এসব অঞ্চলে তিনি ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। এর মধ্যে কিছু কিছু এলাকায় যুদ্ধ করতে হয়নি, তা কেবল সন্ধির মাধ্যমেই বিজিত হয়েছিল। তেমনিভাবে কিরমান, সিজিস্তান, যারানজ, কান্দাহার, যাবুল, গজনি এবং কাবুল একের পর এক পদানত হতে থাকে। এ সকল বিজয়াভিযানে হজরত আকরা বিন হাবেস, হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা, হজরত মুজাশি বিন মাসউদ, হজরত আবদুল্লাহ বিন খাযেম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো মহান ইসলামি সেনাপতিগণ সামনের কাতারে ছিলেন।

মোটকথা হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. এবং তার সেনাপতিগণ এক-দেড় বছরের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলে ইসলামি শাসন কর্তৃত্বের সীমানা শুধু গজনি এবং কাবুল পর্যন্তই পৌঁছে দেননি; বরং হিন্দুস্থানের সীমানা পর্যন্ত তাদের এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে।[৩৬৫] তেমনিভাবে হজরত উসমান গনি রা. এর বরকতময় শাসনকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা হিন্দুস্থানের সীমান্ত থেকে নিয়ে উত্তর আফ্রিকার উপকূল এবং রোম উপসাগরে পূর্ব ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা সাড়ে ২২ লক্ষ বর্গমাইল (৩৬ লক্ষ ২১ হাজার বর্গকিলোমিটার) বিস্তৃত ছিল। আর হজরত উসমান রা. এর শাসনকালে তা ৪৪ লক্ষ বর্গমাইল (৭০ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গকিলোমিটার) বিস্তৃত হয়।[৩৬৬]

এভাবে তৃতীয় খলিফার মোবারক জমানায় এক বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড কুফুর-শিরক থেকে মুক্ত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নোট

হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনকালে বিরোধীদের আন্দোলন, পর্দার পেছনে থাকা সাবাইদের ষড়যন্ত্র এবং হজরত উসমান গনি রা. এর মর্মান্তিক শাহাদাতের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে হাজির করা হবে।

---

[৩৬৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৯৩-৪৯৬

[৩৬৬] মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকি শহিদ কৃত হজরত উসমান যুন্নুরাইন, ২, ৮

খেলাফতে রাশেদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

খেলাফতে রাশেদায় রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিমালা

এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম এক মৌলিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। কুরআন-সুন্নাহতে তা বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান। রাষ্ট্রপরিচালনার উদ্দেশ্য, ক্ষমতার পালাবদল এবং আইনপ্রণয়ন থেকে নিয়ে শাসক নিয়ুক্তি ও পদচ্যুতি পর্যন্ত সকল বিষয় তাতে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ব্যবস্থাপনাগত নতুন নতুন পন্থা অবলম্বনের প্রশ্নে মুসলমানরা অন্যান্য জাতি থেকে পিছিয়ে না পড়ে এজন্য ইসলাম বাঁধাধরা রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পাবন্দি আরোপ করেনি।

ইসলামি শিক্ষার মধ্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে মানুষ হলো আল্লাহর বান্দা এবং তার খলিফা। পৃথিবীর প্রকৃত কর্তৃত্ব এবং প্রধান শাসনকার্যের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। কেননা তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং দোজাহানের মালিক। তবে অন্যান্য সৃষ্টি এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য হলো, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-পৃথিবীসহ সমস্ত সৃষ্টিজীব সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থার অধীন। তারা কখনো এই ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার প্রণীত বিধান মানার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছেন। তিনি নবী-রাসুল এবং আসমানি কিতাব পাঠিয়ে তার প্রদত্ত বিধান এবং খলিফা হিসাবে বান্দার উপর আরোপিত নীতিমালা শিক্ষা দিয়েছেন। যারা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে বেছে নেয়, আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে

> শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের।[৩৬৭]

উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোনো ব্যক্তি নয়; বরং কোনো মুমিন এবং নেককার সমাজের মাধ্যমেই তার এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটাবেন। অন্যভাবে বলা যায়, এটা হবে মুমিনদের সম্মিলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণিবিশেষের ইজারাদারি কায়েম হবে না; বরং মুসলমানরা সকলে মিলে সে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

এ ব্যবস্থা এবং পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, গণতন্ত্রে মানুষ নিজের খেয়াল-খুশির অধিকার রাখে। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে থাকে। অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে তারা যেকোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে। এমনকি তারা এর মাধ্যমে খোদায়ি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আইন গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে একটি ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থায় আল্লাহর বান্দারা আপন সন্তুষ্টিক্রমে নিজেদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন রাখে। তারা কখনোই সে বিধান লঙ্ঘনের স্পর্ধা দেখায় না। তারা আল্লাহর প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী সকল আইন প্রণয়ন করে থাকে। তারা মেনে থাকে যে, আমাদের সর্বোচ্চ বিচারক হলেন আল্লাহ। আমরা তার বান্দা। তিনি কুরআন অবতীর্ণ করে এবং রাসুল পাঠিয়ে আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন, আমরা সেই অনুযায়ী এ পৃথিবী পরিচালনা করব।

---

[৩৬৭] সুরা নুর, আয়াত ৫৫

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনীতি

কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত ইসলামের প্রণীত মৌলিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. রাষ্ট্রপরিচালনার উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রপরিচালনার উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের বিধান কার্যকর করা। কল্যাণের প্রসার ঘটানো এবং ফেতনা-ফাসাদ রোধ করা। কুরআনে বলা হয়েছে,

> الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
>
> তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।[৩৬৮]
>
> كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ
>
> তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ প্রদান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৩৬৯]

২. খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য

আল্লাহ তায়ালার খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব মুমিনদের পরামর্শের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। এতে আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দার

---

[৩৬৮] সুরা হজ, আয়াত ৪১

[৩৬৯] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

হকসমূহ পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত থাকে। এমনটা না হলে সেটা রাজতন্ত্র এবং নিছক বাদশাহি বলে গণ্য হবে।

ক. হজরত আবু মুসা আশআরি রা. ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বাদশাহির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

ان الامارة ما اؤتمر فيها و ان الملك ما غلب عليه بالسيف

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় আর বাদশাহি তরবারির জোরে অর্জিত হয়।[৩৭০]

খ. হজরত উমর রা. একবার হজরত সালমান ফারসি রা. কে জিজ্ঞেস করেন, আমি বাদশাহ নাকি খলিফা?

তিনি বলেন, যদি আপনি মুসলমানদের ভূখণ্ড থেকে এক দিরহামও অন্যায়ভাবে উসুল করেন, অন্যায়ভাবে তা খরচ করেন তা হলে আপনি বাদশাহ অন্যথায় আপনি খলিফা। একথা শুনে হজরত উমর রা. অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন।[৩৭১]

৩. শুরা তথা পরামর্শের মৌলিক অবস্থান

১. রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসক নির্বাচন, ক্ষমতার পালাবদল ও হস্তান্তরের যাবতীয় কার্যক্রম এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরা তথা পরামর্শের আলোকে নির্ধারিত হবে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে।[৩৭২]

হজরত উমর রা. বলেন, পরামর্শ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না।[৩৭৩]

২. উম্মাহর মহান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যতীত কারো জন্য নিজেকে শাসনকার্যের উপযুক্ত বলে দাবি করা ঠিক নয়। হজরত উমর রা. বলেন,

---

[৩৭০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৪/১১৩

[৩৭১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৩০৬

[৩৭২] সুরা শুরা, আয়াত ৩৮

[৩৭৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৩৭০৪২, নাসায়ি কৃত সুনানুল কুবরা, ৭১১৩

مَن بَايَعَ رَجُلًا عن غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فلا يُبَايَعُ هو ولا الذي بَايَعَهُ

যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বাইয়াত হবে তার এই বাইয়াত কার্যকর হবে না। বাইয়াত প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী কারোই না।[৩৭৪]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফত পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে যু-আমর রা. জারির বিন আবদুল্লাহ রা. কে বলেন,

إِنَّكُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ ما كُنْتُمْ إذا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ. فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا، يَغْضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَا المُلُوكِ.

হে আরববাসী, তোমরা ততদিন পর্যন্ত কল্যাণমণ্ডিত থাকবে যতদিন তোমরা একজন শাসকের মৃত্যুর পর অপরজনকে পরামর্শের মাধ্যমে নিযুক্ত করতে থাকবে। কিন্তু যখন তরবারির মাধ্যমে শাসক নির্ধারিত হবে তখন শাসকগণ বাদশাহ হয়ে যাবে। তারা বাদশাহর মতোই ক্রোধান্বিত হবে, তাদের মতোই সন্তুষ্ট হবে।[৩৭৫]

৪. দায়িত্বলাভের মানদণ্ড

রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ইলম, আমানত এবং সুস্থতার দিক থেকে পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন।[৩৭৬]

---

[৩৭৪] সহিহ বুখারি, ৬৮৩০
[৩৭৫] সহিহ বুখারি, ৪৩৫৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৩৭০২৩
[৩৭৬] সুরা বাকারা, আয়াত ২৪৭

৫. পদপ্রার্থনার নিন্দা জ্ঞাপন

১. কেউ পদপ্রার্থী হলে তাকে কোনো ধরনের পদ ও দায়িত্ব দেওয়া হবে না। পদ প্রার্থনার নিয়তে আগত লোকদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والله لا نعطيها من طلبها منكم

আল্লাহর কসম, তোমাদের যে ব্যক্তি এ পদপ্রার্থী হবে, আমরা তাকে তা প্রদান করব না।[৩৭৭]

২. পদের আশা রাখা এবং তা চাওয়াটা পদপ্রার্থিতার দলিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি পদ চেয়ে থাকে এবং যে এ ব্যাপার আগ্রহী হয়ে থাকে আমরা তাকে এর দায়িত্ব প্রদান করি না।[৩৭৮]

৩. প্রার্থিতা ব্যতীত যে দায়িত্ব এসে যায় তাতে বরকত হয়। পদপ্রার্থিতামুক্ত পবিত্র ব্যক্তিরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تَسْأَلِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتَها عن غيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها

---

[৩৭৭] মুসনাদে আবু দাউদ, তায়ালিসি, ৫৩১

[৩৭৮] সহিহ বুখারি, ৭১৪৯

এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা। এতে দুনিয়াবি রাজনীতির দ্বন্দ্ব, দলাদলি এবং হানাহানি নেই। হ্যাঁ, যদি কখনো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, কারো বিশ্বাস হলো আমি ব্যতীত কেউ এই পদ পেলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে তা হলে সেখানে পদপ্রার্থনা বৈধ রয়েছে। ইউসুফ আ. বলেছেন,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক এবং জ্ঞানবান। (সুরা ইউসুফ, আয়াত ৫৫)

মূর্খদের জমায়েতে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যেমনভাবে আলেম ও কারি সাহেবের জন্য নিজেকেই এগিয়ে যেতে হয়, এক্ষেত্রেও তেমন। কিন্তু একাধিক আলেম ও কারী বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে যদি পূর্ব থেকেই ইমাম নির্ধারিত না থাকে তা হলে নিজে থেকে কেউ ইমামতির জন্য অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হবে।

রাষ্ট্রক্ষমতা চেয়ো না। যদি চাওয়ার কারণে তা পেয়ে থাকো তা হলে এ দায়িত্বের যাবতীয় বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। আর চাওয়া ব্যতীত তা চলে এলে তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে।[৩৭৯]

৬. শাসকদের আনুগত্য

১. শরয়ী নীতির অনুকূল হলে আমির এবং খলিফার সকল নির্দেশ মান্য করতে হবে। হজরত আবু জর গিফারি রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

أنْ أسمَعَ وأُطيعَ ولو لعبدٍ حبَشيٍّ مُجدَّعِ الأطرافِ

যাতে আমি শাসকের আনুগত্য করি, যদিও সে বিকলাঙ্গ হাবশি গোলাম হয় না কেন।[৩৮০]

২. শাসকদের ভুলত্রুটির উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে শাসক সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হয়ে গেলে আর ধৈর্যধারণ করা যাবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ শাসককে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখলে যেন ওই গুনাহকে ঘৃণা করতে থাকে। কিন্তু শাসকের আনুগত্য থেকে যেন বিমুখ না হয়ে যায়।[৩৮১]

এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমরা কি তরবারির মাধ্যমে এ ধরনের শাসককে পদচ্যুত করবো না?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে ততক্ষণ তাদেরকে পদচ্যুত করা যাবে না। তবে শাসককে অপছন্দনীয় কাজ করতে দেখলে সেটা ঘৃণা করতে থাকো। কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত উঠিয়ে নিও না।[৩৮২]

---

[৩৭৯] সুনানে আবু দাউদ, ২৯২৯

[৩৮০] বাইহাকি কৃত সুনানুল কুবরা, ১৬৬০৭

[৩৮১] সহিহ মুসলিম, ৪৯১০

[৩৮২] সহিহ মুসলিম, ৪৯১০

৭. শাসনকার্য অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব, এর উপর শাসকদের মুক্তি ও ধ্বংস নির্ভর করে

শাসক যদি জেনে-বুঝে নিজের আবশ্যক দায়িত্ব পালন করার মধ্যে ত্রুটি করে, জনগণের সঙ্গে খেয়ানত করে তা হলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ما مِن والٍ يَلِي رَعِيَّةًمِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وهو غاشٌّ لهم، إلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجَنَّةَ
>
> যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের জিম্মাদার হবে আর খেয়ানত করা অবস্থায় সে মারা যাবে তা হলে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।[৩৮৩]

৮. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মর্মান্তিক শাস্তির সম্মুখীন হবে

শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ। রাষ্ট্রে একজন শাসক থাকা অবস্থায় কেউ অন্যকারো হাতে বাইয়াত হলে তা সহিহ বলে গণ্য হবে না; বরং বাইয়াতকারী এবং বাইয়াতগ্রহীতা উভয়েই শাস্তির উপযুক্ত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فاقْتُلُوا الآخَرَ منهما.
>
> যখন দুই খলিফার বাইয়াত গ্রহণ করা হবে তখন দ্বিতীয়জনকে তোমরা হত্যা করে ফেলো।[৩৮৪]

৯. ইজতিহাদি ভুল

শরিয়ত যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেনি কিংবা যেসব বিষয়ে মানুষকে কোনো একটি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেসব বিষয়ে শাসক সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রত্যয়ী হওয়া সত্ত্বেও অনিচ্ছাক্রমে কোনো ভুলত্রুটি সংঘটিত হয়ে গেলে, এতে কোনো গুনাহ হবে না।

---

[৩৮৩] সহিহ বুখারি, ৭১৫১

[৩৮৪] সহিহ মুসলিম, ৪৯০৫

বাহ্যত, এই বিধানটি ইসলামের নম্রতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিধানের মাধ্যমে বিদ্রোহের হোতাকে শাস্তি দিয়ে বিদ্রোহ নির্মূল করা এবং গোটা রাষ্ট্রকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচানোই শরিয়তের উদ্দেশ্য।

إذا حكَم الحاكمُ فاجتَهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا حكَم فاجتَهد فأخطأ فله أجْرٌ

বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবেন আর তিনি ভুল ইজতিহাদের শিকার হলে একটি সাওয়াব পাবেন।[৩৮৫]

১০. শাসকদেরকে সংশোধন করা আলেমদের দায়িত্ব

শাসক ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হলে আলেমদের জন্য তাকে সংশোধন করা কর্তব্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثمَّ يكونُ مِن بعدِهم خُلَفاءُ يعمَلونَ بما لا يعلَمونَ ويفعَلونَ ما لا يُؤمَرونَ فمَن أنكَر عليهم فقد برِئَ

এরপর এমন কিছু শাসক আসবে, যারা এমন কাজ করবে যে সম্পর্কে তারা জানে না। এমন কর্ম সম্পাদন করবে, যে বিষয়ে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়নি। যে ব্যক্তি তাদের এসব কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।[৩৮৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন যে, অচিরেই তোমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসবে, তোমরা যাদের কাজকর্ম দেখে তাদের ভুলত্রুটি ধরবে। যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজকে অন্তর থেকে খারাপ মনে করবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি জবানের মাধ্যমে তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবে, সেও নিরাপদ থাকবে। হ্যাঁ, যে এসব খারাপ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং খারাপ কাজে তাদের আনুগত্য করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩৮৭]

খেলাফতে রাশেদার সোনালিযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এসব ইসলামি নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর ছিল। এগুলো অনুসরণের ফলে তখনকার মুসলিমসমাজ ঈমান-আমল ও আখলাকের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

---

[৩৮৫] সুনানে আবু দাউদ, ৩৫৭৪

[৩৮৬] ইবনে হিব্বান, ৬৬৬০

[৩৮৭] সহিহ মুসলিম, ৪৯০৬

খেলাফতে রাশেদার যুগে মুসলিমবিশ্ব

তখন হিজরি ৩৪তম বছর চলছিল। মদিনার শাসনব্যবস্থা শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশকাল পার করছিল। হিজরিবর্ষের এ চার দশকে মদিনার রাষ্ট্রব্যবস্থা হুবহু কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। হজরত উসমান গনি রা. হজরত আবু বকর এবং উমর রা. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছিলেন। এ সময়কালে তাদের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

১. শুরা তথা পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

ইসলামি খেলাফতের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো মজলিসে শুরা তথা পরামর্শসভা। হজরত উমর ফারুক রা. একে সুবিন্যস্ত করেছিলেন। হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনকালে এর ক্ষমতা এবং কার্যক্রমে কোনো ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়নি; বরং এক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা হজরত উসমান রা. এর নম্র স্বভাবের কারণে সকলেই সুস্পষ্টভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করেছিল। হজরত উসমান রা. একমাত্র খলিফা, যার খেলাফত কার্যক্রম মজলিসে শুরার সর্বোচ্চ গুণাবলির অধিকারী ছয় সদস্যের কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কারণে তার শাসনকালে মজলিসে শুরা বহু ইচ্ছাধিকার এবং ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

২. ক্ষমতা পালাবদলের মূলনীতি

নতুন খলিফা নির্বাচনে শুরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মজলিসে শুরা শাসক নির্বাচনে ইসলামের প্রতি তার অবদান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার কী পরিমাণ ওঠাবসা হয়েছে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতো। হজরত উমর ফারুক রা. খলিফা নির্বাচনের মূলনীতি হিসেবে বলেছিলেন, একজন বদরি সাহাবি জীবিত থাকলেও খেলাফত বদরি সাহাবিদের জন্যই হবে। এরপর উহুদযুদ্ধে

অংশগ্রহণকারী একজন মুজাহিদও যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ তারাই এর হকদার হবে। এরপর অমুক অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য খেলাফত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে মক্কাবিজয়ের দিন ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তাদের এবং তাদের সন্তানদের এবং মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারীদের খেলাফতের দায়িত্বে কোনো অংশ নেই।[৩৮৮]

৩. বিভিন্ন দায়িত্বে লোক নিযুক্তীকরণ

প্রদেশের শাসক এবং গভর্নর নির্বাচনের ক্ষেত্রে খলিফাই ক্ষমতাবান ছিলেন। উত্তম গুণাবলি, গ্রহণযোগ্যতা, জ্ঞানগত উৎকর্ষ, পরিচালনাগত দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শহর এবং প্রদেশে গভর্নর এবং বিচারক নিয়োগ করা হতো। যারা পরহেযগার, আমানতদার বাহাদুর ও সাহসী হতো, তাদের মধ্য থেকেই এসব পদে লোক নিয়োগ দেওয়া হতো। গ্রহণযোগ্যতা, মুসলিম উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা এবং জনগণের মধ্যে তার সম্মানের বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ রাখা হতো। এই কারণে এইসব গুণের অধিকারী উঁচু মর্যাদার সাহাবিগণকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো।

৪. দায়িত্ব পরিবর্তন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিদান

কাউকে কোনো উঁচু পদে নিয়োগ দেওয়ার পর তাকে স্বতন্ত্রভাবে সেখানে বহাল রাখাটা আবশ্যক বিষয় নয়। জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে রদবদল করা হতো। পূর্বের খলিফার গভর্নরকে পরবর্তী খলিফা চাইলে বহাল রাখতে পারতেন। কিন্তু যদি কারো কোনো পদে দীর্ঘ সময় থাকাটা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি হতো তা হলে তাকে বরখাস্ত করা হতো। প্রবীণ সাহাবিদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামিতার স্পৃহা এবং খেলাফতের প্রতি তাদের অগাধ সম্মান ছিল। তারা কখনো এ কাজকে ব্যক্তিগত মান-সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। উমর ফারুক রা. অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে এক বছরের বেশি সময় বহাল রাখবে না।

---

[৩৮৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/৩৪২; সুয়ুতি কৃত জামিউল হাদিস, ৩১৫৬৮, কানযুল উম্মাল, ৩৬০৪৬, ফাতহুল বারি, ১৩/২০৭

তবে আবু মুসা আশআরির বিষয়টি ভিন্ন। তাকে আরো চার বছর এই পদে বহাল রাখা হবে।[৩৮৯]

উসমান রা. সেই অনুযায়ী আমল করেছিলেন। আবু মুসা আশআরি রা. কে এরপর দ্বিতীয়বারের জন্য কুফার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। পদচ্যুতির কারণে তিনি সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতে কিছুই বলেননি।

৫. কেন্দ্রীয় দায়িত্ব

সকল প্রদেশে চারজন কেন্দ্রীয় দায়িত্বে থাকতেন।

১. গভর্নর

২. দাফতরিক কাজ সম্পাদনকারী (সেক্রেটারি)

৩. বাইতুল-মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) দায়িত্বশীল

৪. কর গ্রহণকারী, কালেক্টর, যারা ভূমির নির্ধারিত কর উসুল করতেন।

এই চারটি দায়িত্বে খলিফা নিজের পক্ষ থেকেই লোক নিয়োগ করতেন। তারা সকল বিষয়ে খলিফার নিকট জবাবদিহি করতেন।[৩৯০]

৬. গভর্নরের দায়িত্ব

গভর্নরকে একই সঙ্গে বহু কাজ সম্পাদন করতে হতো। তার ক্ষমতা হতো ব্যাপক। তিনি একইসঙ্গে সমর এবং প্রদেশ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিমূল ছিলেন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি এবং সামরিক কমান্ড উভয়ই তার হাতে থাকতো। তার নিজস্ব মজলিসে শুরা (পরামর্শ পরিষদ) থাকতো। এতেই সকল বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হতো। জনগণের অভিযোগ-আপত্তি শোনার জন্য আদালতের ব্যবস্থা ছিল। নহর খনন, পুল নির্মাণ, জেলখানার ব্যবস্থাপনা, নতুন শহর-বাজার-মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, জনসাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নিবাস, চাষাবাদের জমির অনুমোদন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব তার ছিল। সীমান্তে শত্রুদের প্রতিহত করা, তাদের অবস্থা এবং পরিকল্পনার সংবাদ রাখা, দুর্গ মজবুত করা, নতুন সৈন্য ভর্তি, সৈন্য প্রস্তুত করা, কিশোরদের সামরিক প্রশিক্ষণ

---

[৩৮৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৩৯১

[৩৯০] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৫৪-১৫৬

প্রদান (যার মধ্যে ঘোড়সওয়ারি, তিরন্দাজি আবশ্যক ছিল) এগুলো ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ।

শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য খলিফার পক্ষ থেকে অনুমোদন নেওয়া আবশ্যক ছিল। তবে সীমান্তে কোনো আক্রমণকারী বাহিনী এসে গেলে গভর্নরের জন্য খলিফাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-দায়িত্ব পালন করতে হতো।[৩৯১]

গভর্নরগণ যাতে জীবন-জীবিকা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সকল দায়িত্ব পালন করতে পারেন এজন্য তাদের ভাতা নির্ধারিত ছিল। ভাতার সর্বোচ্চ স্কেল ছিল বার্ষিক দুইশত দিনার।[৩৯২]

কখনো কখনো আর্থিক বিষয় তাদের জিম্মায় ন্যস্ত করা হতো। যেমনঃ শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এবং জর্দানে হজরত শুরাহবিল বিন হাসানা রা. আর্থিক বিষয়ের হিসাব-নিকাশ রাখতেন। তবে সাধারণভাবে বাইতুল-মাল, কর প্রভৃতি বিষয় গভর্নরের অধীনে থাকত না। হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যখন কুফার গভর্নর ছিলেন তখন কুফার প্রাদেশিক কোষাগারের দায়িত্বশীল ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।[৩৯৩] হজরত আম্মার বিন ইয়াসির যখন কুফার গভর্নর ছিলেন তখন কর উসুলের দায়িত্ব ছিল হজরত উসমান বিন হানিফ রা. এর কাঁধে।[৩৯৪]

৭. আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা

গভর্নরের বাইতুল-মাল থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হলে তাকে বাইতুল-মালের জিম্মাদার থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হতো। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় থেকে আরও বড় ব্যক্তিদের জন্য কোনো শিথিলতা করা হতো না। মুসলমানদের সরকারি কোষাগারের একটি কণাও যাতে নষ্ট না হয়, এজন্য প্রতিটি দিরহামের হিসাব রাখা হতো। ভুলে কোনো টাকা বেশকম হলে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো।

---

[৩৯১] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১১৭, ১১৮

[৩৯২] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৩০

[৩৯৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৪৯

[৩৯৪] কাজি আবু ইউসুফ কৃত আল খারাজ, ৪৬

খলিফা কখনো কখনো তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করতেন। হজরত উসমান রা.-ও এ বিষয়ে কোনো শিথিলতা করতেন না।

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যখন কুফার গভর্নর ছিলেন তখন প্রাদেশিক বাইতুল-মালের দায়িত্বশীল ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.। সা'দ রা. তাকে বলে ঋণ হিসেবে কিছু টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যখন আর্থিক সংকটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এই অর্থ বাইতুল-মালে ফিরিয়ে দিতে পারেননি তখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তাকে তাড়া দেন। কিন্তু যখন ফিরিয়ে দিতে পারছিলেন না তখন তিনি খলিফাকে বিষয়টি অবগত করেন। হজরত সা'দ রা. এর মর্যাদার বিষয়টি খলিফার জানা ছিল। যাতে জনগণের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে যে, শাসকরা পদাধিকার-বলে অবৈধ স্বার্থ হাসিল করে থাকেন এজন্য হজরত উসমান রা. তাকে পদচ্যুত করা উত্তম মনে করেন।[৩৯৫]

উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের আচরণ অধীনস্থদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য অফিসার এবং অধীনস্থ সকলের মধ্যে আমানতদারি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে সতর্কতা ছিল। দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে বারবার আমানতদারির ব্যাপারে নসিহত করা হতো।

হজরত উসমান রা. এর শাসনকালের শেষবছর কোনো এক যুদ্ধে লড়াইকারী কালিব জারমি রহ. আপন সন্তানকে নিজের নিম্নোক্ত ঘটনা শুনিয়েছেন।

আমরা তখন 'তুজ' অবরোধ করেছিলাম। বনু সালিমের মুজাশি বিন মাসউদ রা. আমাদের আমির ছিলেন। এক সময় দুর্গ বিজয় হয়। আমার জামাটা খুব পুরোনো ও ছেঁড়া ছিল। আমি এক অনারবের মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হই। তার জামা খুলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধৌত করে পরিধান করি। এরপর এক জায়গা থেকে সুঁই-সুতা নিই। গ্রামে গিয়ে তা দিয়ে আমার কাপড় সেলাই করি। এর মধ্যেই আমাদের সেনাবাহিনীর আমির মুজাশি বিন মাসউদ রা. দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'লোকসকল, গনিমতের সম্পদের মধ্য থেকে কোনো কিছু নিজেদের জন্য

---

[৩৯৫] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৫৬

গ্রহণ করবে না। যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে খেয়ানত করবে কেয়ামতের দিন সে ওই জিনিসটি নিয়ে হাজির হবে। যদিও তা সামান্য সুতা হয়।'

এই ঘোষণা শোনামাত্র আমি সেই জামাটি খুলে ফেলি। এরপর আমার সেই সেলাইকৃত জামার সুতা বের করতে থাকি। ব্যাটা, আল্লাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। সুতা যেন ছিঁড়ে না যায় আমি সে-দিকে লক্ষ রেখেছি। এরপর গনিমতের সম্পদ থেকে নেওয়া সেই জামা, সুঁই, সুতা সবকিছু ফিরিয়ে দিয়েছি।[৩৯৬]

৮. হেদায়াত এবং শিষ্টাচার সংক্রান্ত চিঠি

খলিফার পক্ষ থেকে গভর্নরদের প্রতিনিয়ত বিশেষ হেদায়াতনামা পাঠানো হতো। এ ছাড়াও সাধারণ নসিহতনামা বা বিভিন্ন সার্কুলার পাঠানো হতো। হজরত উসমান রা. আপন খেলাফতের শুরুকালে গভর্নরদের নিকট এক ঘোষণা পাঠান। তাতে বলা হয়, 'আল্লাহ তায়ালা শাসকদেরকে রক্ষক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে ট্যাক্স গ্রহণকারী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেননি। ওই সময় বেশি দূর নয় যখন শাসকরা আর রক্ষক থাকবে না; বরং তারা ট্যাক্স উসুলকারী হয়ে যাবে। তখন লজ্জা, আমানতদারি, ওয়াদা পালন খতম হয়ে যাবে। ইনসাফ হলো, মুসলমানদের বিষয়াদির প্রতি সবসময় নজর রাখতে হবে। তাদের জিম্মাদারি এবং অধিকার কী তা জানা থাকতে হবে। তাদের অধিকার আদায় করবে আর তাদের জিম্মাদারি তাদের উপর রাখবে। জিম্মিদের অধিকার আদায় করবে এবং তাদের জিম্মায় যা রয়েছে তা উসুল করবে।'[৩৯৭]

৯. কেন্দ্র এবং প্রদেশের সম্পর্ক

হজরত উমর রা. এর যুগে মক্কা-মদিনা, বাহরাইন, ইয়েমেন, শাম, কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি প্রদেশ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হজরত উসমান রা. এর যুগে আর্মেনিয়া পদানত হয়েছিল। আর্মেনিয়ার কয়েকটি এলাকা মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। খলিফাগণ বিভিন্ন

---

[৩৯৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৩৩৮২৮

[৩৯৭] ৪/২৪৪, ২৪৫

সময় গভর্নরদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হজরত উমর ফারুক সে উদ্দেশ্যে দুই-তিনবার শামে সফর করেন। হজরত উমর রা. এবং হজরত উসমান রা. অধিকাংশ হজ মৌসুমে মক্কায় আগমন করতেন। সেখানে গভর্নরগণ ছাড়াও গোটা দুনিয়ার মুসলমানগণ জমায়েত হতেন। এ সময় জনগণকে অভিযোগ পেশ করার সুযোগ প্রদান করা হতো।[৩১৮]

১০. ব্যবসায়িক খাত

জীবনযাপন এবং অর্থনীতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ব্যবসায়িক খাতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হতো। হজরত আবু বকর, হজরত উমর, হজরত উসমান রা. প্রত্যেকেই পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিলেন। এজন্য তারা লেনদেনের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতেন। সম্পদে ভেজাল মিশ্রণ, সম্পদ কুক্ষিগত করা, অন্যায় পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জনের উপর তারা কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সুদি লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মদ পান করার মতো মদ বিক্রি করার উপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। বাজারে ব্যবসা শুরু করার পূর্বে ব্যবসায়িক বিধি-বিধান শেখা আবশ্যক ছিল।[৩১৯]

১১. ভরণপোষণের ব্যবস্থা : ইদারাতুল উরাফা

ইদারাতুল উরাফা নামে খেলাফতের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা জনগণের ভরণপোষণ, তাদের দেখাশোনা এবং আইনশৃঙ্খলা ও নিয়মনীতির উত্তম দৃষ্টান্ত ছিল। এই ব্যবস্থার অধীনে জনগণের সকল বড় জমায়েত— সৈন্যবাহিনী, ঘন বসতি বা কোনো শহর বা গোত্র থেকে দশ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতো। তাদের প্রত্যেককেই আরিফ বলা হতো। প্রত্যেক আরিফকে দশ ব্যক্তির দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হতো। এই অধীনস্থ দশজনকে আরো দশজনের দেখাশোনার জিম্মাদারি প্রদান করা হতো। সে দশজনের প্রত্যেককে আরও দশজনের জিম্মাদারি প্রদান করা হতো। এভাবে ক্রমধারা চলতে থাকতো। এভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত

---

[৩১৮] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১১৮, ১১৯

[৩১৯] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৪৮, ১৪৯

লক্ষ লক্ষ মানুষ এর অংশীদার হতো, যার মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাও শামিল থাকতো।

রাষ্ট্রে নতুন মুজাহিদের প্রয়োজন হলে গোত্র বা শহরের আরিফ তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ তার অধীনস্থদের নিকট পৌছে দিত। তারা আবার নিজেদের অধীনস্থদের নিকট এ সংবাদ পৌছে দিত। এভাবেই সরকারি ঘোষণা প্রচার করা হতো। কোনো দরিদ্র বা নিঃস্ব কেউ খলিফার নিকট ফরিয়াদ পৌছানোর জন্য আরিফকে বলতো। বিভিন্ন আরিফের মাধ্যমে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ উপরে পৌছে দেওয়া হতো। এভাবে তার সমস্যা দূর করা হতো। রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ, বাৎসরিক ভাতা প্রভৃতি আরিফদের মাধ্যমেই বন্টন করা হতো। ফলে সকলেই কোনো ধরনের দৌড়ঝাঁপ ব্যতীত ঘরে বসেই নিজের অংশ পেয়ে যেত।[৪০০]

১২. বিচারবিভাগ

বিচারবিভাগ অত্যন্ত সক্রিয় এবং স্বাধীন ছিল। জনসাধারণ তাৎক্ষণিকভাবে ইনসাফ পেয়ে যেত। অধিকাংশ শহরের গভর্নর একজন বিচারকের ক্ষমতা রাখতেন। কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং কিছু তাবেয়ি এ দায়িত্ব পালন করতেন। যেহেতু সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল; তাই গভর্নরদের নিকট হাতেগোনা দুয়েকটি মামলা দায়ের হতো। আর তিনি এগুলো অনতিবিলম্বে নিষ্পত্তি করতেন। কোনো কোনো স্থানে আলাদাভাবে বিচারক নিয়োগ করা হতো। যেমনঃ হজরত উসমান রা. কুফায় হজরত কাব বিন সুরকে কাজি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।[৪০১]

কাজিগণ সাধারণত নিজেদের বাসস্থানে বা মসজিদে মামলার শুনানি করতেন এবং সেখানেই তার ফয়সালা দিতেন। বিচারবিভাগের আলাদা কোনো ভবন ছিল না।[৪০২]

এ কারণেই তখন মামলা খুব কম দায়ের হতো। অধিকাংশ সময় তৎক্ষণাৎ বাদি-বিবাদির জবানবন্দি শুনে ফয়সালা প্রদান করা হতো।

---

[৪০০] তারিখুত তাবারি, ৪/৪৮, ৪৯

[৪০১] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৭৯

[৪০২] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৮৯

আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে হজরত উমর রা. মদিনার কাজি ছিলেন। দুই বছরে তার নিকট একটি মামলাও দায়ের হয়নি।[৪০৩]

হজরত মিলহান বিন রবিয়া রা. কে কুফার কাজি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি নির্লিপ্ত বসে থাকতেন। তার এক বন্ধু বলেছে, আমি লাগাতার ৪০ দিন তার নিকট গিয়েছি। কখনো তার নিকট কোনো মামলা আসতে দেখিনি।[৪০৪]

কাজিরা যাতে ঘুষের প্রতি ধাবিত না হয় তাই তাদের উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ-করা ছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এবং কাজি শুরাইহ রহ. এর মাসিক ভাতা ছিল একশত দিরহাম।[৪০৫]

১৩. ব্যক্তিগত জীবনযাপনে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা

যদিও নিয়মকানুন আপন স্থানে আপসহীন ছিল, বিচারকার্যের ক্ষেত্রে কারো প্রতি সামান্য শিথিলতা প্রদর্শন করা হতো না; কিন্তু রাষ্ট্র জনসাধারণের জীবনযাপনে নিজের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে গোপনে তাদের দোষত্রুটি, গোপন পাপাচার এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন ভঙ্গের তথ্য তালাশ করত না; বরং খলিফাদের পক্ষ থেকে গভর্নরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কারো ব্যক্তিগত গুনাহের ব্যাপারে অবগত হলে যেন তা গোপন রাখা হয় এবং ওই ব্যক্তিকে তাওবা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়।[৪০৬]

হজরত উমর রা. এর জমানা থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যের গভর্নরদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল যে, জনগণের অভ্যন্তরীণ গুনাহ প্রকাশ হয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, লোকেরা আদালতে কোনো বিষয় নিয়ে এলে রাষ্ট্র কারো প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করতে পারবে না।

---

[৪০৩] তারিখুত তাবারি, ৩/৪২৬

[৪০৪] উসদুল গাবাহ, মিলহান বিন রবিয়া রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৪০৫] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৭৪
বর্তমান হিসেবে যার পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার রুপি। যদি সে যুগের স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ রাখা হয় তা হলে এটি মোটা অংকের টাকা, যা জীবিকার প্রশ্নে একটি পরিবারকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্য বেশ যথেষ্ট ছিল।

[৪০৬] ইমাম শাফেয়ি কৃত কিতাবুল উম্ম, ৬/১৪৯

বিচারককে তখন শরিয়ত-নির্ধারিত শাস্তির নীতিমালার উপর আমল করতে হবে।[৪০৭]

১৪. আয়ের খাত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা থেকে জাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, গনিমতের মাল প্রভৃতি খাত রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল। মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ তথা স্বর্ণ-রৌপ্য ও ব্যবসায়িক পণ্য প্রভৃতির মধ্যেই কেবল জাকাত আবশ্যক হয়ে থাকে। এর পরিমাণ হলো মাত্র আড়াই শতাংশ। মুসলমানদের শস্য এবং খনিজ সম্পদ থেকে উশর নেওয়া হতো, যা পাঁচ থেকে বিশ শতাংশ পর্যন্ত হতো। অমুসলিমদের উপর জিজিয়া ও খারাজ আরোপ করা হতো।

খারাজ হলো তাদের উৎপাদিত শস্যের উপর ধার্যকৃত কর। কোনো এলাকায় বিজয়ের সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো। যেমনঃ আজারবাইজানের অমুসলিমরা প্রতিবছর ৮০ লক্ষ দিরহাম খারাজ প্রদান করত।

জিজিয়া হলো প্রত্যেক অমুসলিম থেকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে উসুলকৃত অর্থ। এর পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। অর্থশালীদের থেকে বাৎসরিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের থেকে ২৪ দিরহাম এবং দরিদ্র থেকে ১২ দিরহাম উসুল করা হতো। সময়ের বিবেচনায় এতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হতো।

অমুসলিমদের উপর এ ছাড়া কোনো কর আরোপ করা হতো না। আর এটাও বছরে মাত্র একবার তাদের থেকেও উসুল করা হতো। আর কোনো অমুসলিম একেবারে উপার্জন-অক্ষম হয়ে পড়লে তার জিম্মা থেকে তা মওকুফ করা হতো। অমুসলিমদের প্রতি এত উত্তম আচরণ করা সত্ত্বেও খলিফাগণ তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত থাকতেন। হজরত উমর রা. মৃত্যুর পূর্বে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, 'জিম্মিদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের সঙ্গে কৃতঅঙ্গীকার পালন করতে হবে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। সক্ষমতার চেয়ে বেশি কর তাদের উপর আরোপ করা যাবে না।'

---

[৪০৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৯৩৭১

ফলে যে সম্পদ অর্জিত হতো, তাকে তরবারির মাধ্যমে বিজয়ের মালে গনিমত বলা হয়। গনিমতের ৮০% সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। ২০% তথা এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল-মালে জমা করা হতো।[৪০৮]

১৫. কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন : আর্থিক সচ্ছলতা

আমদানির এসব সুনির্দিষ্ট খাত থাকা সত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মজবুত ছিল। কৃষি উপযোগী এলাকায় নতুন খাল খনন করে দূরদূরান্তের শস্য খেতকে সজীব-শ্যামল করে তোলা হতো। বসরাবাসীদের জন্য মিঠা পানির ব্যবস্থা করা হয়। দজলা নদী থেকে নয় মাইল (সাড়ে ১৪ কিলোমিটার) লম্বা নহর খনন করে শহর পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়।[৪০৯]

কখনো কোনো প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্যান্য প্রদেশ থেকে অতিরিক্ত শস্য-ফসল সেখানে পাঠানো হতো। মদিনার দুর্ভিক্ষের সময় হজরত আমর ইবনুল আস রা. আইলা উপসাগর থেকে লোহিতসাগরে খাদ্যভর্তি জাহাজ প্রেরণ করেছিলেন, যা মদিনার বন্দরে নোঙর করে।[৪১০]

জমির মালিক এবং চাষীরা তাদের চেষ্টা-মেহনতের পরিপূর্ণ ফল ভোগ করতেন। এজন্য তারা পরিপূর্ণ আবেগ-উদ্দীপনার সাথে কৃষিকাজ করতেন। অধিকাংশ সময়ই বৃষ্টি হতো। কর উসুলকারী দায়িত্বশীলগণ অত্যন্ত আমানতদার ছিলেন। এ কারণে টাকাপয়সা কখনো বেশকম হতো না। এর ফলে প্রতিবছর বাইতুল-মালে কোটি কোটি দিরহাম জমা হয়ে যেত।[৪১১]

১৬. বাইতুল-মালের ব্যয় খাত

সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে আপন আপন খাতে ব্যয় করা হতো। জাকাতের অর্থ গরিব, ফকির-মিসকিন, ইয়াতিম, বিধবা, মুসাফির, ছাত্র এবং মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। অন্যান্য অর্থ দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, প্রজাদের প্রয়োজন পূরণ, সরকারি

---

[৪০৮] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ১৮৫-১৯০

[৪০৯] ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ৩৪৭

[৪১০] তারিখুল মদিনা, ২/৭৪৫

[৪১১] ফুতুহুল বুলদান, ২৬৬

তার ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। খেজুরগাছের কাণ্ড দিয়ে পিলার তৈরি করা হয়েছিল।[৪১৬]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. খেজুর গাছের ডালের মাধ্যমে মসজিদে নববির নতুন ছাদ নির্মাণ করেন।[৪১৭]

উমর ফারুক রা. মসজিদের সীমানা বৃদ্ধির জন্য হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের জায়গাটুকু এতে যুক্ত করেন।[৪১৮]

কাঁচা ইটের মাধ্যমে নতুন দেয়াল তৈরি করান। তিনি মসজিদে হারামেরও নির্মাণ কাজ আঞ্জাম দেন। মাকামে ইবরাহিম তখন বাইতুল্লাহর সাথে মিলিত ছিল। ফলে তাওয়াফ করতে কষ্ট হতো। এ কারণে হজরত উমর ফারুক রা. মাকামে ইবরাহিমকে ওই স্থান থেকে দূরে স্থাপন করেন।[৪১৯]

হজরত উসমান রা. এর শাসনকালে মসজিদুল হারামে ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়।[৪২০]

হজরত উমর রা. মসজিদে নববির সম্প্রসারণ এবং মেরামত করা সত্ত্বেও তার পূর্বের অবকাঠামো বহাল ছিল। হজরত উসমান রা. একে নতুনভাবে উত্তম ও সুন্দর আকৃতিতে পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি চুনা এবং পাথরের মজবুত দেয়াল যুক্ত করেন। দেয়ালে বিভিন্ন নকশা অংকন করা হয়। সেগুন কাঠের শক্তিশালী ছাদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদের সীমানা বৃদ্ধি করা হয়।[৪২১]

২৯ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস থেকে ৩০ হিজরির মহররম পর্যন্ত সর্বমোট দশ মাসে এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে তখন মসজিদের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২৪০ ফুট আর প্রস্থ ২২৫ ফুট। দক্ষিণ দিকে

---

[৪১৬] সহিহ বুখারি, ৪৪৬

[৪১৭] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা ৩৯৬, ৩০৭

[৪১৮] সুনানে আবু দাউদ, ৪৫১

[৪১৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৪/২১, ২২

[৪২০] তারিখুত তাবারি, ৪/২৫১

[৪২১] সহিহ বুখারি, ৪৪৬

মেহরাবে নববির সামনে নতুন মেহরাব নির্মাণ করা হয়, যা আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে।[৪২২]

মসজিদ নির্মাণ এবং তার সম্প্রসারণের পাশাপাশি তা নেক কাজের মাধ্যমে আবাদ করার প্রতি পূর্ণাঙ্গ গুরুত্বারোপ করা হতো। হারামাইন শরিফাইন, কুফা, বসরা এবং মিসরের ফুসতাতের নবনির্মিত সুবিশাল মসজিদ শুধু নামাজিদের দ্বারাই ভরপুর থাকতো না; বরং এগুলো জিকির, ইবাদত, ইলমচর্চা, ওয়াজ-নসিহত, মুসলমানদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত। এখানেই আদালতের ফয়সালা এবং সরকারি বিধিবিধান ঘোষণা করা হতো।[৪২৩]

১৮. নওজোয়ানদের যোগ্যতার পরীক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় দায়িত্বগুলো প্রবীণ সাহাবিগণ পালন করতেন। কিন্তু এর পাশাপাশি নওজোয়ানদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। তাদেরকে নিজেদের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ প্রদান করা হতো। হজরত উসমান রা. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মিসরে আবদুল্লাহ বিন আবু সারাহ রা. এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে পুরো প্রদেশের গভর্নর বানানো হয়। এই নওজোয়ান মুসলিম সাম্রাজ্যের বিজয়ের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।[৪২৪]

---

[৪২২] ইবনে জিয়া মক্কী কৃত তারিখে মক্কাতুল মুশাররফা ওয়াল মসজিদিল হারাম ওয়াল মাদিনাতিশ শারিফা, ২৮১

[৪২৩] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ২৯৯, ৩০০

[৪২৪] এ সব বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ হজরত উমর ফারুক রা. এবং হজরত উসমান রা. এর শাসনকালের অধীনে পেছনে গত হয়েছে।

খেলাফতে রাশেদার যুগে ইলমি কার্যক্রম

কল্যাণ এবং বরকতের এই যুগটি ইলমের উত্তরণকাল ছিল। এ সময় আলেমগণ অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর বয়স আনুমানিক ১৫ বছর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন-হাদিসের বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি তিনি। কিন্তু তার জ্ঞানার্জনের পিপাসা অত্যন্ত তীব্র ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের এক-একজনের নিকট গিয়ে গিয়ে হাদিস শিখতেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি তাফসির, হাদিস এবং ফিকহের প্রবীণ আলেমদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। তার আশপাশে ইলমপিপাসুদের ভিড় লেগে যেত।[৪২৫]

এই কারণেই হজরত উমর ফারুক রা. এর মজলিসে শুরায় বড় বড় সাহাবিদের সঙ্গে তাকেও শামিল করা হয়; অথচ ওই সময় তার বয়স ছিল ২০ কি ২২ বছর।[৪২৬]

হজরত উমর রা. মুসলমানদেরকে বাল্যকালে শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলতেন,

تَفَقَّهوا قَبلَ أنْ تُسوَّدُوا

সরদার হওয়ার পূর্বেই তোমরা জ্ঞান অর্জন করে নাও।[৪২৭]

এর অর্থ হলো, ইলম অর্জন করলে তোমরা কিছু হতে পারবে। এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কর্ম-জীবনে পা রাখার পূর্বে এবং বড় দায়িত্ব পালন করার পূর্বেই জ্ঞান অর্জন করে নাও। পরবর্তীতে সময়-সুযোগ বের করা মুশকিল হয়ে যাবে।

---

[৪২৫] মুসতাদরাকে হাকিম, ৬২৯৪

[৪২৬] উসদুল গাবাহ, আল ইসতিয়াব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৪২৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ২৬১১৬

ইলমি কার্যক্রমের বিভিন্ন শাখা ছিল। নিম্নে সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

১. কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ

কুরআন মাজিদের শব্দমালা মুখস্থ করা, সহিহ-শুদ্ধভাবে তা তেলাওয়াত করা এবং অর্থ বুঝে বুঝে পাঠ করার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وعَلَّمَهُ

> যে ব্যক্তি কুরআন শেখে এবং তা শিক্ষা দেয় সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৪২৮]

কুরআন মাজিদের শব্দমালা সংরক্ষণের জন্য আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জমানায় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সহিহ বুখারিতে ইবনে শিহাব যুহরি থেকে এক বর্ণনায় এ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার সারকথা হলো, ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআন মাজিদের কারি সাহাবিদের বড় সংখ্যক শহিদ হয়ে গেলে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কুরআন সংরক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করেন। কেননা ওই সময় কেবল মানুষের স্মৃতিতে কুরআন সংরক্ষিত ছিল। কোথাও লিখিত আকারে পরিপূর্ণভাবে একসঙ্গে তা বিদ্যমান ছিল না। তখন তার নির্দেশে হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. কুরআন মাজিদের এক একটি আয়াত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একত্র করেন। এভাবে তিনি সত্যায়নকৃত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।

২. উসমান গনি রা. এর শাসনকালে কুরআন সংরক্ষণের কার্যক্রম

এক্ষেত্রে হজরত উসমান গনি রা. দ্বিতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তিনি গোটা উম্মতকে কুরআন মাজিদের এক কপি এবং এক লিপি-পদ্ধতির উপর একত্র করেন। আজারবাইজানে জিহাদরত সেনাপতি হজরত হুযাইফা বিন ইয়েমেন রা. মদিনায় এসে বলেন, লোকজন কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ব্যাপারে মতবিরোধের শিকার হচ্ছে। কেউ একটি আয়াত একভাবে পড়তো, অন্য একজন সেটাকে ভিন্নভাবে তেলাওয়াত করত।

---

[৪২৮] সহিহ বুখারি, ৫০২৭

এর মূল কারণ হলো ততদিনে ইসলামের বাণী দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শৈলীতে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করত। এরপর তারা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করত। এই কারণে তিনি তাওরাত, ইনজিলের মতো কুরআন মাজিদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কা করেন।

হজরত উসমান গনি রা. এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারিভাবে কুরআন মাজিদ লিপিবদ্ধ করা এবং তার প্রচার-প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এই কাজের জন্য দ্বিতীয়বার হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. কে নির্বাচন করা হয়। তিনি হজরত আবু বকর রা. এর জমানায় সংকলিত সত্যায়িত মুসহাফ সামনে রাখেন। এই মুসহাফের প্রতিটি শব্দ তিনি দ্বিতীয়বার যাচাই করেন। শুদ্ধাশুদ্ধি সত্যায়নের পর সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে কয়েকটি কপি তৈরি করেন। তারপর এগুলো মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হজরত উসমান রা. এর নির্দেশে কুরআন মাজিদের অন্যান্য কপি ধ্বংস করে ফেলা হয়। কেননা এগুলোর বিশুদ্ধতা সত্যায়নকৃত ছিল না। সরকারি কপিকে 'মুসহাফে উসমানি' এবং তার লিপিশৈলীকে 'রসমে উসমানি' বলা হয়। আজ অবধি মুসলিম উম্মাহ কুরআন মাজিদের এই কপির মাধ্যমেই উপকৃত হচ্ছে।[৪২৯]

৩. কুরআন মাজিদ শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ

খোলাফায়ে রাশেদিন কুরআন মাজিদের পঠন-পাঠনকে ব্যাপক করার উপর বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাত এই খেদমত আঞ্জাম দিতেন। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের অবস্থা যাচাই করার জন্য উমর ফারুক রা. এর পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণকারী নির্ধারিত ছিল।[৪৩০]

---

[৪২৯] সহিহ বুখারি, ৪৯৮৭, ফাতহুল বারি, ৯/১৭-২১

ওই সময় 'রসমে উসমানি'তে যের, যবর, নোকতা প্রভৃতি ছিল না। লোকেরা তখন কোনো কষ্ট ব্যতীত সহজেই এগুলো পড়তে পারত। নওমুসলিমদের জন্য যের, যবর ব্যতীত হরফ চেনা কষ্টসাধ্য হওয়ায় পরবর্তীতে বনু উমাইয়ার যুগে তা যুক্ত করা হয়।

[৪৩০] আল ইসাবাহ, ১/২৯৮, আউস বিন খালেদ-এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

বসরায় হজরত আবু মুসা আশআরি রা. তার বহু শাগরেদ তৈরি করেছিলেন। তার মাধ্যমে সেখানে কারি সাহেবদের স্বতন্ত্র একটি জামাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল।[৪৩১]

কুফার ইলমচর্চার অবস্থা অত্যন্ত ভালো ছিল। সেখানে বাইয়াতে রেজওয়ানের তিনশত ও বদরযুদ্ধের সত্তরজন সাহাবি থাকতেন।[৪৩২]

সাহাবায়ে কেরামের এই সোনালি যুগে কুরআন মাজিদ পাঠদান এবং তা মুখস্থ করানোর মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত উবাই বিন কাব এবং হজরত আবু হুজাইফা রা. এর আজাদকৃত গোলাম সালেম রা. সর্বাগ্রে ছিলেন। কেননা, এই চারজনের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, তোমরা তাদের থেকে কুরআন শিখবে।[৪৩৩]

হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. কুরআন মাজিদের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক ছিলেন।[৪৩৪]

হজরত উসমান রা. ভালোমানের হাফেজে কুরআন ছিলেন। তিনি প্রতিদিন একবার কুরআন মাজিদ খতম করতেন।[৪৩৫]

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত এবং হিফজের ক্ষেত্রে আলি রা. এর প্রসিদ্ধি ছিল সর্বত্র।[৪৩৬]

প্রথম সারির এসকল কারি সাহেব সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন শিখেছিলেন। হজরত আবু দারদা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন সায়েব রা. ভালো মানের কারি ছিলেন।[৪৩৭]

তাবেয়িগণ হাফেজ এবং কারি হয়ে এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে থাকেন। তাদের মধ্যে হজরত মুগিরা বিন আবু শিহাব, আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ,

---

[৪৩১] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ২৯৬, ২৯৭
[৪৩২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৬/৯
[৪৩৩] সহিহ বুখারি, ৩৭৫৭
[৪৩৪] সহিহ বুখারি, ৩৮১০
[৪৩৫] তাবারানি কৃত মুজামুল কাবির, ১/৮৭
[৪৩৬] জাহাবি কৃত মারিফাতুল কুররায়িল কিবার, ১৩
[৪৩৭] জাহাবি কৃত মারিফাতুল কুররায়িল কিবার, ১১, ১৯, ২১, ২২, ২৪

আলকামা বিন কায়েস, আবু আবদুর রহমান আস সুলামি, আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ, আবু রজা আল বাসরি, আবুল আসওয়াদ দুওয়ালি, হাসান বসরি, ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা, মুজাহিদ বিন জাবার, ইয়াহইয়া বিন ইয়ামুর এবং সাঈদ বিন যুবাইর রহিমাহুমুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৩৮]

কুরআন মাজিদের শব্দমালার পাশাপাশি তার বিধানাবলি ও ব্যাখ্যাও শেখানো হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো। হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. প্রথমে একটি শব্দ শেখানোর পর দীর্ঘ সময় তার ব্যাখ্যা বুঝাতেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় মুফাসসিরের মর্যাদায় ভূষিত হন। কিন্তু তিনি কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে নিজের মত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকতেন। ওই সময় সাধারণত কুরআনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কোনো হাদিস জানা থাকলে, তা বর্ণনা করা হতো, অন্যথায় চুপ থাকা হতো।[৪৩৯]

৪. হাদিস সংরক্ষনের প্রচেষ্টা

অনেক সাহাবি হাদিসের মতন (মূলপাঠ) অর্থাৎ হাদিসের শব্দাবলি মুখস্থ করতেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবদ্দশায় হাদিস লেখার প্রতি উৎসাহিত করেননি। কুরআন মাজিদের এবং হাদিসের পৃষ্ঠা একত্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা ছিল না। কেননা তখন কুরআন মাজিদের পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িদের মধ্যে হাদিস লিপিবদ্ধ করার ধারা ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা. হাদিস লিপিবদ্ধ করার প্রতি সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। তার লিখিত সংকলন 'সহিফায়ে সাদিকা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এ ছাড়াও হজরত সা'দ বিন উবাদা, হজরত সামুরা বিন জুনদুব, হজরত আবু মুসা আশআরি এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের লিখিত সংকলন থেকে মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে।[৪৪০]

---

[৪৩৮] জাহাবি কৃত মারিফাতুল কুররায়িল কিবার, ২৫-৪০

[৪৩৯] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ৩০৭

[৪৪০] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ৩০৩-৩০৯

হাদিস শেখার জন্য সাহাবায়ে কেরাম দূরদূরান্তে সফর করতেন। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারি রা. একটিমাত্র হাদিসের জন্য শামে এবং অপর একটি হাদিসের জন্য মিসর সফর করেছেন।[৪৪১]

মসজিদে ব্যাপকভাবে হাদিসের মজলিস বসত। মসজিদে নববিতে হজরত আবু হুরাইরা, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. এর মজলিস প্রসিদ্ধ ছিল। হজরত আয়েশা রা. আপন কামরায় বসে পর্দার ভেতর থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। কুফায় ইবনে মাসউদ, বসরায় আনাস বিন মালিক, মিসরে আবদুল্লাহ বিন আমর, শামে আবু দারদা রা. এর হাদিসের মজলিস সকলের সম্মিলনস্থল ছিল।[৪৪২]

৫. ফিকহের প্রতি মনোনিবেশ

ইসলামধর্মে ইলমের মর্যাদা এবং খলিফাদের পক্ষ থেকে তার প্রচার-প্রসারের বিশেষ গুরুত্বারোপের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইলম মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। প্রত্যেক মুসলমানই ইলমের প্রতি আগ্রহী ছিল। ইসলাম আসার পূর্বে আরবদের জ্ঞান নিছক কিছু ধর্মীয় কিচ্ছা-কাহিনি ও কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলাম এসে কুরআন-সুন্নাহর আলো ছড়ানো শুরু করলে মানুষের সামনে জীবনের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মানুষ সবকিছুই চিন্তাভাবনা করে সম্পাদন করা শুরু করে। তারা সকল কাজেই লক্ষ করতে থাকে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন কি না? প্রতিটি বিষয় বৈধ-অবৈধের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করা হতে থাকে।

জীবনের বহু বিষয় সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান-করা হয়েছিল। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মদপান, অপবাদ আরোপ হারাম হওয়াটা সুস্পষ্ট ছিল। এগুলোর উপর শরিয়তের পক্ষ থেকে শাস্তি নির্ধারিত ছিল, পরিভাষায় যাকে হুদুদ (দণ্ডবিধি) বলা হয়। এ ছাড়াও কিছু শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন করাটা

---

[৪৪১] খতিব বাগদাদি কৃত আর রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস, ৩১, ৩২

[৪৪২] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ২৮৭; আলি আবদুল বাসিত মাযিদ কৃত মিনহাজুল মুহাদ্দিসিন ফিল কারনিল আউয়ালিল হিজরি ওয়া হাত্তা আসরিনাল হাদির, ১৮৭; এ ছাড়াও আল ইসাবাহ, আল ইসতিয়াব এবং উসদুল গাবাহয় উল্লিখিত সাহাবিদের জীবনী দ্রষ্টব্য।

শাসকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন : সমকামিতা, জাদুটোনা, নামাজ পরিত্যাগ প্রভৃতি। এগুলোর শাস্তিকে পরিভাষায় তাযির (সংশোধনমূলক শাস্তি) বলা হয়। কিছু গুনাহ অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রকে এগুলোর শাস্তি দেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়নি। যেমন, মিথ্যা বলা, কুদৃষ্টি দেওয়া, হিংসা করা, চোগলখুরি করা প্রভৃতি। কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে অবগত আলেমগণ জনসাধারণকে এসব গুনাহের অনিষ্ট সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

তবে কিছু কিছু বিষয় অভিনব এবং নতুন হতো। জমানার পরিবর্তন, অবস্থার ভিন্নতা, উপকরণ এবং জীবন-মানের উৎকর্ষ নতুন নতুন পরিস্থিতি তৈরি করত। এগুলোর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্ট বিধান প্রদান করা হয়নি। তাই মানুষ এসব ব্যাপারে শরিয়তের বিধান জিজ্ঞাসা করত। যাদের কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান ছিল, তারা এসবের শব্দাবলির উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তার মাধ্যমে নব উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান করতেন। এই শ্রেণির লোকদের ফকিহ বলা হয়। এদের মধ্যে যারা নতুন বিষয়াদিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন এবং সমাধান দিতেন তাদেরকে আহলে ফাতাওয়া (মুফতি) বলা হতো। তাদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক ছিল। হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত উমর ফারুক, হজরত উসমান গনি, হজরত আলি, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৪৪৩]

৫. ইফতা

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফাতাওয়া প্রদানকারীদের এক বিশেষ শ্রেণি ছিল, যাদের নিকট মানুষ মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হজরত আবু হুরাইরা, হজরত আবু মুসা আশআরি, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত আবু সাঈদ খুদরি, হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, হজরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হজরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য

---

[৪৪৩] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ৩১২

ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত উমর ফারুক, হজরত উসমান গনি এবং হজরত আলি মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ফকিহ এবং ফাতাওয়া প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুস্তরের ছিলেন।[৪৪৪]

খেলাফতে রাশেদার যুগে কিছু তাবেয়ি অত্যন্ত যোগ্য ফকিহ, মুফতি ও কাজি ছিলেন। তাদের মধ্যে হজরত কাব বিন সুর, হজরত শুরাইহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। হজরত কাব বিন সুর বসরায়, হজরত শুরাইহ কুফায় কাজি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৪৪৫]

৬. ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও ইতিহাস

বিশুদ্ধ আরবিভাষা শেখানোর জন্য আরব কবিদের কবিতা শোনানো হতো। হজরত উমর ফারুক রা. আরব কবিদের কাব্যমালা সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা কুরআন-হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে আরবিভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী এবং বিশেষভাবে জিহাদের ঘটনাবলি কুরআন-হাদিসের মতো মুখস্থ করা হতো। বহির্বিশ্বের ভাষা শেখার গুরুত্ব তৈরি হয়েছিল। হজরত যায়েদ বিন সাবেত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় তার নির্দেশেই হিব্রু, সুরিয়ানি, হাবশি ও কিবতি ভাষা শিখেছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.-ও আহলে কিতাবদের ভাষা জানতেন। হজরত মুগিরা বিন শুবা ফারসিভাষা জানতেন।[৪৪৬]

---

[৪৪৪] ই'লামুল মুআককিয়িন, ১/১০-১২

[৪৪৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, কাব বিন সুর, শুরাইহ বিন হারিসের জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৪৪৬] আসরুল খিলাফাতির রাশিদা, ৩১৩-৩২১

বিজয়কাল : সাহাবা-যুগ

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি
১১ হিজরি থেকে ৩৪ হিজরি

১১ হিজরি

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফত... রবিউল আউয়াল (মে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
উসামা রা. এর বাহিনী প্রেরণ... রবিউল আউয়ালের শেষদিকে (জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
চল্লিশ দিন পর উসামা রা. এর বাহিনীর বিজয়ী হিসেবে প্রত্যাবর্তন... জুমাদাল উলার শুরুর দিকে (জুলাই ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
হজরত আবু বকর রা. কর্তৃক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা... জুমাদাল উলা (জুলাই ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
হজরত ফাতেমা রা. এর মৃত্যু... রমযান (নভেম্বর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
উম্মে আইমান রা. এর মৃত্যু... রমযান (নভেম্বর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)
মুসাইলামা কাজ্জাবকে হত্যা... জিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

১২ হিজরি

পারস্যের বিরুদ্ধে সেনা-অভিযান- জঙ্গে জাতুস সালাসিল... মহররম (মার্চ ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)।
অলাজার যুদ্ধ... সফর (এপ্রিল ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)।
হিরা বিজয়... রবিউল আউয়াল (জুন ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)।
জঙ্গে ফিরাজ... জিলকদ (জানুয়ারী ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হজরত আবুল আস রা. এর মৃত্যু... জিলহজ (ফেব্রুয়ারি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৩ হিজরি

শামে সেনা-অভিযানের সূচনা... মহররম (মার্চ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।
হজরত খালিদ রা. এর ইরাক থেকে শামে রওনা... মহররম (মার্চ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

জঙ্গে আজনাদাইন... জুমাদাল উলা (জুলাই ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উখরা (২৪ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

হজরত উমর ফারুক রা. এর খেলাফতের সূচনা... জুমাদাল উখরা (২৫ আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ... জুমাদাল উখরা (১ সেপ্টেম্বর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

জঙ্গে জিসির... শাবান (অক্টোবর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

জঙ্গে বুআইব... রমযান (নভেম্বর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৪ হিজরি

দামেশক অবরোধের সূচনা... মহররম (ফেব্রুয়ারি ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

দামেশক বিজয় ... ১৫ রজব (আগস্ট ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

ফিহিলের যুদ্ধ... জিলকদ (ডিসেম্বর ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

রোমানদের রাজধানী হিমস বিজয়। বালাবাক বিজয়... জিলকদ (ডিসেম্বর ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ)

১৫ হিজরি

বসরা শহর নির্মাণের সূচনা... রবিউস সানি (মে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ... ৫ রজব (২৪ আগস্ট, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ... শাওয়াল (নভেম্বর ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৬ হিজরি

পারস্য সম্রাটের রাজধানী মাদায়েন বিজয়... (মার্চ ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

কুফা শহর নির্মাণের সূচনা... রজব (জুলাই ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

বাইতুল মাকদিস বিজয়... রজব (জুলাই ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

জঙ্গে জালুলা... জিলকদ (নভেম্বর ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৭ হিজরি

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে অপসারণ... (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

সামের খ্রিষ্টানদের বিদ্রোহ এবং তাদের দমন... (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৮ হিজরি

দুর্ভিক্ষ... (৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

আমাওয়াসের প্লেগ... (৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

মৃত্যু : হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, হজরত ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.।

১৯ হিজরি

কায়সারিয়া বিজয়... (৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ)।

তিকরিত বিজয়... (৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ)।

আমর ইবনুল আসকে মিসরের রণাঙ্গনে প্রেরণ... (৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ)।

২০ হিজরি

মিসর বিজয়... রবিউস সানি (মার্চ ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু... শাওয়াল (সেপ্টেম্বর ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়... জিলকদ (অক্টোবর ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)।

উবাই ইবনে কা'ব রা. এর মৃত্যু... (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)।

তুসতুর বিজয়, হুরমুজানের গ্রেফতার... (৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ)।

২১ হিজরি

নিহাওন্দের যুদ্ধ... রবিউস সানি (মার্চ ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর মৃত্যু... জুমাদাল উখরা (মে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব দিকে মুসলিমদের ব্যাপক অভিযান... (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর মৃত্যু... (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

উসাইদ বিন হুদাইর রা. এর মৃত্যু... (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

হজরত বেলাল হাবশি রা. এর মৃত্যু... (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ)।

২২ হিজরি

আজারবাইজান বিজয়... (৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

ত্রিপোলি (লিবিয়া) বিজয়... (৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

খোরাসান বিজয়...(৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)।

২৩ হিজরি

ইসতাখার, কিরমান, সিজিস্তান, মুকরান বিজয় ... (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
কাতাদা ইবনে নুমান আনসারি রা. এর মৃত্যু... (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে জামআর মৃত্যু... (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
হত্যার উদ্দেশ্যে হজরত উমর ফারুক রা. এর উপর আক্রমণ... বুধবার ২৭ জিলহজ... (৩ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

২৪ হিজরি

উমর ফারুক রা. এর দাফন... ১ মহররম (নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
উসমান ইবনে আফফান রা. এর খেলাফত লাভ... মহররম (নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
হামদান বিজয়... ১৪ জুমাদাল উলা (১৯ মার্চ ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
আর্মেনিয়ার যুদ্ধ... (১৯ মার্চ ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)

২৫ হিজরি

আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহ দমন... রবিউল আউয়াল (ডিসেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
কুফায় ওয়ালিদ বিন উকবা রা. কে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ... (৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)

২৬ হিজরি

মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণ... (৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)
প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রস্তুতীকরণ... (৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)

২৭ হিজরি

আফ্রিকার জিহাদ, জুরজিরকে হত্যা... (৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ইউরোপে প্রথম কদম, আন্দালুসে প্রথম নৌগেরিলা আক্রমণ... (৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২৮ হিজরি

প্রথম সমুদ্র অভিযান, কুবরুস বিজয়... (৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

২৯ হিজরি

বসরা এবং পারস্যে আবদুল্লাহ বিন আমের রা. কে নিয়োগ... (৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দ)

মসজিদে নববি সম্প্রসারণ এবং পুনঃনির্মাণের সূচনা... রবিউস সানি (জানুয়ারি ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩০ হিজরি

মসজিদে নববির পুনঃনির্মাণ সমাপ্তি... মহররম (সেপ্টেম্বর ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ)
পারস্য এবং খোরাসানে নতুন বিজয়, ইয়াজদাগিরদের পশ্চাদ্ধাবন... (৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩১ হিজরি

ইয়াজদাগিরদের শিক্ষণীয় মৃত্যু, সাসানি রাজবংশের সমাপ্তি... (৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ)
নিশাপুর বিজয়... (৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ)
হজরত আবু সুফিয়ান রা. এর মৃত্যু... (৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ)

৩২ হিজরি

হজরত মুয়াবিয়া রা. কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল উপসাগর পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা ... (৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ)
হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. এর মৃত্যু (বয়স, ৮২ বছর)।
আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু জর গিফারি, আবু দারদা রা. এর মৃত্যু।

৩৩ হিজরি

কুবরুসে বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয়বার দখল প্রতিষ্ঠা... (৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)
হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা. এর মৃত্যু।

৩৪ হিজরি

যাতুস সাওয়ারা (বা মাস্তুলের) যুদ্ধ... (৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)
আবু তালহা আনসারি রা. এর মৃত্যু।

ইতিহাসের শিক্ষা

সাহাবাযুগের এসব বিজয় এবং সফলতা একথা প্রমাণ করে যে, মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য করে তখন আল্লাহ তাকে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করেন। বাতিলের শক্তি তখন সর্বক্ষেত্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর অসীম দৃঢ়তা প্রমাণ করে যে, দীনের বিধান বহাল রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমঝোতার সুযোগ নেই। একজন সত্যিকারের মুসলমান আল্লাহর দীনে সমান্য ফাটল মেনে নিতে পারে না।

খতমে নবুওয়াতের আকিদা ইসলামের মৌলিক বিষয়। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কখনোই ইসলামের অন্তর্গত থাকতে পারে না। খতমে নবুওয়াত অস্বীকারকারীরা মাথা ওঠানো মাত্রই তাদেরকে দমন করা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। এ বিষয়ে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শনের সুযোগ নেই।

ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য অসাধারণ পরিচালনা-যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি জরুরি। হজরত উমর ফারুক রা. সেই ধরনের অসাধারণ পরিচালনা-যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে অভিনব পন্থা অবলম্বন করা, নিয়মকানুনের নতুন পদ্ধতি চালু করা, কাজকর্মে সহজতার পাশাপাশি এগুলোকে উত্তম উপায়ে সমাধানের রীতি অবলম্বনের ধারা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। হজরত উমর ফারুক রা. এই চিন্তা-দর্শন নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানদের সফলতা এবং উত্তম অবস্থার জন্য সাধারণ জীবনযাপনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনাগত এবং সামরিক বিষয়ে অভিনব পন্থা তালাশ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জনগণের সহজ এবং শান্তিময় জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জনসাধারণের সহজাত আগ্রহ এবং বৈধ চাহিদার উপর কঠোর বিধি-

নিষেধ আরোপ করার ফলে সমাজে সংকট তৈরি হয়ে থাকে। ইসলামি বিধানের সীমারেখার মধ্যে থেকে জনসাধারণের জন্য শিথিলতার পন্থা অবলম্বন করা উচিত। হজরত উসমান গনি রা. এর কর্মপন্থা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত।

শরিয়তগর্হিত কার্যাবলি বিশেষত অশ্লীল এবং নির্লজ্জ উপায়-উপকরণ কখনোই মুসলিমসমাজে স্থান পেতে পারে না। এসব ব্যাপার থেকে মুক্ত হয়েই কেবল কোনো সমাজ প্রকৃত উন্নতি-অগ্রগতি করতে পারে। যেমনটা সাহাবায়ে কেরামের যুগে ঘটেছিল।

ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রত্যেক সমাজের মৌলিক বিষয়। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সমাজে এই বিষয়গুলো সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন। এজন্য মুসলিম-অমুসলিম সকলেই তাদের সমাজের প্রতি অত্যন্ত আনন্দ ও মানসিক তুষ্টি লালন করতো।

শুধু বিজয়ের দিকেই শাসকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং বিজিত এলাকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জুলুম-নির্যাতন দূর করা, মহব্বত-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা, সঠিকভাবে সম্পদ বণ্টন করা, প্রত্যেকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা, শিক্ষাকে ব্যাপক এবং উন্নত ও অগ্রসর করা, সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর ভূমিকায় নিয়ে আসা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এসব বিষয়ে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা হতো।

মুসলিম উম্মাহর উপর সাহাবায়ে কেরামের অনেক বড় ইহসান ও অবদান রয়েছে। তাদের কোরবানি, আত্মবিসর্জন, জিহাদ এবং দাওয়াতের স্পৃহার কারণেই আজ আমরা মুসলমান হতে পেরেছি। তাদের অবদান স্মরণ রাখা সফলতার পরিচায়ক। এর বিপরীতে তাদের দুর্বলতা তালাশ করা, তাদের উপর আপত্তি উত্থাপন করা অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া এবং অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন আমাদের জন্য আদর্শ। দীন ইসলামের জন্য তাদের কোরবানি দেখে উম্মত হিসেবে আমাদের মধ্যে অবশ্যই এই স্পৃহা তৈরি হওয়া আবশ্যক যে, আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করব। যদি অন্তরে এই বিশ্বাস এবং

ধারণা তৈরি না হয় তা হলে এটা ঈমানের অবক্ষয় এবং অন্তর মরে যাওয়ার আলামত।

সাহাবিদের জীবন আমাদের জন্য দুই বিবেচনায় পরীক্ষার মাধ্যম। প্রথমত, আমরা তাদের অনুসরণ করে দীনের মহব্বত এবং ভালোবাসার পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করব নাকি আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত থাকব?

দ্বিতীয়ত, আমরা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে উল্লিখিত বিষয়াদির উপর ঈমান রাখবো নাকি তাদের বিরুদ্ধে সন্দেহযুক্ত উৎসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব?

প্রথমটি হেদায়েতের দরজা খুলে দেয়। দ্বিতীয়টি মানুষকে গোমরাহির দরজায় নিক্ষেপ করে।

নববি ও খেলাফতে রাশেদা-যুগের মহান ব্যক্তিবর্গ

নবীজির পরিবার : উম্মাহাতুল মুমিনিন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদেরকে কুরআন মাজিদে উম্মাহাতুল মুমিনিন (মুমিনদের মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেসকল ভাগ্যবতী নারী এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তারা হলেন :

১. উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রা.।
২. উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে যামআ রা.।
৩. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.।
৪. উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা.।
৫. উম্মুল মুমিনিন হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.।
৬. উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা.।
৭. উম্মুল মুমিনিন হজরত জুয়াইরিয়া রা.।
৮. উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা.।
৯. উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়া রা.।
১০.উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা.।
১১.উম্মুল মুমিনিন হজরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা.।

এই হলো মোট এগারজন উম্মুল মুমিনিন। তাদের দুইজন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তারা হলেন হজরত খাদিজা রা. এবং হজরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা.। অবশিষ্ট ন'জন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতসিদ্ধান্ত হলো, একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখতে পারা একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। উম্মতের কারো জন্য একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা বৈধ নয়। নিম্নে উম্মাহাতুল মুমিনিনের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.

হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা. হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী এবং উম্মতের সবচেয়ে সম্মানিত নারী। তিনি কুরাইশবংশের এক ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে ছিলেন। সততা এবং পবিত্রতার কারণের লোকেরা তাকে তাহেরা (পুণ্যবতী) বলতো।[৪৪৭]

তার প্রথম বিয়ে হয়েছিল আতিক বিন আয়েয মাখযুমির সাথে। আতিকের মৃত্যুর পর আবু হালা বিন যুরারা তামিমির সাথে তার বিয়ে হয়। আরবের প্রসিদ্ধ ফিজার যুদ্ধে তার পিতা এবং স্বামী উভয়েই মৃত্যুবরণ করেন। তারা উভয়েই ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে তাদের পরিবার চলতো। পিতা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হজরত খাদিজা রা. ভীষণ কষ্টের মুখে নিপতিত হন। এসময় তিনি আত্মীয়দের একজনকে দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

সেই সময়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমানত, দিয়ানত, বিশ্বস্ততা ও সততা গোটা মক্কায় প্রসিদ্ধ ছিল। তাকে সাদিক এবং আমিন উপাধিতে ডাকা হতো। হজরত খাদিজা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খ্যাতির ভিত্তিতে আপন ব্যবসার সম্পদ নিয়ে তাকে শামে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। সাথে তিনি অন্যদের তুলনায় তাকে দ্বিগুণ বিনিময় প্রদানের প্রস্তাব রাখেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রস্তাব কবুল করেন। তিনি তার ব্যবসার পণ্যসামগ্রী নিয়ে খাদিজা রা. এর গোলাম মায়সারার সঙ্গে শামে গমন করেন। এ বছর অন্যান্য বছরের তুলনায় ব্যবসায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হয়।

---

[৪৪৭] পিতার দিক থেকে তার বংশধারা হলো খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই। মায়ের দিক থেকে তার বংশনামা হলো খাদিজা বিনতে ফাতেমা বিনতে যায়েদা বিন আসম (জুনদুব) বিন হাদাম বিন রাওয়াহা বিন হুজর বিন আবদ বিন মুয়িস বিন আমের বিন লুয়াই। -উসদুল গাবাহ, ৭/৮০

হজরত খাদিজা রা. বিধবা হওয়ার পর বহুলোক তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু তাকদিরের ফয়সালা ভিন্ন কিছু ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শামের ব্যবসা থেকে ফিরে আসেন তখন খাদিজা রা. তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব কবুল করেন। বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত তারিখে আবু তালেব, হজরত হামজা এবং বংশের অন্যান্য অভিভাবক একত্র হয়ে হজরত খাদিজা রা. এর বাড়িতে যান। হজরত খাদিজা রা. কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডেকে এনেছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবু তালেব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন। খুতবায় তিনি বলেন :

> সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদেরকে ইবরাহিম এবং ইসমাইল আ. এর সম্মানিত বংশ এবং মুদার বংশের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে তার ঘরের দেখাশোনাকারী এবং তার হারামের রক্ষক বানিয়েছেন। আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার একখানা ঘর প্রদান করেছেন, মানুষ যার জন্য তীর্থযাত্রা করে থাকে। আমরা তার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে এ সকল ফজিলত প্রদান করেছেন।
>
> হে লোকসকল, আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর ব্যাপারে কে অবগত নয়? নিঃসন্দেহে তার নিকট কোনো অর্থকড়ি নেই। কিন্তু সম্পদ তো মরীচিকার ন্যায়। এটা সাময়িক বিষয়।
>
> উপস্থিত ব্যক্তিগণ, আপনারা মুহাম্মদের বংশ সম্পর্কে জানেন। সে খুওয়ালিদের মেয়ে খাদিজাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। আমি তার বিয়েতে আমার সম্পদ থেকে মোহরস্বরূপ বিশটি উট ধার্য করছি। আল্লাহর শপথ আমার ভাতিজা অত্যন্ত সম্মানিত, সে বহু মর্যাদার অধিকারী।

আমর বিন আসাদের পরামর্শে মোহর হিসেবে পাঁচশ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়। এভাবে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হয়ে গোটা উম্মতের সম্মানিত মা হয়ে যান। ওই সময়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।[৪৪৮]

হজরত খাদিজা রা. সর্বপ্রথম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে সত্যায়ন করেন। তাকে সান্ত্বনা দেন। ইসলামের জন্য নিজের সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। তিনি মক্কি-জীবনে এমন কষ্ট সহ্য করেছেন, যা কেবল পাহাড়সম দৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিরাই পারে।[৪৪৯] এই কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خير نسائها خديجة بنت خويلد

উম্মতের শ্রেষ্ঠ নারী হলো খাদিজা।[৪৫০]

তিনি একবার যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা নিয়ে যাচ্ছিলেন। জিবরাইল আ. তখন মানুষের আকৃতিতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে জিবরাইল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, তাকে জান্নাতে একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করুন।[৪৫১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহিম ব্যতীত সকল সন্তান খাদিজা রা. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তার জীবদ্দশায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি। নববি দশম বছর রমজান মাসে হজরত খাদিজা রা. এর মৃত্যু হয়। তখন তার বয়স ছিল ৬০ বা ৬৫। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৪৯ বছর। তার মৃত্যুতে রাসুল সা. ভীষণ শোকাহত হয়ে পড়তে, যার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে থাকেন।[৪৫২]

---

[৪৪৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১৩২
এক মত অনুযায়ী খাদিজার বয়স ছিল ৩০ বা ৩৫ বছর। (সিরাতে হালাবিয়া, ১/২০৪; তারিখুল খামিস, ১/২৬৪) কোনো কোনো আলেম রাসুল সা. থেকে তার বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করতে দেখে এই মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা সাধারণত ৪০ বছর বয়সের পর সন্তান প্রসবের পরিমাণ ও শক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

[৪৪৯] আল ইসাবাহ, ৮/১০০

[৪৫০] সহিহ মুসলিম, ৬৪২৪

[৪৫১] সহিহ মুসলিম, ৬৪২৬; আল ইসাবা, ৮/১০৩; দালায়িলুন নুবুওয়াত, ২/৩৫৩, ৩৫৪

[৪৫২] আল ইসাবা, ৮/১০৩; দালায়িলুন নুবুওয়াত, ২/৩৫৩, ৩৫৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় খাদিজা রা. এর কথা স্মরণ করতেন। ঘরে কোনোদিন ভালো খানা তৈরি হলে তিনি তা খাদিজা রা. এর বান্ধবীদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।[৪৫৩]

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে আমার অন্য কারো প্রতি ততটা ঈর্ষা হতো না যতটা হজরত খাদিজার প্রতি হতো। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব স্মরণ করতেন।[৪৫৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের জন্য তার কোরবানির কথা স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন, আমি তার মতো কাউকে পাইনি। সকলেই যখন কুফরির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তখন সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সকলে যখন আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে, সে তখন আমাকে সত্যায়ন করেছে। লোকেরা যখন আমাকে ধনসম্পদ বঞ্চিত করে রেখেছিল তখন সে আমাকে তার সম্পদ দ্বারা উপকৃত করেছে। আল্লাহ তায়ালা তার গর্ভ থেকে আমাকে সন্তান দান করেছেন, অন্য কোনো স্ত্রী থেকে নয়।[৪৫৫] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৪৫৩] সহিহ মুসলিম, ৬৪৩০, ৬৪৩১

[৪৫৪] সহিহ বুখারি, ৩৮১৭

[৪৫৫] উসদুল গাবাহ, ৭/৮০ খাদিজা রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

হজরত সাওদা বিনতে যামআ রা.

তিনি কুরাইশের শাখা বনু আমের গোত্রের ছিলেন।[৪৫৬] তিনি প্রথমে সাকরান বিন আমর রা. এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হয়ে যায়। অন্যদিকে হজরত খাদিজা রা. এর মৃত্যুর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল। উসমান বিন মাযউন রা. এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম রা. একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনার একজন সমবেদনা দানকারী সঙ্গিনীর প্রয়োজন!!

তিনি বলেন, ঘরের কাজ এবং সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব আগে খাদিজা পালন করত।

খাওলা এটা শুনে সাওদা রা. এর নিকট যান। তার মাতা-পিতার সাথে রাসুলুল্লাহর সঙ্গে আত্মীয়তা করার বিষয়ে কথা বলেন।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে তার সঙ্গে সাওদা রা. এর বিয়ে হয়। মক্কায় থাকতেই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসেন। এটা হিজরতের দশম বছর রমজানের ঘটনা।

হজরত আয়েশা রা. তার প্রশংসা করে বলতেন, কারো দেহে আমার প্রাণ থাকবে- এটা সাওদা ব্যতীত কারো ব্যাপারে আমি এটা পছন্দ করি না (সাওদার বুদ্ধিমত্তার কারণে তিনি এটা বলেছিলেন)।

---

[৪৫৬] তাকে সাওদাও বলা হতো। পিতার দিক থেকে তার বংশ হলো সাওদা বিনতে যামআ বিন কায়েস বিন আবদে শামস বিন আবদুদ বিন নাসর বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমর বিন লুয়াই।
তার মা ছিলেন আনসারি। মায়ের দিক থেকে তার বংশ হলো, সাওদা বিনতে সামুছ বিনতে কায়েস বিন যায়েদ বিন আমর বিন লাবিদ বিন খিদাশ বিন আমের বিন আমের বিন গনাম বিন আদি বিন নাজ্জার। (উসদুল গাবাহ, সাওদা বিনতে যামআ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য)।

তিনিও হজরত আয়েশা রা. কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষদিনগুলোতে তিনি নিজের পালার দিনগুলো আয়েশা রা. কে প্রদান করেছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়হজে উম্মুল মুমিনিনদের অসিয়ত করেছিলেন, আমার পর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে। হজরত সাওদা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশনার উপর অত্যন্ত কঠোরভাবে আমল করতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আর হজ করার জন্য ঘর থেকে বের হননি। তিনি সবসময় ঘরে অবস্থান করতেন। বলতেন, আমি তো হজ-উমরা করে ফেলেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঘরে অবস্থান করছি।

তিনি স্বনির্ভরশীল ছিলেন। নিজ হাতে উপার্জন করে আহার করতেন। তায়েফ থেকে দাবাগতের জন্য চামড়া আসতো। তিনি দাবাগত করে তা বিক্রি করতেন। উপার্জনের বড় একটি অংশ তিনি সদকা করে দিতেন। কোথাও থেকে হাদিয়া পেলে তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন।

তিনি স্বভাবগতভাবে কিছুটা রসিক ছিলেন। একবার হজরত উমর রা. তার নিকট দিরহামের থলে পাঠান। যে ব্যক্তি তা নিয়ে আসে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, এতে কী আছে? সে বলল, দিরহাম।

তিনি বলেন, দেখতে তো এটা খেজুরের থলের মতো লাগছে।

এরপর তিনি সমস্ত দিরহাম মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাতেন। নফল নামাজে একবার তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি বলেন, রুকু এতো দীর্ঘ ছিল, আমার আশঙ্কা হচ্ছিল নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। এজন্য আমি নাক চেপে ধরে ছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে হেসে ফেলেন।[৪৫৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার হাস্যরসপূর্ণ কথাবার্তার মোড় বাস্তব দিকে ফিরিয়ে দিতেন। একদিন তিনি বলেন,

---

[৪৫৭] আল ইসাবা, ৮/১৯৭, ১৯৮

আল্লাহর রাসুল, যদি আমি মারা যাই তা হলে আপনার পূর্বে উসমান বিন মাযউন আমার জানাজা পড়াবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, যামআর মেয়ে, শোনো, যদি তুমি মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে তা হলে বুঝতে পারতে যে, এটা তোমার ধারণার চেয়েও কত বেশি কঠিন জিনিস।[৪৫৮]

হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালের শেষদিকে ২৩ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এক মত অনুযায়ী তিনি ৫৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কেউ দ্বিতীয় মতটিকে সঠিক বলে উল্লেখ করেননি।[৪৫৯] রাদিয়াল্লাহু আনহা

---

[৪৫৮] আয যুহদু ওয়ার রিকাক, ২৫০

[৪৫৯] উসদুল গাবাহ, ৭/১৫৭

হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর রা.

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মেয়ে ছিলেন। তার মাতার নাম উম্মে রুমান বিনতে আমের। হজরত খাদিজার মৃত্যুর পর উসমান বিন মাযউন রা. এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আর বিয়ে করবেন না? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাকে?

হজরত খাওলা রা. বলেন, কুমারীদের মধ্যে আয়েশা আছে আর বিধবাদের মধ্যে সাওদা বিনতে জামআ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের সাথে আলাপ-আলোচনা করার অনুমতি প্রদান করেন। এরপর খাওলার মধ্যস্থতায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে বিয়ে করেন।[৪৬০]

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই আয়েশা রা. এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের পর তাকে বলেন,

> أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، يَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ
>
> তোমাকে তিন রাত আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা সাদা রেশমি কাপড়ে তোমার আকৃতি নিয়ে এসে বলতেন, সে আপনার স্ত্রী।[৪৬১]

হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার বিয়ে হয়। বদর যুদ্ধের পর পর দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[৪৬০] উসদুল গাবাহ, ৭/১৮৬

[৪৬১] সহিহ মুসলিম, ২৪৩৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাগিনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের নামে তার উপনাম রেখেছিলেন উম্মে আবদুল্লাহ।

হজরত আয়েশা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয় বছরের সাহচর্য থেকে বহু উৎকর্ষ সাধন করেন। এর ফলে তিনি ইলম ও শরিয়তের গভীর জ্ঞানের উৎসে পরিণত হন।

সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, কোনো মাসআলায় আমাদের সন্দেহ হলে আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর নিকট সে বিষয়ের সমাধান পেতাম।

বড় বড় সাহাবি ও তাবেয়ি তার শাগরেদ ছিলেন।[৪৬২]

তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

فَضْلُ عائِشَةَ على النِّساءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على سائِرِ الطَّعامِ.

অন্যান্য সকল খাবারের উপর সারিদের (রুটি, গোশত ও ঝোলের মিশ্রণে তৈরি খাবারবিশেষ) শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সকল নারীর উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন।[৪৬৩]

জিবরাইল অহি নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাকে সালাম দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يا عائشةُ هذا جِبريلُ يقرأُ عليكِ السَّلامَ

হে আয়েশা, জিবরাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।

হজরত আয়েশা বলতেন,

وعليه السَّلامُ ورحمةُ اللهِ

তার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[৪৬৪]

আয়েশা সিদ্দিকা রা. গোটা মুসলিম উম্মাহর মা এবং তাদের ইলমি ও রুহানি নেত্রী। মুসলিমবিশ্বে তার চেয়ে বড় কোনো জ্ঞানী মুসলিম নারী নেই।

---

[৪৬২] সহিহ মুসলিম, আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর ফজিলত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

[৪৬৩] সহিহ মুসলিম, ২৪৩১

[৪৬৪] সহিহ মুসলিম, ৬৪৫৪, সুনানে আবু দাউদ, ৫২৩২, সুনানে তিরমিজি, ৩৮৭৬

অংক এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে তার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। সাহাবি ও তাবেয়িগণ মিরাসের মাসাআলা জিজ্ঞাসার জন্য তার নিকট আসতেন। উরওয়া বিন যুবাইর রা. বলেন, আমি ফিকহশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনিনের চেয়ে অগ্রসর কাউকে দেখতে পাইনি।[৪৬৫]

তিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাফসির এবং হাদিসের জ্ঞানার্জন করেছেন। পিতা থেকে তিনি কাব্য এবং বংশবিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেন।[৪৬৬] তার থেকে প্রায় আড়াই হাজার হাদিস বর্ণিত রয়েছে।[৪৬৭]

তিনি ভালোমানের ডাক্তার ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহিরাগত মেহমানদের কেউ অসুস্থ হলে রাসুল তাদের চিকিৎসা করতেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ মুখস্থ করে নিতেন। এইভাবে তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকে পরিণত হন।[৪৬৮]

দুনিয়াবিমুখতা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। সকালে তার নিকট হাজার হাজার দিরহাম-দিনার আসত। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত তা গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করতে থাকতেন। একবার কোনো এক জায়গা থেকে এক লক্ষ দিরহাম তার নিকটে আসে। তিনি সন্ধ্যার মধ্যে সব সদকা করে দেন। তিনি সে-দিন রোজা রেখেছিলেন। সদকা বণ্টন করতে করতে যেন তিনি রোজার কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। এক নারী সাহাবি তাকে বলল, ইফতারের জন্য একটি দিরহাম রাখলে গোশত দিয়ে ইফতারি করা যেত।

তিনি বললেন, তুমি তখন এটা মনে করিয়ে দিলে একটা কথা ছিল।

---

[৪৬৫] আল ইসাবা, ৮/২২৩

[৪৬৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৯৭

[৪৬৭] ইমাম আহমদ রহ. আপন মুসনাদগ্রন্থে তার থেকে ২৪০৩টি হাদিস সংকলন করেছেন। দেখুন, মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ২৪০১০-২৬৪১৩

[৪৬৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৮২, ১৮৩

সাহিত্য ও বাগ্মিতায় তার ভালো দখল ছিল। বড় বড় সাহিত্যিকরা স্বীকার করতেন যে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় কোনো বাগ্মী এবং সাহিত্যিক নেই।[৪৬৯]

৫৮ হিজরিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। রমজানকে রাতের বেলা তিনি এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন। হজরত আবু হুরাইরা রা. তারাবির নামাজের পর তার জানাজার নামাজ পড়ান।[৪৭০]

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা অন্যকোনো সাহাবির হাসিল হয়নি।

১. তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী এবং সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীর মেয়ে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতেন। হজরত আমর একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী কে? তিনি বলেন, আয়েশা। তিনি এরপর জিজ্ঞেস করেন, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন, তার পিতা।[৪৭১]

২. তিনিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন।

৩. মৃত্যুর সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা তার কোলে ছিল।

৪. তার কামরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করা হয়।

৫. তার সঙ্গে শুয়ে থাকাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অহি অবতীর্ণ হতো। অন্যান্য স্ত্রীর এ মর্যাদা লাভ হয়নি।

৬. তার পবিত্রতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত যা তেলাওয়াত হতে থাকবে। সালাফে সালেহিন বলেন, হজরত আয়েশা রা. এর যদি অন্য কোনো ফজিলত নাও থাকতো তবু ইফকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের মাধ্যমে পবিত্রতার ঘোষণা দেওয়াটা তার ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের অনস্বীকার্য দলিল।

---

[৪৬৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/১৯২

[৪৭০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৯২

[৪৭১] সহিহ বুখারি, ৩৬৬২

৭. এক সফরে তার হার হারিয়ে যায়। তালাশ করতে করতে ফজরের নামাজের সময় হয়ে যায়। তখন সেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তখন অহি পাঠিয়ে তায়াম্মুমের পদ্ধতি বাতলে দেন। উম্মতের জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ তার এক বরকত, যা কেয়ামত অবধি বিদ্যমান থাকবে।

৮. তিনি সেই ছয় সাহাবির একজন, যাদের থেকে অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২৪০৪টি।

৯. সকল নারী সাহাবি এবং অধিকাংশ পুরুষ সাহাবির চেয়েও তিনি ইলমি যোগ্যতার দিক দিয়ে অগ্রগামী ছিলেন। প্রবীণ সাহাবিগণ মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলে তার থেকে উপকৃত হতেন। হজরত আতা বিন আবি রাবাহ রহ. বলেন, হজরত আয়েশা রা. সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং সর্বাধিক বিচক্ষণ নারী ছিলেন।[৪৭২] রাদিয়াল্লাহু আনহা

[৪৭২] উসদুল গাবাহ, ৭/১৮৬
উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. এর পিতৃবংশের আলোচনা হজরত আবু বকর সিদ্দিকের জীবনীতে চলে এসেছে।
মায়ের দিক থেকে তার বংশ হলো, আয়েশা বিনতে উম্মে রুমান বিনতে আমের বিন উয়াইমির বিন আবদে শামস দিন আত্তাব বিন উয়াইনা বিন সুবাই বিন দাহমান বিন হারিস বিন গানাম বিন মালেক কিনানা।

হজরত হাফসা বিনতে উমর রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা. আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রা. এর মেয়ে এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর বোন ছিলেন। হজরত হাফসা রা. আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর ছয় বছরের বড় ছিলেন। তাদের উভয়ের মা হলেন হজরত যায়নাব বিনতে মাযউন রা.।[৪৭৩]

মায়ের দিক থেকে তার বংশ হলো, হাফসা বিনতে যায়নাব বিনতে মাযউন বিন ওয়াহাব বিন হুজাফা।[৪৭৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন নবুওয়াত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে হাফসার জন্ম হয়। কুরাইশরা তখন নতুনভাবে কাবাঘর নির্মাণ ও মেরামত করছিল। হাফসা রা. এর যখন কিছুটা বয়স হয় তখনই তার পিতা হজরত উমর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে হজরত হাফসা রা. অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন।[৪৭৫]

তার সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। তিনি বড় ধরনের বাগ্মী ছিলেন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার আলেম নারী ছিলেন। কুরআন মাজিদের হাফেজা ছিলেন। প্রথমে খুনাইস বিন হুজাফা রা. এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। (খুনাইস প্রথম সারির সাহাবিদের একজন ছিলেন। তিনি মুসাইলামা কাজ্জাবের হাতে শহিদ-হওয়া আবদুল্লাহ বিন হুজাফা রা. এর ভাই ছিলেন।)

খুনাইস বিন হুজাফা রা. হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি হাফসা রা. কে নিয়ে মদিনায় হিজরত

---

[৪৭৩] পিতার দিক থেকে তার বংশ হলো, হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আবদুল উজ্জা বিন রয়াহ বিন আবদুল্লাহ বিন কাত বিন যরাহ বিন আদি বিন কাব বিন লুয়াই। আল ইসতিয়াব, ৪/১৮১১

[৪৭৪] উসদুল গাবাহ, হাফসা বিনতে উমর রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৪৭৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২২৭, যিরিকলিকৃত আল আ'লাম, ২/২৬৪

করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে হজরত উসমান বিন মাযউন রা. এর সাথে দাফন করা হয়। এর ফলে হজরত হাফসা রা. যুবাবয়সেই বিধবা হয়ে যান। স্বামী-বিচ্ছেদের কারণে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। হজরত উমর রা. তাকে সাহস ও মনোবল যোগাতে থাকেন।[৪৭৬]

হজরত হাফসা রা. এর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর হজরত উমর তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজতে থাকেন। সর্বপ্রথম তিনি উসমান রা. এর কথা চিন্তা করেন। কেননা, তার স্ত্রী হজরত রুকাইয়া রা. কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু উসমান রা. এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি হজরত আবু বকর রা. এর নিকট প্রস্তাব রাখেন। তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন।

তাদের অনাগ্রহ হজরত উমর রা. এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, চিন্তা করো না। উসমানের জন্য হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী মিলে যাবে আর হাফসার জন্য উসমানের চেয়ে উত্তম স্বামীর ব্যবস্থা হবে।

কিছুদিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই হাফসা রা. কে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ বরকতময় বিয়ে পরবর্তীতে কার্যত সংঘটিত হয়। এটা হিজরি তৃতীয় বর্ষের ঘটনা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহর হিসেবে চারশ দিরহাম নির্ধারণ করেন। ওই সময় হাফসা রা. এর বয়স ছিল উনিশ বছর। বিয়ের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. উমর ফারুক রা. কে বলেন, 'যখন তুমি আমার নিকট হাফসার ব্যাপারে কথা বলেছিলে তখন আমি উত্তর না দেওয়ায় সম্ভবত তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ।'

তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

হজরত আবু বকর রা. বলেন, এর একমাত্র কারণ এটাই ছিল যে, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাফসার ব্যাপারে কথা বলতে

---

[৪৭৬] আল ইসতিয়াব, ৪/১৮১১

শুনেছি। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। এজন্য আমি তোমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নীরবতা অবলম্বন করেছি। যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে না করতেন তা হলে আমি তোমার আবেদন অবশ্যই কবুল করতাম।[৪৭৭]

হজরত হাফসা রা. সেই পাঁচজন উম্মুল মুমিনিনদের একজন যারা কুরাইশ বংশের ছিলেন। সেই পাঁচজন হলেন হজরত সাওদা, হজরত আয়েশা, হজরত হাফসা, হজরত উম্মে হাবিবা, হজরত উম্মে সালামা। রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না।

ইবাদত ও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উঁচুস্তরের অধিকারী ছিলেন। তিনি এত অধিক নামাজ রোজা আদায় করতেন যে, হজরত জিবরাইল আ. তার ব্যাপারে বলেন,

إنها صوامة، قوامة

নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত রোজাদার এবং তাহাজ্জুদগুজার নারী।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি এবং তার নৈকট্য লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। পিতা হজরত উমর ফারুক রা. এর খেদমতের প্রতি তিনি পূর্ণ খেয়াল রাখতেন।[৪৭৮]

লেখাপড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তার। তিনি কুরআন-হাদিসের বহু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তার থেকে প্রায় ষাটটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা তার ইলমি আগ্রহের প্রমাণ বহন করে।

তার মেধা অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং যারা হুদাইবিয়ার গাছের নিচে আমার হাতে বাইয়াত হয়েছে ইনশাআল্লাহ তাদের কেউ দোযখে যাবে না।

---

[৪৭৭] সহিহ বুখারি, ৪০০৫

[৪৭৮] উসদুল গাবাহ, ৭/৬৭

একথা শুনে হজরত হাফসা রা. জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তায়ালা তো কুরআনে বলেছেন,

وان منكم إلا واردها

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না।[৪৭৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা এর সাথে এটাও বলেছেন;

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

অতঃপর আমি পরহেযগারদের উদ্ধার করব এবং জালেমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।[৪৮০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোনো কারণে হাফসা রা. কে এক তালাক দিয়ে দেন। হজরত উমর ফারুক রা. এই কারণে এক মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখ পান।

অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাইল আ. এসে আমাকে বলেছেন, হাফসার তালাক প্রত্যাহার করে নিন। কেননা সে অত্যন্ত রোজাদার এবং ইবাদতগুজার পরহেজগার নারী। সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী হবে।[৪৮১]

হজরত উমর ফারুক রা. এর পরামর্শে যখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. কুরআন মাজিদ একত্র করার সিদ্ধান্ত নেন তখন কুরআন মাজিদ হেফাজতের জন্য হাফসা রা. কে নির্বাচন করা হয়। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নির্দেশে হজরত যায়েদ বিন সাবেত রা. কুরআন মাজিদের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এই সংকলনটি প্রথমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর নিকট ছিল। এরপর হজরত উমর রা. এর নিকট আসে। তিনি হজরত হাফসা রা. কে এটা সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মুসহাফটি প্রায় পনেরো বছর তার নিকট সংরক্ষিত থাকে। হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনকালে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলে হজরত উসমান রা. হজরত হাফসা রা. থেকে

---

[৪৭৯] সুরা মারয়াম, আয়াত ৭১
[৪৮০] সুরা মারয়াম, আয়াত ৭২
[৪৮১] ইবনে আবি আসেম কৃত আল আহাদ ওয়াল মাসানি। হাদিস ৩০৫২

মুসহাফটি নিয়ে তার কয়েকটি কপি প্রস্তুত করেন। এরপর এটা পুনরায় হাফসা রা. এর নিকট ফিরিয়ে দেন। হজরত হাফসা রা. অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার পর এটা আমার ভাই আবদুল্লাহ বিন উমরের হেফাজতে থাকবে। এভাবে তিনি কুরআন মাজিদ সংরক্ষণে বিরাট অবদান রাখেন।[৪৮২]

তিনি পিতার মতোই অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। এজন্য তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। সারাজীবন তিনি নফল রোজার প্রতি যত্নবান ছিলেন। শেষবয়সে তিনি লাগাতার রোজা রেখেছেন।[৪৮৩]

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি বাগানের কিছু অংশ পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেটাও সদকা করে দিয়েছেন।

সঠিক মত অনুযায়ী ৪৫ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। এক অনির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ২৭ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। মদিনার গভর্নর মারওয়ান তার জানাজার নামাজ পড়ান। হজরত আবু হুরাইরা রা. তার জানাজার নামাজে শরিক ছিলেন। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়। ভাইদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এবং আসেম, ভাতিজাদের মধ্যে হজরত সালেম, হজরত হামজা এবং হজরত আবদুল্লাহ রহ. কবরে নেমেছিলেন।[৪৮৪] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৪৮২] আল কামিল ফিত তারিখ, ২/৪৮২

[৪৮৩] আল ইসাবা, ৮/৮৬

[৪৮৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৮৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২২৯

শিশু সালামাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে বের হন। পরিবারের লোকেরা পথরোধ করে দাঁড়ায়। তার স্বামী বাধ্য হয়ে তাকে এবং তার বাচ্চাকে রেখে একাই মদিনায় চলে যান। ওই দিকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে তার থেকে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। ছিলেন আত্মমর্যাদাশীল এবং সহানুভূতিপ্রবণ। আপন স্বামী এবং সন্তানের বিচ্ছেদের কারণে প্রতিদিন বিরাণ জায়গায় চলে যেতেন। সেখানে তিনি অঝোরধারায় কাঁদতেন। পরিবারের লোকেরা এতেও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছিল না।

কিছুলোক উম্মে সালামার এই করুণ দশার কারণে তার পরিবারের লোকদেরকে তিরস্কার করে। অবশেষে আবু সালামার বাড়ির লোকেরা বাচ্চাটিকে তার মায়ের নিকট সোপর্দ করে। এবং তাকে মদিনায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। তার এত সাহস ছিল যে, তিনি একাই উটে চড়ে এই দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য বের হয়ে যান। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তায় কাবা শরিফের চাবি বহনকারী উসমান বিন তালহার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে যায়। তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ছিলেন। উম্মে সালামা রা. কে তিনি মদিনায় পৌঁছে দিয়ে যান। যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনী পরিবারের মেয়ে ছিলেন। মদিনাবাসীরা বিশ্বাস করতে পারছিল না তিনি প্রকৃতপক্ষেই আবু উমাইয়ার মেয়ে, যে এত কষ্ট নিয়ে সফর করে মদিনায় আসতে পারে!

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব ভালোবাসা ছিল। তারা মদিনায় কিছুকাল একসঙ্গে কাটান। আবু সালামা রা. বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যেই তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তখন উম্মে সালামা রা. স্বামীকে বলেন, শুনেছি কোনো নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয় বিয়ে না করে এবং স্বামী জান্নাতি হয় তা হলে আল্লাহ তায়ালা উভয়কে জান্নাতে একত্র করবেন। চলো, আমরা শপথ করি যে, তুমি আমার মৃত্যুর পর কোনো বিয়ে করবে না। আমিও তোমার মৃত্যুর পর কোনো বিয়ে করব না।

আবু সালামা রা. বলেন, তুমি কি আমার কথা মান্য করবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তখন তিনি বলেন, যদি আমি প্রথমেই মারা যাই তা হলে তুমি অবশ্যই দ্বিতীয় বিয়ে করে নিবে।

এটা বলে তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমার পর উম্মে সালামাকে আমার চেয়ে উত্তম মানুষের ব্যবস্থা করে দিয়ো, যে তাকে কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট দেবে না।

উম্মে সালামা চিন্তা করতে লাগলেন তার চেয়ে উত্তম আর কে তার জীবনসঙ্গী হতে পারে![৪৮৮]

আবু সালামা রা. তাকে একটি হাদিস শোনান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ বিপদে আক্রান্ত হলে সে যেন বলে,

إِنَّا للهِ وإنا إِليهِ راجعونَ

এবং এই দোয়াটি পড়ে-

اللَّهمَّ عندَكَ احتَسبتُ مُصيبَتِي فأُجُرْني فيها وأبدِلني مِنها خيرًا

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আমার মুসিবতের প্রতিদান চাই। আমাকে তার প্রতিদান দিন এবং তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করুন।

কিছুদিন পর আবু সালামা রা. মৃত্যুশয্যায় নিপতিত হয়ে যান। তিনি অন্তিম মুহূর্তে এই দোয়া করতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার পরিবারকে উত্তম আশ্রয় দান করুন।' এরপর তার মৃত্যু হয়।[৪৮৯]

তার মৃত্যুশোকে উম্মে সালামা রা. ভেঙ্গে পড়েন। আফসোস এবং দুঃখে তার মুখ থেকে বের হয়, আফসোস, ভিনদেশে মৃত্যু চলে এলো! আমি তার জন্য এমনভাবে বিলাপ করব, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে তাকে এমনটি করতে নিষেধ করেন এবং ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেন।[৪৯০]

উম্মে সালামা রা. রাসুলের শেখানো দোয়াটি اللَّهمَّ عندَكَ احتَسبتُ مُصيبَتِي فأُجُرْني فيها وأبدِلني مِنها خيرًا পড়তে থাকেন; কিন্তু এই দোয়ার শেষাংশে তার

---

[৪৮৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০৩; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৮৭

[৪৮৯] মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৬৯

[৪৯০] সহিহ মুসলিম, ২১৭৩

সবসময় এই ধারণা আসতে থাকে যে, আবু সালামার চেয়ে উত্তম সঙ্গী আর কে হতে পারে?[৪৯১]

উম্মে সালামা রা. তখন থেকে আরেক জীবনসঙ্গীর আশায় দিন কাটাতে থাকেন। হাবশাতেই তার গর্ভে উমর বিন সালামা জন্মগ্রহণ করেন।[৪৯২]

কিছুদিন পর জুমাদাল উখরা চতুর্থ হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি উত্তরে বলেন, আমি এক

---

[৪৯১] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৫৯৮, মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৬৯

[৪৯২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৮৯

ফায়দা : ওই সময় উম্মে সালামা রা. এর চার সন্তান ছিল। সালামা, উমর, যায়নাব এবং দুররা (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৭, উমর বিন আবু সালামার জীবনী দ্রষ্টব্য)। বড় ছেলে আপন মায়ের বিয়েতে অভিভাবক হয়েছিল। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনে ইসহাকের বর্ণনার উপর নির্ভর করে এটাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন যে, সালামা সবচেয়ে বড় ছিল এবং সে-ই বিয়ের অভিভাবক হয়েছে। (আল ইসাবা, ৩/১২৬)

কিন্তু নাসায়ির এক বর্ণনা অনুযায়ী উম্মে সালামা উমর বিন আবু সালামাকে বিয়ের ওলি বানিয়েছিলেন। (সুনানে নাসায়ি, ৩২৪৫)

আলবানি এই বর্ণনাটিকে যয়িফ বলেছেন। তবে আমি যতদূর এই বর্ণনার সনদ দেখেছি, তার মধ্যে কোনো রাবিকে যয়িফ পাইনি। হ্যাঁ, ইবনে উমর (মুহাম্মদ বিন উমর বিন আবু সালামা) নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের রাবি; অর্থাৎ তিনি মাকবুল। তাই বর্ণনাটি অবশ্যই কমপক্ষে হাসান হবে। এটাও সম্ভব যে, সালামাই বড় ছেলে ছিল; তবে তার ছোট ভাই উমর বিন আবু সালামা বিয়ে পড়িয়েছে। মোটকথা, এরপর উমর বিন আবু সালামা রাসুল সা. এর নিকট প্রতিপালিত হন। রাসুল সা. তাকে খাওয়ার আদব শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহ বলে খাবে। ডান হাতে খাবে। সামনে থেকে খাবে। (সহিহ মুসলিম, ৫৩৮৮, সুনানে তিরমিজি, ১৮৫৮)

ধারণা করা যায়, তিনি সে সময় বয়ঃসন্ধিকালের নিকটবর্তী ছিলেন। কেননা রাসুল সা. এর জীবদ্দশায় অর্থাৎ সাত বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তিনি রাসুল সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রোজাদার চুমু দিতে পারে কিনা। (সহিহ মুসলিম, ২৬৪৪)

হজরত আলি রা. মদিনা থেকে ইরাক যাওয়ার সময় উম্মে সালামা রা. কে সেখানে যাওয়ার আবেদন করেন। তিনি নিজের পরিবর্তে উমর বিন আবু সালামা রা. কে পাঠান। উমর বিন আবু সালামা রা. দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকালে ৮৩ হিজরিতে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৪০৫)

আত্মমর্যাদাশীল নারী। আমার বয়স অনেক হয়েছে। তা ছাড়া আমাকে সন্তানদের দেখাশোনা করতে হয়।[৪৯৩]

তিনি ওজর হিসেবে এটাও পেশ করেন যে, আমার অভিভাবকদের কেউই এখানে নেই।

এ সমস্ত ওজর সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করতে চান। সন্তানদের ব্যাপারে তিনি বলেন, তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বয়সের ব্যাপারে বলেন, আমি তোমার চেয়ে অধিক বয়স্ক। অভিভাবক না থাকার ব্যাপারে বলেন, তোমার অভিভাবকদের কেউ এই বিয়েতে আপত্তি জানাবে না। এরপর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বিয়ে হয়ে যায়।[৪৯৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুটি চাক্কি, একটি মটকা এবং খেজুরের ছাল দিয়ে তৈরি একটি বালিশ প্রদান করেন। এই সামানা তিনি অন্যান্য স্ত্রীকেও দিয়েছিলেন।[৪৯৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আলাদা একটি কামরায় নিয়ে আসেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি দেখলাম সেখানে একটি ঘরে সামান্য যব, একটি চাক্কি, একটি পাতিল এবং চর্বির তেলের কুপি আছে। আমি যব বের করে চাক্কি দ্বারা সেটা পেষণ করি। এরপর তা পাতিলে চড়িয়ে তেল মিশিয়ে খাবার রান্না করি।

এটা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার স্ত্রীর বাসর রাতের খাবার।[৪৯৬]

হাদিসের বর্ণনাকারীগণ এ ঘটনা শুনে বলেন, এক আরব-সরদারের মেয়ে নবীকুল-সরদারের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রাতের শুরুতে তিনি দুলহান ছিলেন আর রাতের শেষভাগে নিজেই চাক্কি পেষণ করছিলেন।[৪৯৭]

---

[৪৯৩] তাবারানি কৃত মুজামুল কাবির, ২৩/২৪৭

[৪৯৪] সুনানে নাসায়ি, ৩২৫৪; মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৬৯, ২৬৭২২

[৪৯৫] মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৬৯

[৪৯৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৯১

[৪৯৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৯১

বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত ছিলেন। হুদাইবিয়ার সফরে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি ছিলেন। আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, এ বছর উমরা করা যাবে না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ইহরামের পোশাক খুলে কোরবানি করার এবং মাথা মুণ্ডানোর নির্দেশ দেন। যেহেতু সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যত মুসলমানদের প্রতিকূলে ছিল তাই হজরত উমর রা. এর মতো সাহাবি দুঃখভারাক্রান্ত ছিলেন। উপরন্তু উমরা না করাটা তার এ দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কেউই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন করছিলেন না।

উম্মে সালামা রা. এই অবস্থা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দেন, আপনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কোরবানি করে ফেলুন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে নিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরামর্শের উপর আমল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে সাহাবায়ে কেরাম পাগলের মতো তার অনুসরণ করে ইহরামের পোশাক খুলে ফেলেন।[৪৯৮]

হাদিস মুখস্থ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেণি বাঁধছিলেন। এমন সময় মসজিদে নববি থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বলছেন, হে লোকসকল! উম্মুল মুমিনিন তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পুরো খুতবা শ্রবণ করেন।[৪৯৯]

ইলমের প্রতি এই আগ্রহের কারণে তিনি নারী ফকিহ সাহাবিদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন।[৫০০]

জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে হজরত আয়েশা রা. এর পরই তার অবস্থান ছিল। বিশেষ করে তিনি পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়ে অধিক পরিমাণে জিজ্ঞেস করতেন। তার থেকে ৩৭৮টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[৫০১]

---

[৪৯৮] সহিহ বুখারি, ২৭৩১

[৪৯৯] মুসনাদে আহমদ, ২৬৫৪৬

[৫০০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০৩

[৫০১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২১০

তার অধিকাংশ বর্ণনা অত্যন্ত উঁচুমানের। অর্থাৎ এগুলো বুখারি, মুসলিমে রয়েছে। সাহাবি ও তাবেয়িগণ তার নিকট মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন। মদিনার শাসক মারওয়ান লোক পাঠিয়ে তার নিকট মাসআলা জানতে চাইতেন। তিনি বলতেন, উম্মাহাতুল মুমিনিন থাকতে আমরা কেন অন্যদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করবো।[৫০২]

হজরত আবু হুরাইরা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মতো বড় বড় সাহাবি বিভিন্ন সময় তার থেকে উপকৃত হতেন।[৫০৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, তার ফাতাওয়াসমূহ সংকলন করা হলে এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হয়ে যাবে।[৫০৪]

তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতেন। তার কণ্ঠস্বর সুমধুর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তেলাওয়াত করতেন, তিনি সেভাবেই তেলাওয়াত করতেন। কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত-পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতোই তেলাওয়াত করে শোনাতেন।[৫০৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন। এক সফরে হজরত বেলাল এবং আবু মুসা আশআরি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত পানি পান করছিলেন। এটা দেখে পর্দার আড়াল থেকে তিনি আওয়াজ দেন, তোমাদের মায়ের জন্য কিছু পানি রেখো।

তারা কিছু পানি তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৫০৬]

তিনি বরকতস্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। লোকজনকে তিনি তা দেখাতেন।[৫০৭]

---

[৫০২] মুসনাদে আহমদ, ২৬৬৯৬
[৫০৩] মুসনাদে আহমদ, ২৫৬৭৩, ২৬৫৮৬
[৫০৪] ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, ১/১০
[৫০৫] মুসনাদে আহমদ, ২৬৫৮৩
[৫০৬] সহিহ বুখারি, ৪৩২৮

হজরত উম্মে সালামা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সকল স্ত্রীর মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫০৮]

তার ছেলে উমর রা. এবং সালামা রা. দাফনের সময় তার কবরে নেমেছিলেন।[৫০৯] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫০৭] মুসনাদে আহমদ, ২৬৫৩৫

[৫০৮] আল ইসাবা, ৮/৪১২; যদিও তার মৃত্যুর ব্যাপারে ৫৯ হিজরি ও ৬১ হিজরির মত রয়েছে, কিন্তু ৬৪ হিজরির মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। ৬৩ হিজরির ২৭ জিলহজ হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়। এর তিনদিন পর মদিনায় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এরপর মুসলিম বিন উকবা ৬৪ হিজরির মহররম মাসের শুরুতে মদিনাবাসী থেকে জোরপূর্বক বাইয়াত নেওয়া শুরু করলে তিনি একে বাইয়াতে যালালাত আখ্যা দেন। (আল ইসাবা, ৪/১১) এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই জানা যাচ্ছে ৬৪ হিজরির শুরু দিকে তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর এ বছরই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

[৫০৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৯৬

নোট : তাবাকাতে ইবনে সাদের এই বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স দাঁড়ায় ৮৪ বছর। এই বর্ণনা অনুযায়ী চতুর্থ হিজরিতে রাসুল সা. এর সঙ্গে তার বিয়ের সময় বয়স ছিল ২৪ বছর। কিন্তু আল্লামা যিরিকলি বলেছেন, হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে তার জন্ম হয়েছে (আল আলাম, ৮/৯৭)। এই হিসেবে বিয়ের সময় তার বয়স দাঁড়ায় ৩২ বছরে। রাসুল সা. তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে। এই উক্তির মাধ্যমে যিরিকলির মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। অন্যথায় ২৪ বছর বয়স তো বিয়ের অত্যন্ত উপযোগী সময়। এই দ্বিতীয় মত অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার বয়স দাঁড়ায় ৯২ বছরে।

হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন ছিলেন। পিতার দিক থেকে তার বংশনামা হলো যায়নাব বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব বিন ইয়ামুর বিন সুবরাহ বিন মুররা বিন কাসির বিন গনাম বিন দুদান বিন আসাদ বিন খুজাইমা। এ বংশকে বনু আসাদ বলা হতো।

মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা হলো, যায়নাব বিনতে উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেম।[৫১০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসা রা. এর নিকট বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু যায়েদ একসময় গোলাম ছিলেন একারণে যায়নাবের তাকে পছন্দ হয়নি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে তিনি রাজি হয়ে যান।

প্রায় এক বছর পর্যন্ত তিনি হজরত যায়েদ রা. এর বিবাহবন্ধনে ছিলেন। কিন্তু যায়েদ রা. এর সাথে তার বনিবনা হচ্ছিল না। সবসময় তাদের মধ্যে সমস্যা লেগেই থাকত। অবশেষে যায়েদ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনোভাবেই মিল হচ্ছিল না। অবশেষে যায়েদ রা. তাকে তালাক দিয়ে দেন।

যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার কারণে হজরত যায়নাব রা. যায়েদ রা. কে বিয়ে করেছেন; তাই তালাকের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব রা. এর ভাঙ্গামন ঠিক করার জন্য তাকে বিয়ে করাটাই সঠিক মনে করেন। কিন্তু সমস্যা হলো,

---

[৫১০] উসদুল গাবাহ, যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

আরববাসীরা পালকপুত্রকে আপন পুত্রের মতো মনে করত। এজন্য আশঙ্কা ছিল মানুষ বলবে মুহাম্মদ আপন পুত্রবধূকে বিয়ে করেছে। যেহেতু এটা জাহিলিযুগের কুসংস্কার ছিল আর নবীদের জন্য কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক, এজন্য নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহপাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন; অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যায়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পালকপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।[৫১১]

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিজেই যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. কে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য বিয়ের ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক ছিল না। এমনকি আলাদাভাবে বিয়ের কোনো অনুষ্ঠান হয়নি; বরং আল্লাহর বাণী-

زَوَّجْنَاكَهَا

আমি তার সঙ্গে আপনার বিবাহ সম্পাদন করেছি।

এর মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়েছে।

এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা। ওই সময় তার বয়স ছিল ২৫ বছর।[৫১২]

---

[৫১১] সুরা আহযাব, আয়াত ৩৭

[৫১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২১১-২১৭

এর মাধ্যমে সকলেই ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, পালক সন্তান প্রকৃত সন্তানের মতো নয়। পালকপুত্রের স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পিতার জন্য সে হারাম হয়ে যায় না। যারা শরিয়তের হালাল বিষয়কে হারাম মনে করেছিল, তারা এর মাধ্যমে বাস্তবতা বুঝতে পারে। উপরন্তু এর মাধ্যমে জাহেলিযুগের কুসংস্কার দূর হয়। আর এই প্রাচীন কুসংস্কার ওই সময়ই দূর হতে পারত যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এমনটা করে দেখাবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত রহমত এবং বরকতের কারণ হয়। শতাব্দী ধরে যেই কুসংস্কার চলে আসছিল, মানুষ তা থেকে মুক্তি পায়।[৫১৩]

এ বিয়ের ব্যাপারে বহু অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, যা সম্পূর্ণ দুর্বল। অনেক ঐতিহাসিক এবং মুফাসসির এগুলো কোনো ধরনের বাছবিচার ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তবে মুহাক্কিকগণ দলিলের মাধ্যমে এগুলো খণ্ডন করেছেন।

হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর কিছু উত্তম গুণ ছিল, যেগুলো তাকে অন্যান্য উম্মুল মুমিনিন থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু উমাইয়ার মেয়ে ছিলেন। উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী আত্মীয় ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিনগণ সকলেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি থেকে বেশি নৈকট্যের আশা রাখতেন। কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর পর এটা হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর নসিব হয়েছে। এজন্য হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, তিনি আমার সমপর্যায়ের ছিলেন।

যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. অত্যন্ত নেককার, সৎ, রোজাদার, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ নারী ছিলেন। রাতের বেলা জাগ্রত থেকে তাহাজ্জুদ পড়তেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَوَّاهَةٌ

---

[৫১৩] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আহযাব, আয়াত ৩৭

নিশ্চয়ই যায়নাব বিনতে জাহাশ অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়কারিণী।

তিনি দানশীলতার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। নিজহাতে উপার্জন করতেন। আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে সবার পূর্বে আমার সাথে মিলিত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর উম্মাহাতুল মুমিনিন একে অপরের হাত মাপতে থাকেন। হজরত সাওদা রা. দীর্ঘকায় ছিলেন। এজন্য তার হাত বেশি লম্বা ছিল। সকলে মনে করেছিল উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে তিনিই সবার আগে মৃত্যুবরণ করবেন। যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর গঠন তুলনামূলক খাটো ছিল। এজন্য তার দিকে কারো মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে তিনিই সবার পূর্বে ইনতেকাল করেন। এটা ২০ হিজরির ঘটনা। তখন সকলে বুঝতে পারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা হাতের দ্বারা দানশীলতা উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. সকলের ঊর্ধ্বে ছিলেন।[৫১৪] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫১৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২১১-২১৮

হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রা.

হজরত উম্মে হাবিবা রা. কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ানের মেয়ে ছিলেন। তিনি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দুধবোন ছিলেন। তার আসল নাম রমলা। উপনাম উম্মে হাবিবা। তিনি এর মাধ্যমেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন।

পিতার দিক থেকে তার বংশনামা হলো, রমলা বিনতে সাখার বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস।

মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা হলো, রমলা বিনতে সাফিয়া বিনতে আবুল আস। আবুল আসের মাধ্যমে তার বংশ উসমান রা. এর সাথে মিলে যায়। আত্মীয়তার সম্পর্কে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন।

ইসলামের শুরু যুগে তিনি ঈমান এনেছেন। শামে উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। উবাইদুল্লাহ সেখানে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও হাবিবা রা. ইসলামের উপর অটল থাকেন।[৫১৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই অজানা-অচেনা ভূখণ্ডে তার দুর্দশা সম্পর্কে এবং এমন কঠিন মুহূর্তেও ইসলামের উপর তার অবিচল থাকার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি হাবশার বাদশাহ নাজাশির নিকট তার সঙ্গে আত্মীয়তার ব্যাপারে কথা বলার জন্য সংবাদ পাঠান। তিনি বলেন, যদি সে রাজি হয়ে যায় তা হলে আমার সঙ্গে তাকে বিয়ে পড়িয়ে দেবে। হজরত উম্মে হাবিবা রা. এই সৌভাগ্য কবুল করে নেন। নাজাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উকিল হয়ে চার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করে বিয়ে পড়িয়ে দেন।

---

[৫১৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৯৬

এই বিয়ের কিছুদিন পরেই নাজাশি উম্মে হাবিবা রা. কে শুরাহবিল বিন হাসানা রা. এর সাথে মদিনায় পাঠিয়ে দেন।[৫১৬]

উম্মে হাবিবা রা. অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ছিলেন। তার পিতা আবু সুফিয়ান ইসলামগ্রহণের পূর্বে একবার কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির জন্য দূত হিসেবে মদিনায় এসেছিলেন। এর মধ্যে তিনি আপন মেয়ের ঘরে আসেন। এ সময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসতে উদ্যত হলে উম্মুল মুমিনিন সঙ্গে সঙ্গে বিছানা উঠিয়ে নেন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এই বিছানা আল্লাহর রাসুলের। আর আপনি তো একজন নাপাক মুশরিক।'[৫১৭]

তিনি উম্মুল মুমিনীন হওয়ার মর্যাদা লাভ করার পাশাপাশি হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বোন হওয়ার কারণে মুসলিমবিশ্বে তার অসাধারণ প্রভাব ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। ৪৪ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিল অত্যধিক পরিমাণে। অন্তিম মুহূর্তে তিনি হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত উম্মে সালামা রা. কে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে বলেন, 'সতীন হওয়ার দরুন আমাদের মধ্যে অধিকারে যেসব বেশকম হয়েছে, দোয়া করো আল্লাহ যেন এগুলো মাফ করে দেন।' উম্মুল মুমিনিনগণ নিঃসঙ্কোচে তাকে বলেন, যা হয়েছে আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করে দেন। এতে তার অন্তর প্রশান্ত হয়।[৫১৮]

উম্মে হাবিবা রা. জ্ঞানের দিক থেকে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার থেকে ১৬৫টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটা তার ইলমি যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।[৫১৯] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫১৬] মুসনাদে আহমদ, ২৭৪০৮

[৫১৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৯৯

[৫১৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/১০০

[৫১৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২১৯

হজরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা.

হজরত জুয়াইরিয়া বনু মুসতালিক গোত্রের সরদার হারিস বিন আবু জিরারের মেয়ে ছিলেন। তার গোত্রটি বনু খুযাআর শাখা ছিল।[৫২০]

চতুর্থ হিজরিতে তিনি মুরাইসি যুদ্ধে বন্দি হন। এই যুদ্ধে তার স্বামী মুসাফি বিন সফওয়ান মৃত্যুবরণ করেন। হজরত জুয়াইরিয়া বন্দি হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পিতা মেয়েকে মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাইলে তুমি চলে যেতে পারো আর চাইলে উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতে পারো।

তার জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! তাই তিনি বলেন, আমি আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহবন্ধনে আসার পর মুসলমানগণ আনন্দে তার গোত্রের লোকদেরকে মুক্ত করে দেন। এই সদাচরণে তার মাতাপিতাসহ গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।[৫২১]

জুয়াইরিয়া রা. অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিলেন। ফজর নামাজের পর তিনি জায়নামাজে বসে সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন।[৫২২]

৫৬ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়ে যায়। মদিনার শাসক মারওয়ান বিন হাকাম তার জানাজার নামাজ পড়ান।[৫২৩] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫২০] উসদুল গাবাহ, জুয়াইরিয়া রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।
তার বংশধারা হলো, জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস বিন আবি জিরার বিন হাবিব বিন আয়েয বিন মালিক জাযিমা (মুসতালিক) বিন সা'দ বিন আমর বিন রবিয়া।

[৫২১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৬১, ২৬২

[৫২২] সুনানে তিরমিজি, ৩৫৫৫

হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা.

সাফিয়া রা. এর সম্পর্ক ছিল একটি ইসরাইলি বংশের সাথে, যার বংশধারা হজরত হারুন আ. এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৫২৪] তার পিতা হুয়াই বিন আখতাব ইহুদি গোত্র বনু নাজিরের সরদার ছিলেন। বনু নাযিরের যুদ্ধে সে নিহত হয়। তার স্বামী কিনানা ইবনে আবুল হুকাইক ইসলামের কট্টর দুশমন ছিল। খায়বারযুদ্ধে সেও নিহত হয়। হজরত সাফিয়া রা. এর নিকট ইসলামের সততা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ঈমান গ্রহণ করে নেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন। এটা সপ্তম হিজরির ঘটনা। ওই সময় তার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। ৫০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।[৫২৫] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫২৩] জাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম, ৪/১৯০

[৫২৪] তার বংশধারা হলো, সাফিয়া বিন হুয়াই বিন আখতাব বিন সাঈহ বিন সালাবা বিন উবায়েদ বিন কাব বিন খাযরাজ বিন আবু হাবিব। উসদুল গাবাহ, ৭/১৬৭

[৫২৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৩৩

হজরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা হেলালিয়া রা.

হজরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. নিজের দানশীলতার কারণে উম্মুল মাসাকিন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে তোফায়েল বিন হারেসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি তালাক দিলে তার ভাই উবাইদা রা. এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি বদরযুদ্ধে শহিদ হয়ে যান।[৫২৬]

সাধারণ সিরাত লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে।[৫২৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসার মাত্র আট মাসের মাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৫২৮]

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ-করা দ্বিতীয় স্ত্রী। ইতিপূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় খাদিজা রা. এর ইনতেকাল হয়েছে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর।[৫২৯] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫২৬] আল ইসাবা, ৮/৯১, ৯২, আল ইসতিয়াব, ৪/১৮৫৩

[৫২৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/১১৫
তবে এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনিই সর্বশেষে রাসুল সা. এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন (আরো দেখুন, মুসতাদরাকে হাকিম, ৬৭১৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৫৪; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ১৩৯৯৫; আল মুজামুল কাবির, ২৪/৫৭)।
আল কিন্দি তাকে এগারতম এবং সর্বশেষ স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। (আস সুলুক ফি তবাকাতিল উলামা ওয়াল মুলুক, ১/৭৬)

[৫২৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/১১৫

[৫২৯] আল ইসাবা, ৮/৯১, ৯২ আল ইসতিয়াব, ৪/১৮৫৩
তার বংশধারা হলো, যায়নাব বিনতে খুযাইমা বিন হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আবদে মানাফ বিন হেলাল বিন আমের বিন সা'সাআ।

হজরত মাইমুনা বিনতে হারিস হেলালিয়া রা.

হজরত মাইমুনা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচি উম্মুল ফযলের দুধবোন এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের দুধখালা ছিলেন।

প্রথমে মাসউদ বিন উমর নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। সে তালাক দেওয়ার পর আবু রেহেমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার মৃত্যুর পর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহবন্ধনে আসেন। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ স্ত্রী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পর কাউকে বিয়ে করেননি।

সপ্তম হিজরির জিলকদ মাসে উমরাতুল কাজার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সারিফ-নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন তখন তার সঙ্গে বিয়ে হয়। ফেরার সময় সেখানেই প্রথম রাত্রিযাপন হয়। ৫১ হিজরিতে হজের সফরে সে স্থানেই তার মৃত্যু হয়। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।[৫৩০] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

---

[৫৩০] তার বংশধারা হলো, মাইমুনা বিনতে হারিস বিন হাযান বিন বুজাইর বিন হারাম। মায়ের দিক থেকে তার বংশধারা হলো, মাইমুনা বিনতে হিন্দ বিন আওফ বিন হারিস বিন হুতামাহ বিন জারশ। সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৪৫

উম্মতের কারো জন্য নবীজির স্ত্রীদের বিয়ে করা কেন বৈধ নয়?

কুরআন মাজিদের নির্দেশ অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কারো জন্য তার পবিত্র স্ত্রীদের বিয়ে করা জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

> তার ওফাতের পর তার পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।[৫৩১]

আল্লাহ তায়ালার এ নির্দেশের পেছনে কী হেকমত নিহিত রয়েছে? ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, উক্ত বিধান দেওয়ার পেছনে মৌলিক তিনটি কারণ রয়েছে।

১. কুরআন মাজিদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা মুসলমানদের মা।

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা।[৫৩২]

তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. দুনিয়াতে সর্বশেষ স্বামীই জান্নাতে স্বামী হবে। উম্মুল মুমিনিনদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। একারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৫৩১] সুরা আহযাব, আয়াত ৫৩

[৫৩২] সুরা আহযাব, আয়াত ৬

ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাদের জন্য পুনরায় বিয়ে করার সুযোগ ছিল না।[৫৩৩]

৩. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর নবীদের এক বিশেষ ধরনের জীবন লাভ হয়ে থাকে। শরীরের সাথে পবিত্র রুহের এক বিশেষ ধরনের সংযোগ তৈরি হয়ে থাকে। এই কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরও কিছু দিক থেকে উম্মুল মুমিনিনদের সঙ্গে তার বিয়ে বহাল ছিল। উম্মুল মুমিনিনগণের পুনরায় বিয়ে করা বৈধ না হওয়ার এটা বড় কারণ।

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রওজা মোবারকে জীবিত। কোনো জীবিত স্বামীর ঘর থেকে সাময়িকের জন্য অনুপস্থিত থাকাটা যেমন (স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায় না) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর বিষয়টি তেমনই। একারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হয় না।[৫৩৪]

---

[৫৩৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০৮

[৫৩৪] মাআরিফুল কুরআন, ৭/২০৩

নবীজির বহু বিবাহ

প্রাচ্যবিদরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে ইসলামের উপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। কিছু হিন্দু স্কলার পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পর্ধা প্রদর্শন করেছে। নিছক আপত্তির জন্যই একের পর এক আপত্তি উত্থাপনের তো কোনো জবাব হতে পারে না। তবু সঠিক বিবেকবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিদের প্রশান্তির জন্য এ ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে।

১. ইসলামের পূর্বেও দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্ম এবং অঞ্চলে একাধিক বিয়ের প্রচলন ছিল। আরব, হিন্দুস্তান, ইরান, মিসর, গ্রিক, ব্যাবিলন প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, সকল সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকেরাই একাধিক স্ত্রী রাখত।

   বর্তমান বাইবেল অনুযায়ী হজরত সুলাইমান আ. এর সাতজন স্ত্রী এবং তিনশত বাঁদি ছিল।[৫৩৫] দাউদ আ. এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। হজরত ইবরাহিম আ. এর তিনজন এবং হজরত ইয়াকুব এবং মুসা আ. এর চারজন করে স্ত্রী ছিল।[৫৩৬]

২. একাধিক স্ত্রীর প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বিষয়টি আজও এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। পশ্চিমারা ইসলামের শত্রুতার জন্য একাধিক বিয়ের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে। কিন্তু এখন এর প্রকৃতিগত প্রয়োজন তারা বুঝতে পেরেছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যাপক করার জন্য সেখানেও চেষ্টা চলছে। ড্যানসুর ডিওন পোর্ট নামক এক খ্রিষ্টান বাইবেল থেকে কয়েকটি রেফারেন্স উল্লেখ করে লিখেছেন, একাধিক বিয়ে শুধু পছন্দনীয়ই নয়; বরং ঈশ্বর এতে বিশেষ বরকত রেখেছেন।

---

[৫৩৫] বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, রাজা, ৩/১১

[৫৩৬] বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট, পয়দায়েশ, ২৯/৩০

লক্ষ করলে দেখা যাবে ইসলাম একাধিক বিয়ের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে এক উপযোগী মাত্রা প্রদান করেছে। ইসলামের পূর্বে একাধিক বিয়ের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। রাজা-বাদশাহদের অধীনে চার হাজার পর্যন্ত নারী থাকতো। খ্রিষ্টান পাদরিরা একাধিক বিয়েতে অভ্যস্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানিতে একাধিক বিয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ফিলিস্তিনের বাদশাহ এবং তার উত্তরাধিকারীরা বহু বিয়ে করত। হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে অসংখ্য বিয়ের বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। হিন্দুদের মহাসম্মানিত অবতার শ্রী কৃষ্ণের হাজার হাজার স্ত্রী ছিল।

মনু, হিন্দুধর্মের এক অনুসৃত ব্যক্তি। তিনি মনুসংহিতায় লেখেন, যদি একজন ব্যক্তির চারজন স্ত্রী থাকে আর তাদের একজনের সন্তান হয় তা হলে বাকিরাও সন্তানবিশিষ্ট বলে গণ্য হবে।[৫৩৭]

ইসলামের পূর্বে কোনো ধর্ম বা রাষ্ট্র বিবাহের সংখ্যা-বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। ইসলাম এই সংখ্যাকে সর্বোচ্চ চারে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমতার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। কেউ সকলের অধিকার সমানভাবে আদায় না করতে পারলে তার জন্য একাধিক স্ত্রী রাখাকে জুলুম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অনুযায়ী চারের অধিক স্ত্রী একত্র করা হারাম। এ বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যেসকল সাহাবি চারের অধিক বিয়ে করেছিলেন, তারা চারের অধিক স্ত্রীদের তালাক প্রদান করেন।

এখন এই প্রশ্ন রয়ে গেল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেন চারের অধিক স্ত্রী ছিল? তার স্ত্রীসংখ্যা কেন চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না? এর কিছু কারণ এবং হেকমত রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. উম্মুল মুমিনিনগণ অন্যান্য নারীর মতো নন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও।[৫৩৮]

---

[৫৩৭] মনুশাস্ত্র, অধ্যায় : ৯, শ্লোক : ১৮২

তারা গোটা উম্মতের মা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তারা কারও বিবাহবন্ধনে আসতে পারেন না। এজন্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করাটা আবশ্যক ছিল। তাই একে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন উম্মতের জন্য আদর্শ। একমাত্র পবিত্র স্ত্রীদের মাধ্যমেই তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। এজন্য গোটা মুসলিমজাতি থেকে নির্বাচন করে এগারোজন নারীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় পারিবারিক জীবনের বিধিবিধান আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না।

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বিয়ের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক করে মেয়ের সম্প্রদায়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তার এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। যেমন: জুয়াইরিয়া রা. কে বিয়ের ফলে তার গোটা গোত্র বনু মুসতালিক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৪. কোনো কোনো স্ত্রীর পূর্বের স্বামীগণ জিহাদে শহিদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মনজয় করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিয়ে করেছেন। যেমন: হজরত হাফসা রা. এবং হজরত উম্মে সালামা রা.। তাদের ছাড়াও উল্লিখিত কল্যাণের কারণে তিনি আরো বিয়ে করেছিলেন। ওই সময় শরিয়তে চারের অধিক স্ত্রী রাখার নিষিদ্ধতার উপর আমল করা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়েতে থাকা চারের অধিক স্ত্রীকে তালাক দেওয়াটা আবশ্যক হয়ে যেত। তখন উম্মুল মুমিনিন হওয়ার কারণে তারা অন্য কোথাও বিয়ে বসতে পারতেন না। অনুমান করুন, তারা তখন কী পরিমাণ কষ্ট পেতেন? তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে রাসুলের জন্য চারের অধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। এটা

---

[৫৩৮] সুরা আহযাব, আয়াত ৩২

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপন হাবিব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

৫. যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিয়েকে প্রবৃত্তিতাড়িত বলে উল্লেখ করতে চায়, তারা একটু ভেবে দেখুক, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলে যত খুশি আরবের কুমারী মেয়েদের বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. ব্যতীত তিনি কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। প্রত্যেকেই হয়তো বিধবা ছিলেন কিংবা তালাকপ্রাপ্ত। এমনকি ৫৩ বছর পর্যন্ত তিনি একজন মাত্র স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। অবশিষ্ট বিয়েগুলো জীবনের শেষ দশ বছরে করেছেন। যদি তার প্রবৃত্তির চাহিদা থাকতো তা হলে অবশ্যই তিনি যৌবনে এসব বিয়ে করতেন, বার্ধক্যে নয়।

৬. মক্কি-জীবনে কাফেররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর বিরোধী ছিল; কিন্তু তখনও তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রবৃত্তির তাড়নামূলক কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি। যদি এজাতীয় আপত্তি উত্থাপনের সামান্য অবকাশ থাকতো তা হলে আরবের কাফেররা এটাকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে বর্ণনা করত। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সকলের সামনেই ছিল। কেউই তার ব্যাপারে এমন কিছু ভাবতে পারেনি।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম, একমাত্র বিবেকবুদ্ধিহীন এবং পক্ষপাতদুষ্ট লোকেরাই চারের অধিক বিয়ের প্রশ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে মুখ খুলতে পারে।

পবিত্র সন্তানগণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্রসন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। ওই সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করার মতো সাহাবায়ে কেরামের জামাত তৈরি হয়নি এজন্য তার সন্তানদের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

সম্মানিত পুত্রসন্তান

১. কাসেম
২. আবদুল্লাহ (তাকে তাইয়িব এবং তাহের উপাধিতে ডাকা হতো)
৩. ইবরাহিম

কাসেম এবং আবদুল্লাহ হজরত খাদিজা রা. এর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৩৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম সন্তান হলো হজরত কাসেম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। তার কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবুল কাসেম উপাধিতে ডাকা হতো।

হজরত ইবরাহিম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাঁদি মারিয়া কিবতিয়া রা. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সন্তান ছিলেন। হজরত ইবরাহিম ব্যতীত সমস্ত সন্তান হজরত খাদিজা রা. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। খাদিজা রা. ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।[৫৪০]

অষ্টম নববিবর্ষে ইবরাহিম জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি দুম্বা কোরবানি করে আকিকা করেন।[৫৪১]

আপন সম্মানিত দাদার নামে তিনি তার নাম ইবরাহিম রাখেন। মদিনার শহরতলীতে বসবাসকারী আবু সাইফ রা. নামক এক কামারের স্ত্রী উম্মে সাইফকে তার ধাত্রী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৫৩৯] কিছু কিছু সিরাত-লেখক বলেছেন, তাইয়িব এবং তাহের নামে রাসুলের অন্য দুজন ছেলে ছিল।

[৫৪০] উয়ুনুল আসার, ২/৩৫৬, ৩৫৭

[৫৪১] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২১

ওয়াসাল্লাম সন্তান হিসেবে তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাকে দেখার জন্য বারবার হাঁপরের ধোঁয়াপূর্ণ আবু সাইফ রা. এর ঘরে যেতেন।

হজরত আনাস রা. আগে দৌড়ে গিয়ে আবু সাইফ রা. কে বলতেন, হাঁপর বন্ধ কর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করতেন। বাচ্চাকে কোলে নিতেন। তার ঘ্রাণ শুঁকতেন। তাকে চুমু খেতেন।[৫৪২]

ইবরাহিম তখনও দুধ পান করছিলেন। এর মধ্যেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সাইফ রা. এর ঘরে যান। সন্তানকে কোলে নেন। তার অবস্থা তখন খুব নাজুক ছিল। এর কিছুক্ষণ পরই নিষ্পাপ শিশুটি নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। আবদুর রহমান বিন আউফ রা. তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল, আপনিও কাঁদছেন!

তিনি বললেন, এটা তো রহমতের আলামত। এরপর তিনি আপন কলিজার টুকরার লাশের প্রতি মনোনিবেশ করে বলেন,

> إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضى رَبُّنا، وإنَّا بفِراقِكَ يا إبْراهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.
>
> চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, অন্তর ব্যথিত, কিন্তু আমরা সেটাই বলব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। ইবরাহিম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত।[৫৪৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেন, দুধ পান করা অবস্থায় ইবরাহিমের মৃত্যু হয়েছে। এজন্য আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য দুজন ধাত্রীর ব্যবস্থা করে দেবেন, যারা তার দুধপান পূর্ণ করবে।[৫৪৪]

এটা নববি দশমবর্ষ রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। তখন ইবরাহিমের বয়স ছিল মাত্র সতেরো মাস।[৫৪৫]

---

[৫৪২] সহিহ মুসলিম, ৬১৬৭, সহিহ বুখারি, ১৩০৩

[৫৪৩] সহিহ বুখারি, ১৩০৩, সহিহ মুসলিম, ৬১৬৭

[৫৪৪] সহিহ মুসলিম, ৬১৬৮

ইবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হয়। আরবদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রসিদ্ধ ছিল যে, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর আলামত। তাই লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুসংস্কার দূর করার জন্য এক খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তায়ালার দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হতে দেখবে তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করবে।[৫৪৬]

---

[৫৪৫] সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২১

[৫৪৬] সহিহ বুখারি, ১০৬০

সম্মানিত কন্যাগণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো মতভিন্নতা নেই। সর্বসম্মতিক্রমে তার চার কন্যা ছিল।

১. যায়নাব রা.

২. রুকাইয়া রা.

৩. উম্মে কুলসুম রা.

৪. ফাতেমা রা.

চার মেয়েই বড় হয়েছেন। তাদের সকলেরই বিয়ে হয়েছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেছেন। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সংক্ষেপে তাদের জীবনী আলোচনা করা হলো।

হজরত যায়নাব রা.

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন হজরত যায়নাব রা.। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভের দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াত লাভের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নেমে আসা নির্মম নির্যাতনের তিনি এক চাক্ষুষ সাক্ষী।[৫৪৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়ে মানুষকে দীনের দাওয়াত দিলে লোকজন তার উপর ঢিল নিক্ষেপ করত। তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। হজরত যায়নাব রা. সেখানে পৌঁছে পিতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।[৫৪৮]

আপন খালাতো ভাই আবুল আস বিন রবিয়ার সাথে তার বিয়ে হয়। আবুল আস রা. এর মূল নাম ছিল লাকিত। তিনি হজরত খাদিজা রা. এর দুধবোন হালার ছেলে। লাকিত ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত যুবকদের একজন। মদিনায় হিজরতের ক্ষেত্রে তিনি হজরত যায়নাব রা. কে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি নিজে শামে ব্যবসার জন্য চলে যান।

হজরত যায়নাব রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিদের সাথে মদিনায় হিজরত করতে পারেননি। পরবর্তীতে একা রওনা হলে কাফেররা বাধা প্রদান করে। এতে হজরত যায়নাব রা. আহত হন। তার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে যায়।

---

[৫৪৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৪৬

[৫৪৮] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯৮২৭, ৯৮২৮

আবুল আস বদরযুদ্ধে বন্দি হন। যায়নাব রা. কে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। আবুল আস তার ওয়াদা পূরণ করেন।[৫৪৯]

যায়নাব রা. কে আনার জন্য যায়েদ বিন হারিসা রা. গোপনে মক্কায় পৌঁছেন। আবুল আস যায়নাব রা. এবং দুই সন্তান আলি ও উমামাকে যায়েদের সাথে রাতের অন্ধকারে মদিনায় রওনা করিয়ে দেন।[৫৫০]

ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে যায়েদ বিন হারিসা রা. শাম-ফেরত একটি মক্কি কাফেলার উপর গেরিলা আক্রমণ করেন। এতে আবুল আস গ্রেফতার হন। মদিনা পৌঁছে তিনি আপন স্ত্রী হজরত যায়নাব রা. এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব রা. এর নিরাপত্তা বহাল রাখেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবুল আসের মাল-সামানা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আবুল আস মক্কায় ফিরে যান। হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির পাঁচ মাস পূর্বে মদিনায় এসে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[৫৫১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মমতা নিয়ে আবুল আস রা. এর কথা স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, সত্য বলেছে। যে ওয়াদা করেছে তা পূর্ণ করেছে।

অষ্টম হিজরিতে হজরত যায়নাব রা. মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫২]

---

[৫৪৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৪৭

[৫৫০] তারিখে দিমাশক, ৬৭/৪, ৫ এই বর্ণনায় যায়েদ বিন হারিসা রা. এর স্থলে উসামা বিন যায়েদ রা. এর কথা উল্লেখ রয়েছে। কোনো রাবির ভুলের কারণে এমন হয়েছে। কেননা ওই সময় উসামা বিন যায়েদ রা. এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তারিখে দিমাশকে কিছুটা সামনে (৬৭/১০) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হজরত যায়েদ বিন হারিসা রা. এই কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

[৫৫১] ইবনে সা'দ কৃত তাবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩

[৫৫২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৫০

বারো হিজরিতে আবুল আস রা. এর মৃত্যু হয়। উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে উম্মে সালামা এবং সাওদা বিনতে যামআ হজরত যায়নাব রা. কে গোসল দেন। উম্মে আতিয়া আনসারিয়া রা. ও উম্মে আইমান রা. তার কাফনকার্যে শরিক ছিলেন।[৫৫৩] রাদিয়াল্লাহু আনহা।

[৫৫৩] ইবনে সা'দ কৃত তাবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৫, ৩৬

হজরত রুকাইয়া রা.

হজরত রুকাইয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় কন্যা। নবুওয়াত লাভের সাত বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবু লাহাবের ছেলে উকবার সঙ্গে শুধু বিয়ে হয়েছিল; ঘর-সংসার হয়নি। সুরা লাহাব অবতীর্ণ হলে আবু লাহাবের কথায় উকবা তাকে তালাক দিয়ে দেয়।[৫৫৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর রুকাইয়া রা. কে হজরত উসমান রা. এর সঙ্গে বিয়ে দেন। উসমান রা. এর হাবশায় হিজরতের সময় রুকাইয়া রা. তার সঙ্গে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হজরত লুত আ. এর পর আল্লাহর রাস্তায় এটি হলো হিজরতকারী প্রথম পরিবার।[৫৫৫]

হজরত রুকাইয়া রা. কিছুদিন পর স্বামীর সাথে হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় রুকাইয়া রা. অসুস্থ ছিলেন। তার অসুস্থতার কারণে হজরত উসমান রা. বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। রুকাইয়া রা. এর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মদিনায় রেখে যান। যেদিন বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ মদিনায় পৌঁছে, সেদিন হজরত রুকাইয়া রা. মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বেশ কিছু নারীকে রুকাইয়ার মৃত্যুতে কাঁদতে দেখেন। হজরত উমর ফারুক রা. ধমক দিয়ে তাদের চুপ করাতে উদ্যত হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[৫৫৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৩৬
উকবা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

[৫৫৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২৫১

[৫৫৬] বুখারি কৃত তারিখুল আওসাত, ১/১৯

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাধা দেন। তিনি স্ত্রীদের বলেন, 'শয়তানি বিলাপ থেকে বেঁচে থাকবে। মনের কষ্ট এবং চোখের অশ্রু আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটা দয়ার নিদর্শন। আর মুখে (যেসকল অভিযোগ এবং বিলাপ বের হয়) কিংবা হাতের মাধ্যমে (যে বুক চাপড়ানো) হয়ে থাকে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে।

রাসুল সা. মেয়ের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। হজরত ফাতেমা রা. তখন সঙ্গে ছিলেন। তিনি বোনের কবরে বসে কাঁদতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদরের কোনা দিয়ে তার অশ্রু মুছতে থাকেন।[৫৫৭]

সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের মৃত্যুর কারণে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الحمدُ للهِ دَفْنُ البناتِ مِن المَكْرُماتِ

আলহামদুলিল্লাহ মেয়েদের দাফন দেওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।[৫৫৮]

---

[৫৫৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৩৮

[৫৫৮] আল মুজামুল কাবির, ১১/৩৬৬; হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, মেয়ের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করা সাওয়াব ও পুণ্যের বিষয়। এক কবি বলেছে

القبرُ أخفى ستر للبنات

ودفنها، يروى، منَ المكرمات

মেয়েদের লুকানোর জন্য কবর উত্তম স্থান আর তাদের দাফন করা সম্মানের বিষয়। (যাহরুল আহকাম ফিল আমছালি ওয়াল হিকাম, ২/২৪০)

বলাবাহুল্য, জাহেলি যুগের লোকেরা মেয়েদের যে জীবন্ত প্রোথিত করে ফেলত, রাসুল সা. উক্ত হাদিসের মাধ্যমে নাউজুবিল্লাহ সেটা উদ্দেশ্য নেননি।

হজরত উম্মে কুলসুম রা.

হজরত উম্মে কুলসুম রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় মেয়ে। তার প্রকৃত নাম বর্ণিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে উপনামই তার মূল নাম। আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। আবু লাহাবের বলার কারণে ঘর-সংসার হওয়ার পূর্বেই সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। যদিও আবু লাহাবের অপর ছেলে উতবাও হজরত রুকাইয়া রা. কে তালাক দিয়েছিল; কিন্তু উতাইবা তাকে শুধু তালাকই দেয়নি; বরং তালাক দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, আমি আপনার ধর্ম অস্বীকার করি। আপনার মেয়েকে আমি তালাক দিয়ে দিয়েছি। সে আমাকে পছন্দ করে না, আমিও তাকে পছন্দ করি না। এরপর এই হতভাগা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হামলে পড়ে তার পবিত্র জামা ছিঁড়ে ফেলে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান থেকে বদদোয়া বের হয়ে যায়, 'হে আল্লাহ, ওকে শায়েস্তা করার জন্য একটা নেকড়ে পাঠিয়ে দিন।'

কিছুদিন পর কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা শামে রওনা হয়। আবু লাহাব এবং উতাইবা সে কাফেলায় ছিল। যারকা নামক এলাকা অতিক্রম করতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। তারা সেখানে রাত্রিযাপন করে। রাতে একটা নেকড়ে বের হয়ে আসে। নেকড়েটি কাফেলাবাসী সকলের চেহারা দেখে ঘ্রাণ শুঁকতে থাকে। সে উতাইবার নিকট পৌঁছার পর তৎক্ষণাৎ তার মাথায় আক্রমণ করে। ততক্ষণে উতাইবার প্রাণ বের হয়ে যায়। তারপর নেকড়েটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৫৫৯]

উম্মে কুলসুম রা. আপন বোন রুকাইয়া রা. এর মৃত্যুর পর তৃতীয় হিজরিতে হজরত উসমান রা. এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।[৫৬০]

---

৫৫৯ দালায়িলুন নুবুওয়াত, ২/৩৩৮, ৩৩৯

৫৬০ তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়ের ব্যাপারে বলেন, আমি আকাশের অহির কারণে উসমানের সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিয়ে দিয়েছি।[৫৬১] উম্মে কুলসুম রা. ছয় বছর উসমান রা. এর সঙ্গে ঘর-সংসার করেন। এরপর নবম হিজরির শাবান মাসে তার মৃত্যু হয়ে যায়। তার কোনো সন্তান হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজার নামাজ পড়ান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবু তালহা রা. কবরে লাশ নামান।[৫৬২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের কিনারে বসে ছিলেন। তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বলছিলেন, যদি আমার আরও কোনো মেয়ে থাকতো তা হলে তাকেও আমি উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।[৫৬৩]

ইতিহাস এবং সিরাতের গ্রন্থাদিতে হজরত রুকাইয়া রা. এর মতোই হজরত উম্মে কুলসুম রা. এর খুব সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য এতেই নসিহতের বহু উপকরণ রয়েছে।

---

[৫৬১] বুখারি কৃত তারিখুল কাবির, ৩/৩০৮

[৫৬২] সহিহ বুখারি, জানাজা অধ্যায়। এ বর্ণনায় রাসুল সা. এর মেয়ের নাম উল্লেখ নেই। কিছু স্থানে একে হজরত রুকাইয়া রা. এর দাফনের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুহাক্কিক আলেমগণ একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা হজরত রুকাইয়া রা. এর দাফনের সময় রাসুল সা. বদরযুদ্ধে ছিলেন। (উমদাতুল কারি, ৮/১৫২) তাই এটি হজরত উম্মে কুলসুম রা. এরই দাফনের ঘটনা হবে। এটা ইমাম তাহাবির বক্তব্য। (শরহে মুশকিলুল আসার, নং, ২৫১২)

[৫৬৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/২৪৮; কোনো বর্ণনায় এসেছে, যদি আমার দশজন মেয়ে থাকত তা হলে আমি তাদেরকে উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৩৮)। তাবাকাতে ইবনে সা'দ এবং আলবিদায়া ওয়াননিহায়া কিতাবে এ বিষয়টি সনদবিহীন উল্লেখ করা হয়েছে। তবু ইবনে আবি আসেম এ বর্ণনার সমার্থক দুটি হাদিস ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন (ইবনে আবি আসেম কৃত আস সুন্নাহ, হাদিস : ১২৯১, ১৩০১)। তবে প্রথম বর্ণনায় উসমান বিন খালেদ বিন উমর আল উমাবি মাতরুক তথা পরিত্যাজ্য রাবি (তাকরিবুত তাহযিব, নং : ৪৪৬৮)। আর দ্বিতীয় বর্ণার আবদুল মালিক বিন হারুন বিন আনাযাকে দাজ্জাল ও কাজ্জাব বলা হয়েছে (আল কামিল ফিয যুআফা, নং : ১৪৪৮)। তাই মূল কিতাবে উল্লেখকৃত বর্ণনাটিই সঠিক।

হজরত ফাতেমা রা.

তার মূল নাম ফাতেমা। উপাধি যাহরা ও বাতুল। তাকে বাতুল বলার কারণ হলো তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার দিক থেকে দুনিয়ার সকল নারী থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কিংবা এজন্য তাকে বাতুল বলা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। তার জীবন ছিল অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল। এজন্য তাকে যাহরা বলা হয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।[৫৬৪]

তার বয়স খুম কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত শিষ্ট ও সাহসী ছিলেন। আপন পিতার প্রতি অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরে নামাজ আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু জাহেল বলার কারণে এক কাফের উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় গেলে সে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ে রেখে দেয়। বিষয়টা হজরত ফাতেমা রা. কে কেউ বললে তিনি দৌড়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দান থেকে নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে ফেলেন। এরপর তিনি কাফেরদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৫৬৫]

---

[৫৬৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/১৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৩১৫

[৫৬৫] সহিহ বুখারি, অজু অধ্যায়; সহিহ মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়।

হজরত ফাতেমার বয়স

সহিহ মুসলিমের হাদিসটি হজরত ফাতেমার বয়স বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বসম্মতিক্রমে ১১ হিজরিতে ফাতেমা রা. এর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তার জন্মের ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। এর সনদগুলো দুর্বল। এর মধ্যে তিনটি মত অধিক প্রসিদ্ধ।

১. রবিউল আউয়াল মাসে কুরাইশদের হাতে কাবা নির্মাণের সময় তার জন্ম হয়। ওই সময় রাসুলের বয়স ছিল ৩৫ বছর (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/১৯; আল ইসাবা, ৮/২৬৩)। এটা হিজরতের ঠিক ১৮ বছর পূর্বের ঘটনা। এই হিসাবে ১১ হিজরির রমজান মাসে মৃত্যুর সময় তার বয়স দাঁড়ায় ২৮ বছর ৬ মাসে। এ

মদিনায় হিজরতের পর হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে আনন্দিত হন। কিন্তু

মতানুযায়ী বিয়ের সময় (দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে) তার বয়স ছিল ১৯ বছর ৭ মাস।

২. রাসুল সা. এর ৪১ বছর বয়সে তার জন্ম হয় (আল ইসাবা, ৮/২৬৩)। এই হিসাবে বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ১৫ বছর ৭ মাস। আর মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ২৪ বছর ৬ মাস।

৩. রাসুল সা. এর ৪০ বছর বয়সে তার জন্ম হয়েছে। (আল ইসাবা, ৮/২৬৩)

সাধারণত ঐতিহাসিক এবং সিরাত-লেখকদের নিকট দ্বিতীয় মতটি প্রসিদ্ধ। এজন্য হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, বিয়ের সময় তার বয়স ছিল সাড়ে ১৫ বছর। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/৪৮৬)। হাফেজ জাহাবি রহ. মৃত্যুর সময় তার বয়স ২৫ হওয়াকে বিশুদ্ধ বলেছেন (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১২১)। ফাতেমা রা. এর বয়সের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র সহিহ মুসলিমের বর্ণনাটি সঠিক। এই বর্ণনাকে নিম্নোক্ত বিষয়াদির সাথে সামঞ্জস্য করে দেখলে প্রথম মতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়।

১. এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, রাসুল সা. গোপনে তিন বছর দাওয়াতের কাজ করেছেন। এরপর চতুর্থ বছর থেকে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলে কাফেরদের পক্ষ থেকে বহু জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হন। তাই বলতে হবে এ ঘটনা প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছে, যা নববি চতুর্থ বর্ষ থেকে শুরু হয়েছে। তখন মুসলমানদের উপর যেমন বিপদ নেমে আসছিল, তেমনি রাসুল সা. নিজেও নিরাপদ ছিলেন না।

২. বিভিন্ন কারণে বুঝে আসে যে, ঘটনাটি হজরত হামজা এবং হজরত উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের হবে। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণের পর কাফেররা এ ধরনের স্পর্ধা দেখাতে পারত না। মুসলমানরা তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে কাবায় নামাজ আদায় করতেন। আর হজরত হামজা ও উমর রা. নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/৩৭০)। এই কারণে এই ঘটনাটি তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের হওয়াটাই যৌক্তিক মনে হয়।

এখন চলুন ফাতেমা রা. এর জন্মের বছরের প্রতি লক্ষ করি। নবুওয়াত লাভের বছর কিংবা তার এক বছর পূর্বে যদি ফাতেমা রা. এর জন্ম হয়ে থাকে তা হলে নবুওয়াতের চতুর্থ-পঞ্চম বছর তার বয়স হয় চার কি পাঁচ বছর। এই ক্ষেত্রে রাসুল সা. কে বিপদাক্রান্ত দেখে এত ছোট বাচ্চাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বিষয়। এমন ভারী নাড়িভুঁড়ি রাসুল সা. এর পিঠ থেকে সরানো এবং মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করাটাও চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ের কাজ হতে পারে না। তবে প্রথম মত অনুযায়ী তখন তার বয়স ছিল আনুমানিক নয় বছর। সাহসী হলে এ বয়সের মেয়েরা এই কাজ করতে পারে। আর রাসুল সা. এর মেয়েদের চেয়ে সাহসী মেয়ে আর কে হতে পারে? যদিও সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় (জুআইরিয়া) ছোট বাচ্চা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তবু নয়-দশ বছরের মেয়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটি অনায়াসেই প্রয়োগ হতে পারে।

তিনি এক্ষেত্রে ফাতেমা রা. এর সম্মতি নেওয়া জরুরি মনে করেন। তাকে বলেন, আলি তোমার কথা বলল! হজরত ফাতেমা রা. নীরব থাকেন।

ফকিহগণ এটা থেকে এই বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন যে, কুমারী মেয়ের চুপ থাকাটা সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে।

বিয়ের ফয়সালা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলি রা. কে জিজ্ঞেস করেন, মোহর কী হবে?

আলি রা. বলেন, আমার নিকট তো মোহর আদায় করার মতো কিছু নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে যে বর্মটি দিয়েছিলাম সেটি কোথায়?

তিনি বলেন, সেটা তো আছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা হলে সেটাকে মোহর বানিয়ে নাও।

হজরত আলি রা. এর নিকট একটি উট ছিল। তিনি সেটিও বিক্রি করে দেন। এর মাধ্যমে তিনি ৪৮০ দিরহাম লাভ করেন। এই টাকাকে মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে সম্পাদিত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় হজরত আলি রা. মসজিদ থেকে সামান্য দূরে একটি বাড়ি নেন।

হজরত আলি রা. এর ঘরে কিছুই ছিল না। হজরত ফাতেমা রা. আলি রা. এর ঘরে যাওয়ার পূর্বে কিছু নারী সাহাবি প্রয়োজনীয় কিছু সামানাপত্রের ব্যবস্থা করে দেন। তা হলো, খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরি দুটি বিছানা, দুটি বালিশ, একটি পানি পানের পেয়ালা, একটি মশক, একটি চাটাই, দুটি চাক্কি ও দুটি মটকা। এরপর হজরত ফাতেমা রা. হজরত আলি রা. এর ঘরে যান। উম্মে আইমান রা. ফাতেমাকে আলি রা. এর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। কামরায় মাটির তৈরি চতুর্ভুজ আকৃতির একটি উঁচু স্থান ছিল। এতে দুম্বার চামড়া বিছিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী রাত্রিযাপন করতেন। দিনেরবেলা সে চামড়ায় ভূষি রেখে উটনীকে খাবার দিতেন। আবার এতে করেই ঘরের পানি আনা হতো।[৫৬৬]

---

[৫৬৬] হজরত ফাতেমা রা. এর বিয়ে সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সকল বিষয় তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২২, ২৩ পৃষ্ঠার ধারাবাহিক কিছু বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে।

শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয় যে, দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসের শেষদিকে কিংবা দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে হজরত ফাতেমা রা. আলি রা. এর ঘরে গিয়েছেন।[৫৬৭]

হজরত ফাতেমা রা. আলি রা. এর ঘরে আসার পর আনসারগণ আলি রা. কে বললেন, অবশ্যই ওলিমা হওয়া চাই। হজরত সা'দ রা. একটি

---

[৫৬৭] দুলাবির বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে বিয়ে সংঘটিত হয়। আর হজরত ফাতেমা রা. আলির ঘরে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় হিজরির জিলহজ মাসে। এ সময়ই অলিমা অনুষ্ঠিত হয়। (আজ-জুররিয়াতুত তাহেরা, ৬৩) অর্থাৎ বিয়ে ও স্বামীর ঘরে যাওয়ার মধ্যে এগারো মাসের ব্যবধান ছিল। তবে অন্য কোনো বর্ণনার মাধ্যমে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। যদি জিলহজ মাসে তার আলি রা. এর ঘরে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়া হয় তা হলে অবশ্যই জিলহজ মাদানি হবে। কেননা দ্বিতীয় হিজরির রমজান হলো মক্কি।

আমাদের আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, বুখারি-মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী হজরত আলি রা. অলিমার ব্যবস্থা করার জন্য উটনী-দুটির উপর জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো তিনি বিক্রি করার ইচ্ছা করেছিলেন। এর একটি উট তিনি বদরের যুদ্ধে গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন। হজরত হামজা রা. মদের নেশায় হঠাৎ উটনী-দুটি জবাই করে ফেলেন। (সহিহ বুখারি, ২৩৭৫, সহিহ মুসলিম, ১৯৭৯)

বলাবাহুল্য এটি মদ হারাম হওয়া এবং উহুদযুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। কেননা হজরত হামজা রা. উহুদ যুদ্ধে শহিদ হয়ে গিয়েছেন। এর মাধ্যমে কতক ঐতিহাসিকদের এ কথা ভুল প্রমাণিত হয় যে, উহুদ যুদ্ধের পর হজরত আলি রা. ও ফাতেমা রা. এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তেমনিভাবে তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত প্রথম হিজরির রজব মাসে বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার বর্ণনাটিও ভুল প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে দ্বিতীয় হিজরিতে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার মতটি অধিক সঠিক প্রমাণিত হয়। ইবনে কাসির রহ. এমনটি বলেছেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩০৫, তাবারি ইবনুল জাওযি এবং জাহাবি এটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন।)

এর মাধ্যমে এটিও প্রমাণিত হয় যে, বদরযুদ্ধ তথা ১৭ রমজানের পর এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, হজরত আলি রা. বিয়ের জন্য বনু কাইনুকার স্বর্ণকারের সাথে লেনদেন করেছিলেন, এর মাধ্যমে এটা সুনিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে যে, বিয়েটি গাযওয়ায়ে কাইনুকা (১৫ ই শাওয়ালের) এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। কেননা এ যুদ্ধের পর বনু কাইনুকাকে দেশান্তর করা হয়েছিল। তাই তখন বনু কাইনুকার স্বর্ণকারের সাথে লেনদেনের পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

উপরন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে হজরত আলি রা. এর অলিমার ব্যবস্থা না করতে পারার কারণও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ তিনি যার মাধ্যমে অলিমার টাকা অর্জন করতে চাচ্ছিলেন সেই উটনী-দুটি মারা গিয়েছিল। এজন্য হজরত ফাতেমা রা. কে ঘরে আনার সময় তার নিকট কিছু ছিল না। যে সামান্য সামগ্রী ছিল তিনি সেটাই বিক্রি করে মোহরের টাকা জোগাড় করেছিলেন। এজন্য আনসারিগণ তার অলিমার ব্যবস্থা করেন।

দুম্বা দিলেন। কিছু আনসার সাহাবি কয়েক সা' যব জমা করেন। এভাবে ওলিমার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

হজরত আলি রা. এর ঘর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে দূরে ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়েকে কাছাকাছি রাখতে চাচ্ছিলেন। হারিসা বিন নোমান আনসারি নামে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রতিবেশী ছিল। তিনি ইতিপূর্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য কিছু জায়গা খালি করে দিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফাতেমা রা. কে বলেন, আমি তোমাকে কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। তখন হজরত ফাতেমা রা. বলেন, আপনি হারিসা বিন নোমানকে বলুন, তিনি আমাদের জন্য কাছাকাছি কোনো জায়গা করে দেবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে তো আমাদেরকে ইতিপূর্বেও ঘর দিয়েছে। এখন আবার তার নিকট বলতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে।

হজরত হারিসা রা. এটা জানামাত্র আপন ঘর খালি করে অন্যত্র চলে যান। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আল্লাহর রাসুল, আমি জানতে পারলাম, আপনি ফাতেমাকে কাছাকাছি রাখতে চাচ্ছেন। আমার ঘর তাদের জন্য হাজির আছে। আমার সকল সম্পদ আল্লাহর রাসুলের জন্যই। আপনি আমাদের জন্য কিছু রাখবেন, তার চাইতে আপনি আমাদের থেকে কিছু নিবেন সেটাই আমাদের অধিক পছন্দ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বলেন, তুমি সত্য বলেছো। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।

এরপর হজরত আলি রা. এবং হজরত ফাতেমা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসেন।[৫৬৮]

উভয় জাহানের সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় কন্যা হওয়া সত্ত্বেও হজরত ফাতেমা রা. এর জীবনযাপন সাদাসিধা ও কষ্টঘেরা ছিল। তিনি নিজেই ঘর পরিষ্কার করতেন। চুলা জ্বালিয়ে খানা রান্না করতেন। কূপ থেকে পানির মশক ভরে আনতেন। এজন্য তার

---

[৫৬৮] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/২২

শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজেই চাক্কি চালিয়ে আটা পিষতেন। যার ফলে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। দরিদ্রতার কারণে ঘরে কাজের সহযোগী কোনো মানুষ রাখার সক্ষমতা ছিল না।

একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু গোলাম এলো। হজরত আলি রা. চিন্তা করলেন ঘরের কাজে সহযোগিতার জন্য একটি গোলাম নেওয়া প্রয়োজন। আলি রা. বলায় হজরত ফাতেমা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করেন। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছিলেন না। তিনি চুপচাপ ফিরে আসেন। হজরত আয়েশা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ফাতেমা এসেছিল।

পরবর্তীতে হজরত আলি রা. বিষয়টি পেশ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারছি না। কেননা আহলে সুফফারা ক্ষুধার্ত, আমার কাছে তাদের জন্য খরচ করার মতো কিছুই নেই। গোলামগুলো বিক্রি করে এর অর্থমূল্য তাদের জন্য খরচ করবো।

রাতে তিনি মেয়ের ঘরে উপস্থিত হয়ে বলেন, তুমি যে জিনিস চেয়েছিলে আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা বলে দেব না? শোয়ার সময় তুমি ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটা তোমার জন্য সহযোগী খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে।

হজরত ফাতেমা রা. বলেন, আমি আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি সন্তুষ্ট আছি।[৫৬৯]

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথাবার্তায় ফাতেমার চাইতে অধিক সামঞ্জস্যশীল আমি কাউকে পাইনি। ফাতেমা রা. যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে যেতেন। তাকে চুমু খেতেন। মোবারকবাদ জানাতেন।[৫৭০]

---

[৫৬৯] মুসনাদে আহমদ, ১১৪১, ১৩১৩; ইমাম আহমদ ইবনে হামবল কৃত ফাজায়িলুস সাহাবা, ১২০৭

[৫৭০] সুনানে আবু দাউদ, ৫২১৭

তিনি এটাও বলেন, তার চালচলন পুরোপুরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ছিল।[৫৭১]

ফাতেমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ফাতেমা আমার দেহের টুকরো। যে তাকে পেরেশান করবে, সে আমাকে পেরেশান করল। যে তাকে কষ্ট দেবে, সে আমাকে কষ্ট দিলো।[৫৭২]

একরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখন এক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করেছে, সে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। সে আমাকে সালাম দেওয়ার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছে। সে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছে যে, ফাতেমা জান্নাতি নারীদের সরদার হবে। আর হাসান, হুসাইন জান্নাতি যুবকদের সরদার হবে।[৫৭৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে ফাতেমা রা. অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি অসুস্থ হয়ে যান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি। এর ছয় মাস পর ১১ হিজরির রমজানুল মোবারকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওই সময় তার বয়স হয়েছিল ২৮/২৯ বছর।[৫৭৪]

এক মত অনুযায়ী হজরত আবু বকর সিদ্দিক, অন্য মত অনুযায়ী হজরত আলি, আরেক মত অনুযায়ী হজরত আব্বাস রা. তার জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। রাতে জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়। হজরত আলি, হজরত আব্বাস এবং ফজল ইবনে আব্বাস রা. কবরে অবতরণ করেন।[৫৭৫]

---

[৫৭১] সহিহ মুসলিম, নবী সা. এর কন্যা ফাতেমা রা. এর ফজিলত অধ্যায়।

[৫৭২] সহিহ মুসলিম, নবী সা. এর কন্যা ফাতেমা রা. এর ফজিলত অধ্যায়।

[৫৭৩] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৮৩

[৫৭৪] আল মুজামুল কাবির, ২২/৩৯৮

[৫৭৫] মারিফাতুস সাহাবা, ৬/৩১৮৫-৩১৯২; আল ইসতিয়াব, ৪/১৮৯৩; আল ইসাবা, ৮/২৪, ২৫

নাতি-নাতনি

মেয়েদের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশবিস্তার হয়েছে। নিম্নে তার মেয়েদের ঘরের নাতি-নাতনিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

হজরত যায়নাব রা. এর সন্তান

১. আলি নামে হজরত যায়নাব রা. এর একটি ছেলে ছিল। আর উমামা রা. নামে তার একটি মেয়ে ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমামা রা. কে খুব ভালোবাসতেন। উমামা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, তিনি বিভিন্ন সময় নামাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে চড়ে বসতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আস্তে করে নামিয়ে দিতেন। তার মা হজরত যায়নাব রা. অষ্টম হিজরিতে ইনতেকাল করেন। এই মাতৃহীন শিশুকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর-সোহাগ করতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদিয়া হিসেবে স্বর্ণের হার আসে, সকল স্ত্রী তখন উপস্থিত ছিলেন। হজরত উমামা রা. ঘরের এক কোনায় মাটি দিয়ে খেলাধুলা করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে হারটি প্রদান করব। সকলে ধারণা করেছিলেন হজরত আয়েশা রা. কে তা দেওয়া হবে; কিন্তু তিনি উমামা রা. কে ডেকে হারটি তার গলায় পরিয়ে দেন।[৫৭৬]

হজরত ফাতেমা রা. এর মৃত্যুর পর হজরত আলি রা. উমামা রা. কে বিয়ে করেন। হজরত আলি রা. শাহাদাতবরণ করলে মুগিরা বিন

---

[৫৭৬] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৪০; উসদুল গাবাহ, ৭/২০

নাওফিলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মুগিরা থেকে উমামা রা. এর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ছিল ইয়াহইয়া।[৫৭৭]

২. হজরত যায়নাব রা. এর ছেলে আলি বিন আবুল আস রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় নাতি ছিলেন। মদিনায় হিজরতের সাত থেকে আট বছর পূর্বে তার জন্ম হয়।

আরবের রীতি অনুযায়ী তিনি গ্রাম্য-পরিবেশে বনু গাদির গোত্রে দুধ পানের সময়কাল অতিবাহিত করে। তার পিতা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি বিধায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখাশোনা করতেন। তিনি বলেন, আমি তার দেখাশোনার অধিক উপযুক্ত।[৫৭৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উটনীতে আরোহী ছিলেন।[৫৭৯]

একমত অনুযায়ী শৈশবেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। অন্য মত অনুযায়ী তিনি যৌবন পেয়েছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।[৫৮০]

হজরত রুকাইয়া রা. এর সন্তান

হজরত উসমান রা. ও হজরত রুকাইয়া রা. থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটিমাত্র নাতি জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয়েছিল আবদুল্লাহ। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী মায়ের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ প্রথম হিজরিতে তার মৃত্যু হয়ে যায়। তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর।[৫৮১]

---

[৫৭৭] উসদুল গাবাহ, ৭/২০

[৫৭৮] উসদুল গাবাহ, ৪/১১৮; আল ইসাবা, ৪/৪৬৯ হজরত আলি বিন আবুল আস রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৫৭৯] আল মুজামুল কাবির, ২২/৪২৪

[৫৮০] আল ইসাবা, ৪/৪৬৯

[৫৮১] আল ইসাবা, ৫/১৬, ১৭

এক মত অনুযায়ী হজরত উসমান রা. ও রুকাইয়া রা. এর ঘরে আবদুল্লাহ নামক অপর এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। যাকে 'আবদুল্লাহ আসগর' বলা হতো। তিনি ৭৬ বছর বয়স পেয়েছেন। (মুরুজুয যাহাব, ৩/৭৫, ৭৬)

এটা কেবল মাসউদির বর্ণনা। উপরন্তু এর কোনো সনদ নেই। ইতিহাস ও বংশ বিষয়ক কোনো গ্রন্থেও মতটি বিদ্যমান নেই।

হজরত ফাতেমা রা. এর সন্তান

হজরত ফাতেমা রা. এর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। ছেলেরা হলেন, হজরত হাসান রা., হজরত হুসাইন রা. ও হজরত মুহসিন রা.। মেয়ে দুজন হলেন, হজরত উম্মে কুলসুম রা. এবং যায়নাব রা.। মুহসিন রা. শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন। অবশিষ্ট সন্তানরা যৌবন পেয়েছেন। তাদের থেকে বংশবিস্তার হয়েছে।[৫৮২]

১৭ হিজরিতে উম্মে কুলসুম রা. এর সঙ্গে হজরত উমর ফারুক রা. এর বিয়ে হয়। তার থেকে রুকাইয়া এবং যায়েদ নামক দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[৫৮৩]

হাসান, হুসাইন রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে। তাদের ফজিলতের ব্যাপারে হাদিসের কিতাবে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আসবে।

মোটকথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আটজন নাতি-নাতনি ছিল :

১. আলি বিন আবুল আস
২. উমামা বিনতে আবুল আস
৩. আবদুল্লাহ বিন উসমান
৪. হাসান বিন আলি
৫. হুসাইন বিন আলি
৬. মুহসিন বিন আলি
৭. উম্মে কুলসুম বিনতে আলি
৮. যায়নাব বিনতে আলি

---

[৫৮২] ইবনে কুদামা কৃত আত তাবয়িন ফি ইনতিসাবি কুরাইশ, ১৩৩
[৫৮৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/৫০২; উসদুল গাবাহ, ৭/৩৭৭

চাচা এবং ফুফুগণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেরজন চাচা ছিলেন।

১. সাইয়েদুশ শুহাদা হজরত হামজা রা.

২. হজরত আব্বাস রা.

৩. আবু তালেব। মূল নাম আবদে মানাফ।

৪. আবু লাহাব। মূল নাম আবদুল উজ্জা।

৫. যুবায়ের

৬. আবদুল কাবা

৭. জিরার

৮. কুসাম

৯. মুসআব। ইদাক বলে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১০. হারিস

১১. মুকাইয়িম

১২. মুগিরা

১৩. হাজল বা হাজলা

কতক আলেমের মতে হারিসের নামই মুকাইয়িম। এমনিভাবে মুগিরার নাম হাজল বা হাজলা। তখন তার চাচাদের সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো। তাদের মধ্যে শুধু হজরত আব্বাস রা. এবং হামজা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয়জন ফুফু ছিল। তারা হলেন :

১. সাফিয়া

২. আতিকা

৩. বাররা

৪. আরওয়া

৫. উমাইমা

৬. উম্মে হাকিম বাইযা

সর্বসম্মতিক্রমে হজরত সাফিয়া ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আরওয়া ও আতিকার ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।[৫৮৪]

[৫৮৪] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৮/৪১-৪৩

প্রবীণ সাহাবি ও আশারায়ে মুবাশশারা

সকল সাহাবির মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারা সর্বশ্রেষ্ঠ। আর আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিন শ্রেষ্ঠ। তারা হলেন :

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.

হজরত উমর ফারুক রা.

হজরত উসমান গনি রা.

হজরত আলি মুরতজা রা.

উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী তারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের পরে আছেন :

হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

হজরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রা.

হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.

হজরত যুবাইর বিন আওয়াম রা.

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.

হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা.

যেহেতু তারা অন্যান্য সাহাবির চেয়ে মর্যাদা-গুণে শ্রেষ্ঠ এজন্য তাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়। তাদের সকলের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

১. তারা সকলেই মুহাজির

২. সকলেই কুরাইশি

৩. সকলে নবুওয়াতের প্রথম যুগেই, যখন মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এজন্য তারা সুরা তাওবার ১০০নং আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের হকদার।

৪. তাদেরকে একই সঙ্গে এক বৈঠকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।[৫৮৫]

---

[৫৮৫] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৪৭, ৩৭৪৮, ৩৭৫৭

নোট, যদিও উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া বিভিন্ন সময় অন্যান্য সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা গণ্য করা হয় না। কেননা তাদের মধ্যে উল্লিখিত চারটি গুণ একসঙ্গে পাওয়া যায় না। অতএব আশারায়ে মুবাশশারা একটি পরিভাষা, যা বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী সাহাবায়ে কেরামের জন্যই প্রযোজ্য।

আশারায়ে মুবাশশারার পরিচিতি

আশারায়ে মুবাশশারার প্রথম চারজন হলেন মুসলিম উম্মাহর মহান খলিফা। তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়। তাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, হজরত উমর এবং হজরত উসমান রা. এর বৈশিষ্ট্য ও অবদানের কথা পেছনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আর হজরত আলি রা. এর বিস্তারিত জীবনী যথাস্থানে আসবে। এজন্য তার আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন নেই। এখানে আশারায়ে মুবাশশারার অন্য ছয়জনের আলোচনা করা হবে।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. মুসলিম ইতিহাসের সেসকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির একজন, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ আস্থার পাত্র ছিলেন, যারা সকল ময়দানে প্রথম সারির সিপাহি হিসেবে ইসলামের জন্য লড়াই করে গেছেন। হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে শামে বিজয়ের সময় তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত উঁচুমাপের সাহাবি ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতের উপর সকলকে একমত করার ব্যাপারে তার মতামতের অনেক বড় ভূমিকা ছিল।

তার মূল নাম আমের বিন আবদুল্লাহ। তার উপনাম আবু উবাইদা। তিনি উপনামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আপন দাদা জাররাহহের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বলা হয়। বনু ফিহরের সঙ্গে তার বংশীয় সম্পর্ক ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামকে আপন মারকায বানানোর পূর্বেই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে এসে আস-সাবিকুনাল আওয়ালুনের (প্রথম সারির মুসলিম) মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

হজরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, হজরত উসমান বিন মাযউন, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত উবাইদা বিন হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুম একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৈঠকে যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, হজরত আবু উবাইদা রা. তাদের একজন ছিলেন।

তিনি প্রথমে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে বেশি দিন অবস্থান করেননি। কিছুদিন পরই তিনি চলে আসেন। এরপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।

তার মদিনায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ হয়। মদিনায় ভ্রাতৃত্বন্ধন তৈরি করার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হজরত আবু তালহা আনসারির ভাই বানিয়েছেন।[৫৮৬]

বিভিন্ন জিহাদে তাকে আমির বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তার নেতৃত্বে এক বাহিনী সমুদ্র উপকূলে নিযুক্ত ছিল। তারা একবার প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। এক বিশাল মাছ তীরে চলে আসে। হজরত আবু উবাইদা রা. প্রথমে সন্দেহ করেন এটা মৃত জন্তু কি না। এরপর তিনি গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে সাথিদের বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত লোক। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। চল আমরা এটা খেয়ে নিই। তিনশত সদস্যের এই বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত আল্লাহর এই মেহমানদারির মাধ্যমে পেট পূর্ণ করে পানাহার করেন। ফেরার সময় তারা বহু গোশত নিয়ে যান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এটা ভক্ষণ করেন। তিনি এটাকে গায়েবি সাহায্য বলে উল্লেখ করেন।[৫৮৭]

তার মা উমাইমা বিনতে গনাম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কিন্তু তার পিতা আবদুল্লাহ বিন জাররাহ ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানান। তার পিতা বদরযুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে লড়াই করেন। এর মধ্যেই যুদ্ধে বাপ-বেটা মুখোমুখি হয়ে যায়। হজরত আবু উবাইদা রা. প্রথমে তাকে বাঁচার সুযোগ দেন। কিন্তু পিতা তাকে প্রবল আক্রমণ করতে উদ্যত হলে হজরত আবু উবাইদা রা. তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডুপাত করেন। তার এই ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে

---

[৫৮৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৫, ৬
[৫৮৭] সহিহ বুখারি, ৪৩৬০; সহিহ মুসলিম, ৫১০৯

দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেউ হয়।[৫৮৮]

তিনি বদরযুদ্ধসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। উহুদযুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজতের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। উহুদযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে শিরস্ত্রাণের আংটা বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউ এটা টেনে বের করতে পারছিলেন না। ওই সময় হজরত আবু উবাইদা রা. আপন দাঁত দিয়ে আংটা দুটি টান দিয়ে বের করার প্রয়াস চালান। এতে তার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ সৌভাগ্যের ফলে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

বলা হয়- দাঁত পড়ে যাওয়ার কারণে আবু উবাইদা রা. ব্যতীত কাউকে সুন্দর দেখায় না।[৫৮৯]

যখন ইসলামের বিজয় হচ্ছিল তখন নাজরানের পাদরিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে,

ابْعَثْ لَنا رَجُلًا أَمِينًا

আপনি আমাদের নিকট একজন বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ

আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠাবো।

তারপর হজরত আবু উবাইদা রা. কে তাদের নিকট পাঠান।

তখন থেকে তিনি 'আমিনুল উম্মাহ' (উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি) উপাধিতে ভূষিত হন। এটা তার উপর নবীর পূর্ণ আস্থার প্রমাণ।[৫৯০]

---

[৫৮৮] সুরা মুজাদালা, আয়াত ২২

[৫৮৯] দালায়িলুন নুবুওয়াত, ৩/২৬৩, ২৬৪

[৫৯০] সহিহ বুখারি, ৩৭৪৪

এক জায়গায় তিনি বলেন,

لكلِّ أمَّةٍ أمينٌ وإنَّ أمينَ هذه الأمَّةِ أبو عُبيدةَ بنُ الجرَّاحِ

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক উম্মতের একজন আমিন থাকে। এই উম্মতের আমিন হলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।[৫৯১]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. তাকে প্রথমে বাইতুল-মালের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। এরপর তাকে শামে প্রেরিত বাহিনীর আমির বানানো হয়। শামের বিজয়ের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। হজরত উমর ফারুক রা. তাকে শামের সম্মিলিত মুসলিমবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[৫৯২]

শাম বিজয়ের পর মুসলমানদের অর্থসম্পদের ঘাটতি দেখা যায়নি। একারণে অবশ্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের তুলনায় মানুষের জীবনযাপনে কিছুটা পরিবর্তন চলে এসেছিল। কিন্তু হজরত আবু উবাইদা সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। দায়িত্ব পালনের কারণে সাথে কিছু বাহন এবং গোলাম রাখতেন। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় সামানা রাখা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন সময় দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কাঁদতেন।

একদিন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মুসলমানদের অর্জিত বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে বলেছেন, যদি তুমি সে সময় বেঁচে থাকো তা হলে তোমার জন্য তিনটি খাদেম যথেষ্ট হবে। এক খাদেম তোমার সেবা-যত্ন করবে। আরেক খাদেম তোমার বাহন দেখাশোনা করবে। অপরজন তোমার ঘরের কাজ আঞ্জাম দেবে। তোমার জন্য তিনটি বাহন যথেষ্ট হবে। একটি দিয়ে তুমি সফর করবে। একটি দিয়ে বিভিন্ন বোঝা বহন করবে। তৃতীয়টিতে তোমার গোলাম আরোহণ করবে। কিন্তু আজ আমার ঘর গোলাম দিয়ে পূর্ণ। আমার আস্তাবল আরোহণের জন্তু দিয়ে ভরপুর। এই অবস্থায় আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীভাবে মুখ দেখাবো? অথচ তিনি আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন,

---

[৫৯১] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৯১

[৫৯২] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১২৩

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার অধিক নিকটবর্তী এবং অধিক পছন্দনীয় হবে, যাকে আমি যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সে সেই অবস্থায় থাকবে।[৫৯৩]

উমর ফারুক রা. তাকে শামের গভর্নর বানিয়েছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। তিনি গনিমত হিসাবে যতটুকু সম্পদ পেতেন, তার অধিকাংশই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতেন। একবার হজরত উমর রা. খাদেমের মাধ্যমে তার নিকট ৪ হাজার দিনার পাঠান। এর সাথে তিনি খাদেমকে এটাও ভালোভাবে বলে দেন যে, তুমি দেখবে আবু উবাইদা এই দিনার দিয়ে কী করে? আবু উবাইদা তৎক্ষণাৎ সকল দিনার আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। খাদেম ফিরে এসে তাকে বিষয়টি জানালে হজরত উমর রা. বলেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি মুসলমানদের মধ্যে এমন উত্তম আমলদার লোক তৈরি করেছেন।[৫৯৪]

হজরত উমর ফারুক রা. যখন শামে গমন করেন তখন হজরত আবু উবাইদা রা. কে অত্যন্ত সাদাসিধে অবস্থায় দেখেন। তিনি একটি সাধারণ উটে আরোহণ করে ছিলেন। এর রশি ছিল খুবই সাধারণ মানের। হজরত উমর ফারুক রা. তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি ঘরে শুধু একটি বিছানা, পানির মশক এবং একটি পেয়ালা দেখতে পান। এ ছাড়া শুধু তরবারি, ঢাল, ঘোড়ার জিন প্রভৃতি জিহাদের সামানা ছিল। হজরত উমর ফারুক রা. তখন বলেন, আপনি এই অঞ্চলের আমির। আপনি তো প্রয়োজনীয় কিছু সামানাপত্র রাখতে পারেন!

তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আমার জীবনযাপনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খানাদানা কোথায়?

তিনি কিছুটা পেছনে সরে যব নিয়ে আসেন।

হজরত উমর রা. এটা দেখে কেঁদে ফেলে বলেন, আবু উবাইদা, তোমাকে ব্যতীত আমাদের সবাইকেই দুনিয়া বদলে ফেলেছে।[৫৯৫]

---

[৫৯৩] মুসনাদে আহমদ, ১৬৯৬

[৫৯৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১৭

[৫৯৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১৭

উত্তম গুণাবলির কারণে হজরত উমর ফারুক রা. বলতেন, আমার শুধু একটাই আকাঙ্ক্ষা, হায় যদি আবু উবাইদার মতো লোক দিয়ে আমার ঘর ভরে যেত![৫৯৬]

তার কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হতো; কিন্তু এগুলো অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করত। যুদ্ধের পূর্বে তিনি মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তুলতেন। জিহাদের মাধ্যমে শাহাদাত লাভের এবং গুনাহ মাফের আশা জাগিয়ে তুলতেন। কাতারে ঘুরে ঘুরে বলতেন, বহু মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ উজ্জ্বল; কিন্তু তাদের দীন-ধর্ম নোংরা! অনেক লোক নিজেকে সম্মানিত বানাতে গিয়ে অপমানিত করে ফেলে! লোকসকল, অতীতের গুনাহ-খাতাকে বর্তমানের নেক কাজ দ্বারা ধুয়ে ফেলো।[৫৯৭]

আবু উবাইদা অত্যন্ত মুত্তাকি, খোদাভীরু ও নরম মনের মানুষ ছিলেন। তিনি এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিনয়-নম্রতা এবং আখেরাতের চিন্তার কারণে অনেক সময় বলতেন, হায়, আমি যদি চুলার ছাই হয়ে যেতাম, বাতাস যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়![৫৯৮] অর্থাৎ যদি পরকালের হিসাবনিকাশ থেকে বাঁচার কোনো উপায় হয়ে যেত!

১৮ হিজরিতে জর্দান ও শামে এক ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ এতে মৃত্যুবরণ করেন। আমিনুল উম্মাহ (মুসলিম উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি) আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ সে সময় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।[৫৯৯] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৫৯৬] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫১৪৪

[৫৯৭] আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন সুফিয়ান কৃত আল মারিফাতু ওয়াত তারিখ, ২/৪২৭

[৫৯৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১৮

[৫৯৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/২৩

হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.

হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সত্যিকারের প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবি, যার সাহস, কোরবানি এবং দীনি মর্যাদাবোধের উপর ইসলামি ইতিহাস গর্ব করতে পারে। বংশীয়ভাবে তিনি কুরাইশের শাখা-গোত্র বনু তামিমের অন্তর্গত ছিলেন। ছিলেন আস সাবিকুনাল আওয়ালুন (প্রথম সারির মুসলমান) এবং আশারায়ে মুবাশশারারও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সূচনাকালে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হাতে যেই পাঁচ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি তাদের একজন। তিনি সেই ছয়জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, হজরত উমর ফারুক রা. শাহাদাতের পূর্বে যাদেরকে খেলাফতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

হজরত তালহা রা. হজরত আবু বকর রা. এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তার মাতার নাম সাবা বিনতে আবদুল্লাহ হাদরামি। তিনি ইয়ামানি ছিলেন। হজরত আলা বিন হাদরামি তার ভাই।[৬০০]

উহুদযুদ্ধের দিন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার জন্য এক বিরল কোরবানি পেশ করেছেন। তার এই কীর্তি হাদিস এবং সিরাতের পৃষ্ঠাগুলোতে চির ভাস্বর হয়ে আছে।

উহুদযুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হজরত তালহা রা. তখন তাকে কোলে নিয়ে উলটো পায়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাচ্ছিলেন। মুশরিকরা কাছাকাছি এসে পড়লে তিনি লড়াই করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আবার অগ্রসর হতেন। এ সময় হাতের মাধ্যমে কুরাইশদের তির প্রতিহত করতে করতে সারা জীবনের জন্য তিনি এক হাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। তার মাথা ফেটে যায়।

---

[৬০০] আল ইসাবা, ৩/৪৩০

গোটা শরীরে চব্বিশটি জখম হয়। এই অবস্থায়ও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্ষায় লৌহপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।[৬০১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই প্রাণোৎসর্গের দৃশ্য দেখে বলেন, 'তালহা জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।'[৬০২] ঐদিন হজরত তালহা রা. আহত হাতের ব্যথায় কাতরে উঠে বলেন, উফ, উফ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তুমি উফ, উফ-এর পরিবর্তে বিসমিল্লাহ বলতে তা হলে জান্নাতে তোমার জন্য নির্মিত ঘর তুমি দুনিয়াতেই দেখতে পারতে।[৬০৩]

শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের একটি পাথরের উপর আরোহণের চেষ্টা করেন। বর্মের ওজনের কারণে তিনি উঠতে পারছিলেন না। হজরত তালহা তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিচে বসে যান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর পা রেখে সেই পাথরের উপর আরোহণ করেন।[৬০৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তালহা ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা কোরবানির হক আদায় করেছে।[৬০৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন,

> من سرَّهُ أن ينظُرَ إلى شهيدٍ يمشي على وجهِ الأرضِ فلينظُرْ إلى طَلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ
>
> যে ব্যক্তি জমিনে চলমান কোনো শহিদকে দেখতে চায় সে যেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখে নেয়।[৬০৬]

অপর হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় চলমান কোনো জান্নাতিকে দেখতে চায় সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।[৬০৭]

---

[৬০১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩২
[৬০২] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৩৯
[৬০৩] আল ইসাবা, ৩/৪৩১
[৬০৪] উসদুল গাবাহ, ৩/৮৪
[৬০৫] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৪২
[৬০৬] সুনানে তিরমিজি, তালহা রা. এর মানাকিব অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
[৬০৭] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১৪৮১২

একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, হজরত তালহা রা. চারটি বিয়ে করেছিলেন। আর তার প্রত্যেক স্ত্রীর বোন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত স্ত্রী ছিলেন। তালহা রা. এর এক স্ত্রীর নাম উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা.। তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. এর বোন। তার দ্বিতীয় স্ত্রী হামনা বিনতে জাহাশ রা.। তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. এর বোন। তৃতীয় স্ত্রী হজরত ফারিয়া বিনতে আবু সুফিয়ান রা. এর বোন উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা রা.। চতুর্থ স্ত্রী হজরত রুকাইয়া বিনতে আবু উমাইয়া রা. ছিলেন উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা. এর বোন।[৬০৮]

হজরত তালহা রা. পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি অঢেল ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। কাজকর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সত্ত্বেও সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে বদরযুদ্ধের সময় তিনি ব্যবসার কাজে শামে থাকায় তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তিনি ভীষণ ব্যথিত ছিলেন। তবু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবির প্রতি এতটাই লক্ষ রেখেছিলেন যে, বদরের গনিমতের সম্পদের মধ্য থেকে তার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে রাখেন। এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাওয়াবের মধ্যে তাকেও গণ্য করেন।[৬০৯]

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহাবায়ে কেরাম এবং আপন সাথি-সঙ্গীদের জন্য প্রাণ খুলে উদার মনে খরচ করতেন। ভালো এবং কল্যাণকর কাজে তিনি সবসময় সামনের কাতারে থেকে অংশগ্রহণের কারণে উহুদযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে طلحة الخير (কল্যাণমণ্ডিত তালহা) জিল-উশাইরার যুদ্ধে طلحة الفياض (দানশীল তালহা) খাইবারযুদ্ধে طلحة الجود (দানবীর তালহা) উপাধি প্রদান করা হয়।[৬১০]

---

[৬০৮] আল ইসাবা, ৩/৪৩২
[৬০৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/২৫
[৬১০] আল মুজামুল কাবির, ১/১১২

এক জিহাদের সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি কূপের পাশ দিয়ে যান। সেই কূপের পানি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হয়। হজরত তালহা কূপটি ক্রয় করে সদকা করে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন,

ما انت يا طلحة الافياض

হে তালহা, নিঃসন্দেহে তুমি বড় দানশীল।[৬১১]

একবার হাদারামাওতের ব্যবসায় তিনি সাত লক্ষ টাকা মুনাফা করেন। গোটা রাত তিনি পার্শ্বপরিবর্তন করে কাটিয়ে দেন। তার স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা. কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তির ঘরে এত টাকা থাকে, সে আপন প্রতিপালকের থেকে কী আশা রেখে ঘুমাবে?

স্ত্রী বলল, সকাল হতেই আপনি পাত্র ভরে ভরে গরিব ও অসহায়দের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন।

আবু তালহা রা. বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি নেককার ব্যক্তির সন্তান।

সকাল হওয়া মাত্র তিনি সকল সম্পদ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এমনকি ঘরের জন্য সাত লক্ষ থেকে মাত্র এক হাজার পাঁচ পাই অবশিষ্ট ছিল।

একবার এক বেদুইন আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার নিকট সাহায্য চায়। তিনি ঐদিন হজরত উসমান রা. থেকে তিন লক্ষ দিরহামের একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। সে জমিটি বিক্রি করে তিনি সকল অর্থ তাকে প্রদান করেন।[৬১২]

হজরত আলি রা. এর শাসনকাল শুরু হলে হজরত তালহা পূর্বের খলিফা হজরত উসমান রা. এর কেসাসের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বলাবাহুল্য, হজরত উসমান রা. কে জুলুমবশত শহিদ করা হয়।

---

৬১১ আল ইসাবা, ৩/৪৩০

৬১২ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩১; বর্তমান হিসেবে যার পরিমাণ প্রায় সাত কোটি টাকা।

পরিস্থিতি তখন এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে, হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. হজরত আলি রা. এর ব্যাপারে ভুল ধারণার শিকার হয়ে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। কেসাসের মাসআলার প্রশ্নে সাহাবিদের উভয় দলের মতভিন্নতা ছিল। তবু উভয় দল যথাসম্ভব লড়াই থেকে বেঁচে থাকতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই সময় কিছু ফেতনাবাজ লোকের হাঙ্গামার কারণে জঙ্গে জামাল সংঘটিত হয়, যার শুরুতেই হজরত তালহা তির বিদ্ধ হয়ে শহিদ হন।[৬১৩] রাদিয়াল্লাহু আনহা

---

[৬১৩] তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত, ১৮৬; এই লড়ায়ের বিস্তারিত বিবরণ হজরত আলি রা. এর জীবনী আলোচনাকালে আসবে।

হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.

হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই এবং প্রিয় সাহাবি ছিলেন। শৈশবেই তিনি এতিম হয়ে যান। তার মাতা হজরত সাফিয়া রা. খুব সাহসী নারী ছিলেন। তিনি সন্তানের প্রতিপালনও এমনভাবে করেছেন যে, ডর-ভয়কে তার নিকট ভিত্তিহীন বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হজরত যুবাইর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারি তথা বিশেষ সাথি ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশ সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি তাদের একজন। হজরত উমর ফারুক রা. শাহাদাতের সময় যাদেরকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, তিনি তাদেরও একজন ছিলেন।

হজরত যুবাইর রা. ১৬ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম কবুলের কারণে তার চাচা তার উপর কঠিন থেকে কঠিনতর নির্যাতন করত। তাকে চাটাইয়ে প্যাঁচিয়ে ধোঁয়া দিত। কিন্তু এতেও তার দৃঢ়তায় চিঁড় ধরেনি।[৬১৪]

ইসলাম কবুলের পর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রাণ উৎসর্গের হক আদায় করেছেন।

তিনি তখনও ছোট্ট বালক ছিলেন। একবার কাফেরদের মুখে মুখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গ্রেফতার হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়লে তিনি শোনামাত্র তরবারি উঠিয়ে পাগলের মতো বেরিয়ে যান। যেই তাকে দেখতো, পেরেশান হয়ে যেত যে, এই বালকটি তরবারি উন্মুক্ত করে কোথায় যাচ্ছে! অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ জিজ্ঞেস করলে হজরত যুবাইর রা. বলেন, শুনলাম আপনি নাকি গ্রেফতার হয়েছেন!

---

[৬১৪] আল ইসাবা, ২/৪৫৯

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই ভালোবাসায় আনন্দিত হয়ে তার জন্য দোয়া করেন। এটাই ছিল ইসলামের জন্য কোষমুক্ত করা প্রথম তরবারি।[৬১৫]

তিনি বেশ দীর্ঘদেহী ছিলেন। ঘোড়ায় আরোহণ করলেও তার পা জমিনে লেগে যেত।[৬১৬]

তার বাহুর জোর ছিল অত্যন্ত প্রবল। খন্দকযুদ্ধে বর্ম-পরা এক অশ্বারোহী তার মোকাবেলায় এলে তিনি তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেন। এতে তরবারি তার শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং শরীরের হাড্ডি কেটে ঘোড়ার জিন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।[৬১৭]

তিনি হাবশা ও মদিনা উভয় স্থানে হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

বদরযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। বাম বাহুতে একমাত্র অশ্বারোহী ছিলেন হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ। যুবাইর রা. ছিলেন ডান বাহুর একমাত্র অশ্বারোহী। তিনি তখন হলুদ পাগড়ি পরে ছিলেন। এটা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الملائِكَةَ نزلَت على سيماءِالزُّبَيْر

ফেরেশতারা যুবাইরের পোশাক পরিধান করে অবতীর্ণ হয়েছে।[৬১৮]

মদিনায় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মেয়ে আসমা রা. এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। হিজরতের পর তাদের ঘরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. জন্মগ্রহণ করেন। এটা ছিল মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম কোনো সন্তান জন্মের ঘটনা। এই কারণে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়।[৬১৯]

খন্দকযুদ্ধের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার ইহুদিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য বলেন, কে বনু

---

[৬১৫] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ১৯৫২০

[৬১৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪১, ৪২

[৬১৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৫১

[৬১৮] মুসনাদে বাযযার, ২৩৩৮; আল মুজামুল কাবির, ১/১২০

[৬১৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩/২৬৫

কুরাইযার সংবাদ এনে দেবে? হজরত যুবাইর রা. সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন,

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيَّ، وإِنَّ حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ.

প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারি থাকে, আমার হাওয়ারি যুবায়ের।[৬২০]

এই যুদ্ধে তার প্রাণ উৎসর্গের দৃশ্য দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠেন, আমার মাতাপিতা তোমার উপর কোরবান হোক।[৬২১]

খাইবারের যুদ্ধে ইহুদি পাহলোয়ান মারহাব নিহত হলে তার ভাই ইয়াসির মল্লযুদ্ধের জন্য চিৎকার করতে থাকে। হজরত যুবাইর রা. তার মোকাবেলায় এসে তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন।[৬২২]

মক্কাবিজয়ের সময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন।[৬২৩] একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর রা. কে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন,

والزُّبَيرُ في الجنَّةِ

যুবাইর জান্নাতি।

হজরত উসমান একবার হজরত যুবাইর রা. এর ব্যাপারে বলেন,

إنْ كان لَخيرَهم، وأحَبَّهم إلى رسولِ اللهِ ﷺ

নিঃসন্দেহ তিনি মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।[৬২৪]

একজন মুজাহিদের মতো তার গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তার শরীরে বিশেষত বুকে এবং কাঁধে জিহাদে পাওয়া গভীর ক্ষত ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কখনো কোনো সেনাবাহিনীর

---

[৬২০] সহিহ বুখারি, ৪১১৩; উসদুল গাবাহ, ২/৩০৭
[৬২১] মুসনাদে আহমদ, ১৪০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১২৩
[৬২২] সিরাতে ইবনে হিশাম, ২/৩৩৪
[৬২৩] সহিহ বুখারি, ৪২৮০
[৬২৪] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৪১

প্রধান বানাননি কিংবা বড় ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করেননি। খোলাফায়ে রাশেদিন তার সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করেছেন। হজরত যুবাইর রা. মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ সৈনিকের মতো জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন। এটা তার ইখলাসের সুস্পষ্ট দলিল।[৬২৫]

ইয়ারমুক বিজয়ে তার শাহাদাতের প্রচণ্ড আগ্রহ এবং অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার বড় অবদান ছিল। ওই দিন তিনি রোমানদের আড়াই লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর একদিক থেকে প্রবেশ করে তাদেরকে আক্রমণ করতে করতে অপর দিক দিয়ে বের হয়ে যান। এরপর উলটো দিক থেকে কাতার লন্ডভন্ড করে তিনি পূর্বের মতোই ফিরে আসেন। এর মধ্যে এক জায়গায় রোমানরা তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে ঘিরে ফেলে। তাদের আক্রমণে যুবাইর রা. আহত হন; কিন্তু বাঘের মতো লড়াই করে তাদেরকে হত্যা করে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। এর মধ্যে তার কাঁধে ঘাড়ের নিকট গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। বদরযুদ্ধে একটি আঘাত পেয়েছিলেন। এই যুদ্ধে আরেকটি আঘাত পান, যা কখনো ভরাট হওয়ার মতো ছিল না। ছোট বাচ্চারা এই গর্তে আঙুল প্রবেশ করিয়ে খেলা করত। যুদ্ধে তরবারি ব্যবহার করতে করতে তার হাত শক্ত হয়ে গিয়েছিল।[৬২৬]

হজরত হাসসান বিন সাবেত রা. হজরত যুবাইর রা. এর প্রশংসায় আবৃত্তি করেন,

أَقامَ عَلى عَهدِ النَبِيِّ وَهَديِهِ* حَوارِيُّهُ وَالقَولُ بِالفِعلِ يُعدَلُ

هُوَ الفارِسُ المَشهورُ وَالبَطَلُ الَّذي* يَصولُ إِذا ما كانَ يَومٌ مُحَجَّلُ

إِذا كَشَفَت عَن ساقِها الحَربُ حَشَّها* بِأَبيَضَ سَبّاقٍ إِلى المَوتِ يَرفُلُ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার উপর তিনি অটল ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাওয়ারি, যার কথা এবং কাজ এক।

---

[৬২৫] সহিহ বুখারি, ৩১২৯

[৬২৬] সহিহ বুখারি, ৩৯৭৫

তিনি বিখ্যাত অশ্বারোহী ও বাহাদুর। লোকেরা যেদিন লুকিয়ে থাকে সেদিন তিনি হামলা করেন। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে তিনি তরবারি নিয়ে সবার পূর্বে মৃত্যুর দিকে দৌড়ে যান।[৬২৭]

হিজরতের পর প্রথম দিকের কয়েক বছর অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। বনু নাজিরের যুদ্ধের পর বণ্টিত জমির মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি বাগান প্রদান করেন। এতে তার অবস্থার উন্নতি হয়।[৬২৮]

মুসলমানদের বিজয়কালে আল্লাহ তায়ালা তাকে অত্যন্ত সচ্ছলতা দান করেন। তার অধীনে এক হাজার গোলাম ছিল। তারা কামাই-রোজগার করে তাকে অর্থ প্রদান করত। হজরত যুবাইর রা. এতটাই দানশীল ছিলেন যে, গোলামদের উপার্জনের এক পয়সাও রাখতেন না, সব সদকা করে দিতেন।[৬২৯]

উমর ফারুক রা. এর শাসনকালে মিসর বিজয়ের সময় তিনি আমর ইবনুল আস রা. এর সহকারী ছিলেন। ফুসতাত এবং আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ে তার বিশাল অবদান ছিল।[৬৩০]

হজরত উসমান রা. একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নাক থেকে বারবার রক্ত বের হচ্ছিল। তিনি এ কারণে হজে যেতে পারছিলেন না। তার অবস্থা নাজুক হয়ে পড়লে সাথি-সঙ্গীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসিয়ত করেন। কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণে কোনো ফয়সালা করেননি। লোকদের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। তখন তার এক প্রতিনিধি উসমান রা. কে বললেন, আপনি একজন স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে যান।

হজরত উসমান রা. জিজ্ঞেস করেন, লোকজন কি এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছে?

প্রতিনিধি বলল, জি, হ্যাঁ।

---

[৬২৭] উসদুল গাবাহ, ২/৩০৭
[৬২৮] সহিহ বুখারি, ৩১৫১
[৬২৯] আল ইসাবা, ২/৪৬০
[৬৩০] ফুতুহুল বুলদান, ২১০

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কার ব্যাপারে কথা বলছে?

প্রতিনিধি তখন চুপ রইল। এরপর দ্বিতীয় প্রতিনিধি এসে একই কথা বলল। হজরত উসমান রা. তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সেও চুপ হয়ে গেল।

হজরত উসমান রা. নিজেই অনুমান করে বললেন, সম্ভবত তারা যুবাইরের ব্যাপারে বলছে।

তারা বলল, জি, হ্যাঁ।

হজরত উসমান বললেন, আল্লাহর কসম, সে সর্বোত্তম মানুষ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবি।[৬৩১]

হজরত আলি রা. এর শাসনকালে জঙ্গে জামাল সংঘটিত হয়। এতে মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই সংঘটিত হয়। কিন্তু ওই সময় হজরত যুবাইর রা. সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে যুদ্ধ থেকে বের করে আনেন। বসরা থেকে একুশ মাইল দূরে অবস্থিত এক দুরাচারী আমর

---

[৬৩১] সহিহ বুখারি, ৩৭১৭; এটা হজরত উসমান গনি রা. এর শাসনকালের প্রথম বছর অর্থাৎ ২৪ হিজরির ঘটনা। এই বছর নাক থেকে রক্ত ঝরার রোগটি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এজন্য একে سنة الرعاف /عام الرعاف (নাক থেকে রক্ত ঝরার বছর) বলা হয়। (তারিখে আবু যুরআ দিমাশকি, ১৮৪)

এই বর্ণনার মাধ্যমে বোঝা যায় ওই সময় সততা এবং আল্লাহর রাসুল সা. এর নৈকট্যভাজন হওয়াটা খলিফা হওয়ার যোগ্যতার মূলনীতি ছিল। এটা এখনো আমলযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে খেলাফতের জন্য নির্বাচন করা হবে নবীজি সা. এর দরবারে যার মাকবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। সুন্নতের সর্বাধিক অনুসরণ এবং ইসলামের জন্য অধিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে।

নোট : উল্লিখিত বর্ণনা হজরত আলি রা. এর চতুর্থ খলিফা হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। এর মাধ্যমে শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, ওই সময় কিছু লোক হজরত যুবাইর রা. কে খলিফা হিসেবে দেখতে চাইত। তার প্রতি মানুষের আগ্রহের বিষয়টি হজরত উসমান রা. এরও জানা ছিল। হজরত উসমান রা. এর উত্তর দ্বারা প্রমাণিত হয় যুবায়েরও উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। এটা বুঝা যায় না যে, তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন কিংবা হজরত আলি রা. স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। প্রথম তিন খলিফার পর হজরত আলি রা. ফজিলতের প্রশ্নে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তার খেলাফতের ব্যাপারে স্বতন্ত্র দলিল প্রমাণ রয়েছে। আকায়েদের কিতাবে বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ রয়েছে। যথাস্থানে আমরা এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে করব।

বিন জরমুয সদলবলে আক্রমণ করে তাকে শহিদ করে ফেলে। ওই সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। এটা ৩৬ হিজরির জুমাদাল উখরা মাসের ঘটনা।[৬৩২]

তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। মৃত্যুর সময় তার নিকট একটি দিনার-দিরহামও ছিল না। হ্যাঁ, তখন তার মালিকানায় বহু জমিজমা ছিল। আপন ছেলে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে সকল সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার অসিয়ত করে যান। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. হিসাব করে দেখেন তার কাঁধে ২২ লক্ষ দিরহাম ঋণ।[৬৩৩]

হজরত যুবাইর রা. আল্লাহর উপর অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। তিনি আপন ছেলেকে তাগিদ দিয়ে গিয়েছিলেন, যদি এসব ঋণ আদায় না হয় তা হলে আমার মনিব এবং মাওলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. তার মাওলা ও মনিব দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা বুঝতে পারেননি। তাই জিজ্ঞাসা করেই ফেলেন, আপনার মাওলা কে? তিনি বলেন, আল্লাহ।

তিনি শহিদ হয়ে যাওয়ার পর হজরত হাকিম বিন হিযাম রা. ঋণের বিষয়টি জানতে পেরে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. কে জিজ্ঞেস করেন, ভাতিজা, আমার ভাইয়ের উপর কী পরিমাণ ঋণ আছে?

---

[৬৩২] আল ইসতিয়াব, ২/৫১৫; যিরিকলি কৃত আল আলাম, ৩/৪৩

[৬৩৩] সহিহ বুখারি, ৩১২৯ নং হাদিসে এসেছে, فوجدته الفي ألف و مأتي ألف
কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন দুই কোটি দুই লক্ষ। তেমনিভাবে কেউ কেউ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২৯ হিজরির মৃত্যু) অধীনে উল্লিখিত

جميع ما تركه من الدين والوصية و الميراث تسعة و خمسين ألف ألف و ثمان مأة ألف

এর অনুবাদ করেছেন ৫৮ কোটি ৮ লক্ষ। এই অনুবাদ সঠিক নয়। ألف ألف দ্বারা এক কোটি উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা এক মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ লক্ষ। (মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়া আল মুআসারা, ৩/২১২৫)
মাওলানা জহুরুল বারি আযমি সহিহ বুখারির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ গ্রন্থে ألف ألف এর অনুবাদ দশ লক্ষ করেছেন। (তাফহিমুল বুখারী, ২/২০৬)

হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. পূর্ণ ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করেননি; বরং কিছু অংশের কথা উল্লেখ করেন। হজরত হাকিম বিন হিযাম রা. চিন্তিত হয়ে বলেন, আমার মনে হয় না তুমি এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। তাই প্রয়োজন হলে আমার সাহায্য গ্রহণ করবে।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. ঋণ পরিশোধের জন্য জমিজমা বিক্রি শুরু করলে তিনি আশাতীত মূল্য লাভ করেন। শুধু বাগানের জমি, যা হজরত যুবাইর রা. এক লক্ষ ৭০ হাজার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ১৬ লাখে বিক্রি করেন। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর তখন ঘোষণা করেন, যারা আমার পিতার নিকট ঋণ পাবে তারা যেন সেটা উসুল করে নেয়। সকল ঋণ পরিশোধ করার পর উত্তরাধিকারীরা মিরাস বণ্টনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বললেন, আল্লাহর কসম, আমি চার বছর পর্যন্ত হজে ঘোষণা করাব যে, কেউ ঋণ পেলে সে যেন এটা উসুল করে নেয়। এরপর মিরাস বণ্টিত হবে।

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. বলেন, যখনই আমি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যেতাম, তৎক্ষণাৎ আমি দোয়া করতাম, 'হে যুবাইরের মাওলা, আপনি এই ঋণ পরিশোধ করে দিন!' তখন ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

চার বছর পর্যন্ত যখন কারও পক্ষ থেকে ঋণের কোনো দাবি জানানো হয়নি তখন অবশিষ্ট সম্পত্তিকে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এতে বহু বরকত হয়। তার এক একজন স্ত্রীই ১২ লক্ষ দিরহাম করে পেয়েছেন। বিক্রীত এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি ২ লক্ষ দিরহাম।[৬৩৪]

---

[৬৩৪] সহিহ বুখারি, ৩১২৯

নোট- ১ : এটা দিরহাম হিসেবে। রুপি হিসেবে এর পরিমাণ প্রায় আড়াইশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। হজরত যুবাইর রা. এর কাছে থাকা ২২ লক্ষ দিরহাম ঋণের পরিমাণ আজকালের হিসেবে প্রায় ৫৫ কোটি রুপি হবে। কিন্তু তার নিকট যেভাবে অঢেল ধনসম্পদ আসত সেভাবেই তিনি খুশিমনে সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতেন।

নোট-২ : সহিহ বুখারির এই বর্ণনায় মিরাসের নীতিমালা এবং হিসাবনিকাশের দিক থেকে কিছু আপত্তি তৈরি হয়। এজন্য হাফেজ ইবনে কাসির এর ব্যাখ্যা করেন,
২২ লক্ষ দিরহাম ঋণ পরিশোধ করা হয়।

হজরত তালহা রা. এর সঙ্গে হজরত যুবাইর রা. এর গভীর সম্পর্ক ছিল। উভয়েই কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের চালচলন প্রায় একই ধরনের ছিল। উভয়ে একইসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর জামাতা ছিলেন। বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মত্যাগের দিক দিয়েও উভয়ে সমান ছিলেন। তারা পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিলেন। এই দুজন গোটা জীবন একসাথে ছিলেন। এমনকি জঙ্গে জামালের সময় উভয়ে শহিদ হয়ে যান। হাদিস ও ইতিহাসে উভয়ের নাম একসঙ্গেই উল্লেখ করা হয় এবং আজ অবধি উভয়ের নাম একসঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। যার পরিমাণ ছিল এক কোটি ৯২ লক্ষ দিরহাম।

অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যার পরিমাণ ছিল তিন কোটি ৮৪ লক্ষ দিরহাম।

এই থেকে হজরত যুবাইর রা. এর চার স্ত্রী প্রত্যেকেই ১২ লক্ষ দিরহাম লাভ করেছেন।

তার ঋণ, অসিয়ত এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি ৯৮ লক্ষ দিরহাম। অর্থাৎ আনুমানিক ১৪ বিলিয়ন ৯৫ কোটি রুপি।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আট-দশ ব্যক্তির মধ্যে তিনিও ছিলেন। ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। যারা ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে সর্বাধিক পরিমাণে সম্পদ ব্যয় করেছেন, তিনি তাদেরও একজন। সাহাবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।[৬৩৫]

ইসলামপূর্ব জমানায় তার নাম ছিল আবদে আমর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখেছেন আবদুর রহমান।[৬৩৬] তিনি বনু যুহরা গোত্রীয় ছিলেন। হস্তীবাহিনীর মক্কা আক্রমণের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আওফ বিন আবদে আওফ। মায়ের নাম সাফিয়া। তিনি এতটাই পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, জাহিলিযুগেও কখনো মদ স্পর্শ করে দেখেননি।

তিনি সেই দশ মহান সাহাবির একজন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের আগাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হজরত উমর ফারুক রা. যাদেরকে নতুন খলিফা নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যেও ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ছিলেন দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন। তার চোখ বড় ছিল। পলকগুলো ছিল ঘন। সুন্নাত মোতাবেক তিনি কানের পার্শ্বে দাড়ি রাখতেন।[৬৩৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ঘোষণা করার সময় তার বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। হাবশায় প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে

---

[৬৩৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৭৪, ৭৫

[৬৩৬] আবু নুয়াইম ইসফাহানির মারিফাতুস সাহাবা, হাদিস ৪৫৪

[৬৩৭] আল ইসাবা, ৪/২৯২

তিনিও ছিলেন। কিছুদিন পরই সেখান থেকে ফিরে আসেন। এর কয়েক বছর পর অন্যান্য সাহাবির সাথে তিনি মদিনায় হিজরত করেন।[৬৩৮]

তিনি খালি হাতে মদিনায় পৌঁছান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সা'দ বিন রবি আনসারি রা. এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সা'দ তাকে শুধু নিজের অর্ধেক মালই হাদিয়া হিসেবে পেশ করেননি; বরং তিনি বলেন, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে, যাকে পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। ইদ্দত পালনের পর তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। কিন্তু আবদুর রহমান বিন আউফ রা. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমার ধনসম্পদ ও ঘরবাড়িতে বরকত দিন। আমাকে তুমি বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও।'

বাজারে গিয়ে তিনি প্রথমদিন কিছু খেজুর এবং পনির বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এ পরিমাণ কেনাবেচা করেন যে, এর মাধ্যমে বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। মোহর হিসেবে স্ত্রীকে তিনি খেজুরের দানা পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিয়ের খবর জানতে পেরে বলেন, একটি বকরির মাধ্যমে হলেও ওলিমার ব্যবস্থা করো।[৬৩৯]

ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকেও তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি সেসব আলেম সাহাবির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মাসআলা বলতেন।[৬৪০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোথাও গিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. কে ইমাম বানিয়ে নামাজ পড়া শুরু করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আবদুর রহমান রা. এর পেছনে নামাজ আদায় করেন।

---

[৬৩৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৭৪, ৭৫

[৬৩৯] সহিহ বুখারি, ৫১৬৭, আল মুজামুল কাবির, ১/২৫২

[৬৪০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৮৬

গোটা উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে এ ফজিলত একমাত্র তারই নসিব হয়েছে।[৬৪১]

আল্লাহ তায়ালা তার ব্যবসায় বহু বরকত দান করেন। তিনি মাটিতে হাত লাগালে তা সোনা হয়ে যেতো। খুব কম সময়ে তিনি বিশাল অর্থশালী হয়ে যান। তার ব্যবসার পণ্য কয়েকশ উট-বোঝাই হয়ে আসত।[৬৪২]

মদিনা থেকে শামের দিকে তিন মাইল (পৌনে পাঁচ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত জারিফ নামক স্থানে তিনি একটি খেত ক্রয় করেছিলেন, যার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, তাতে পানি দেওয়ার জন্য তিনি বিশটি উট বরাদ্দ রেখেছিলেন।[৬৪৩]

তার সম্পদ এত অধিক ছিল যে, মৃত্যুর সময় তার গবাদি পশুর মধ্যে ১ হাজার উট, ৩ হাজার বকরি এবং ১০০ ঘোড়া ছিল। তার সম্পত্তির অষ্টমাংশ স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২০ হাজার।[৬৪৪]

তিনি এসব সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে খরচ করতেন, মনে হতো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সম্পদ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকতো। মদিনার দরিদ্র, বহিরাগত মুসাফির এবং মেহমানদের জন্য তিনি হাত খুলে খরচ করতেন। জিহাদের সময় তার দানশীলতার পরিমাণ আরও বেড়ে যেতো। তাবুকযুদ্ধে অর্থমূল্যের বিচারে সবচেয়ে বড় অংশ তিনিই প্রদান করেছিলেন, যা তার যাবতীয় সম্পদের এক-

---

[৬৪১] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১২৩৬; একবার হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছিল। নবী সা. কোথাও গিয়েছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. নামাজ পড়ানো শুরু করেন। এর মধ্যেই রাসুল সা. আগমন করেন। তিনি পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে যান। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. পিছিয়ে আসতে শুরু করলে রাসুল সা. ইশারায় তাকে পেছাতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি থেমে যাননি; বরং পেছনে সরে আসেন। রাসুল সা. ইমামতি করেন। রাসুল সা. পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করেন, আমি ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও তুমি কেন পেছনে সরে এলে? তিনি বললেন, আবু কোহাফার বেটা রাসুল সা. এর সামনে নামাজ পড়াবে, এটা হতে পারে না! (সহিহ বুখারি, ১২৩৪)

[৬৪২] আল মুজামুল কাবির, ১/১২৯; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৮

[৬৪৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৯২

[৬৪৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৯১, ৯২

চতুর্থাংশ ছিল। জিহাদের জন্য একবার তিনি ৪০ হাজার দিনার, একবার ৫০০ ঘোড়া, আরেকবার তিনি ৫০০ উট দান করেন।[৬৪৫]

তার ব্যবসার পণ্য মদিনায় এলে চতুর্দিকে হইচই পড়ে যেত। মানুষ বুঝতে পারত বিশাল বড় বাণিজ্যকাফেলা আসছে। একবার ৭০০ উট বোঝাই ব্যবসায়িক সম্পদ মদিনায় আসে। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল সম্পদ, উট এমনকি তার রশি সব আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেন।[৬৪৬]

তিনি মদিনার ফকির-গরিব ও বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দিতেন। কেউ চাইলে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি মদিনাবাসীদের জীবিকানির্বাহের প্রধানব্যক্তি ছিলেন। মদিনার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের ঋণ পরিশোধ করতেন। এক-তৃতীয়াংশকে ঋণ প্রদান করতেন। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায়ে রাখতেন।[৬৪৭]

গোলাম-বাঁদি ক্রয় করে আজাদ করে দিতেন। তাদের থেকে দোয়া নিতেন। তিনি গোটা জীবনে ৩০ হাজার গোলামকে এভাবেই মুক্ত করে দিয়েছেন।[৬৪৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওমাতুল জানদালে এক ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠানোর সময় আবদুর রহমান বিন আউফ রা. কে তার প্রধান সেনাপতি নির্ধারণ করেন। তিনি নিজেই তার মাথায় আপন হাতে পাগড়ি বেঁধে দেন। সাথে তিনি এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, বিজয়ী হলে সেখানকার শাসকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারো। বিজয়ের পর আবদুর রহমান বিন আউফ রা. সেখানকার শাসকের মেয়ে তামাযুরকে বিয়ে করেন। হজরত আবু সালামা তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৪৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর আবদুর রহমান বিন আউফ রা. উম্মুল মুমিনিনদের জীবিকার প্রতি

---

[৬৪৫] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৯, আল মুজামুল কাবির, ১/১২৯

[৬৪৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৭৬

[৬৪৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১/৮৮

[৬৪৮] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৯

[৬৪৯] উসদুল গাবাহ, ৩/৪৭৫

বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছিলেন,

الذي يحافظ على أزواجي من بعدي هو الصادق البار

আমার পর যে আমার স্ত্রীদের প্রতি লক্ষ রাখবে, সে সত্যবাদী এবং সৎকর্মপরায়ণ।[৬৫০]

হজরত আবদুর রহমান রা. উম্মুল মুমিনিনদের যে হক আদায় করেছেন তা কেউ পারেনি। একবার তিনি বিশাল জায়গির ক্রয় করে তা বনু যুহরার দরিদ্র এবং উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. তার অংশ লাভ করে বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইবনে আউফকে জান্নাতের ঝরনা সালসাবিল দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, সৎকর্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী ব্যক্তি তোমাদের খেয়াল রাখবে।[৬৫১]

একবার তিনি ৪০ হাজার অর্থমূল্যের একটি বাগান উম্মুল মুমিনিনদের জন্য ওয়াকফ করে দেন।[৬৫২]

অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র লোকদের দেখে তিনি কাঁদতেন। যদিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তবু তিনি আপন পরিণামের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতেন। একবার তিনি ইফতারির জন্য বসেছিলেন তখন তিনি বলেন, 'মুসআব বিন উমায়ের রা. কে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। সে আমার চেয়ে অধিক নেককার ছিল। তাকে তার চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছে। সেই চাদর এত ছোট ছিল, যদি তার মাথা ঢাকা হতো, পা অনাবৃত হয়ে যেত। আর পা আবৃত করা হলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত।

এরপর তিনি বলেন, হজরত হামযা রা. কে শহিদ করে ফেলা হয়েছে। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আমাদের জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে

---

[৬৫০] আল ইসাবা, ৪/২৯৪

[৬৫১] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫৩৫৭

[৬৫২] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৫০

দেওয়া হয়েছে। আশংকা হয়, আমাদের নেককাজের বদলা না-জানি দুনিয়াতেই মিলে যায়।

একথা বলে তিনি কাঁদতে থাকেন। ক্রন্দনের ফলে তিনি খানাই খেতে পারেননি।[৬৫৩]

একবার তার সামনে রুটি এবং গোশত পরিবেশন করা হলে তিনি ক্রন্দন করেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

مات رسولُ اللهِ ﷺ ولم يَشبَعْ هو ولا أَهْلُه مِن خُبزِ الشَّعيرِ

মৃত্যু পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার পেট ভরে যবের রুটি খেতে পারেননি।[৬৫৪]

একবার তিনি ৪০ হাজার দিনারের একটি জমি ক্রয় করেন। সাথে সাথে তিনি এই অঢেল সম্পদের কারণে পেরেশান হয়ে পড়েন। এরপর উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কারণ, কুরাইশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি আমি। উম্মে সালামা রা. বললেন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করুন।[৬৫৫]

একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছেন। জাগ্রত হয়ে তিনি বলেন, দরিদ্র লোকেরাই মনে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৫৬]

কিছু বর্ণনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিসাব-কিতাবের কারণে আবদুর রহমান বিন আউফ তার সাথি-সঙ্গীদের পেছনে থেকে যাবে এবং হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এই ধরনের বর্ণনা দেখে আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়। কেননা এই বর্ণনাটি

---

[৬৫৩] উসদুল গাবাহ, ৩/৪৭৫

[৬৫৪] আল ইসাবা, ৪/২৯৪

[৬৫৫] মুসনাদে আহমদ, ২৬৪৮৯

[৬৫৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৮১

সনদের বিচারে দুর্বল। পক্ষান্তরে আবদুর রহমান বিন আউফের জান্নাতি হওয়াটা অন্যান্য সহিহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। যদি এসব দুর্বল রেওয়ায়েতকে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক মানা হয়; তবু বাহ্য-অর্থ নেওয়াটা ভুল হবে। হাফেজ জাহাবি রহ. এই রেওয়ায়েতের সনদকে জরাহ করে বলেন, 'মোটকথা, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. এর হিসাব-কিতাবের কারণে আপন সাথিদের পেছনে থেকে যাওয়া এবং জান্নাতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায় জান্নাতে হজরত আলি এবং হজরত যুবাইর রা. এর চেয়ে তার স্তর নিচে নয়।[৬৫৭]

হজরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগে তিনি মদিনায় বসবাস করেন। মদিনায় থেকে তিনি কেন্দ্রীয় পরামর্শের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, তার উপর সাহাবায়ে কেরামের আস্থা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য তার কল্যাণকামিতার বিষয়টি এর মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, উমর ফারুক রা. এর খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্যের শুরা কমিটির মধ্যে তাকেই ফয়সালাকারী বানিয়েছেন।

তিনি চাইলে খেলাফতকে নিজের জন্য বা আপন নিকটাত্মীয় হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর নামে করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি পূর্ণ আমানতদারির সাথে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামিতার বিষয়টি সামনে রেখে নিজের ব্যক্তিগত মতামতের পরিবর্তে সাধারণ জনগণের সকলের মত যাচাই করেন। এরপর তিনি হজরত উসমান রা. কে এই দায়িত্বের জন্য নির্বাচন করেন।

মৃত্যুর পূর্বে কৃত অসিয়তে তিনি দানশীলতার মহান দৃষ্টান্ত পেশ করেন। জিহাদের জন্য তিনি ১ হাজার ঘোড়া ওয়াকফ করার, ৫০ হাজার দিনার সদকা করার এবং প্রত্যেক বদরি সাহাবিকে ৪০০ দিনার হাদিয়া দেওয়ার অসিয়ত করে যান।[৬৫৮]

---

[৬৫৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৭৭

[৬৫৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৯০

জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন। যারা তাকে শেষবয়সে দেখেছেন, তারা বলেন, তার চেহারায় উজ্জ্বল লালিমা ঝিকমিক করত। মাথায় এবং দাড়িতে তিনি মেহেদি বা খেযাব লাগাতেন না।[৬৫৯]

৩২ হিজরিতে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এক বর্ণনায় আছে, এক লোক তাকে বলেছিল, হজরত উসমান তার পরে আপনাকে খলিফা নির্ধারণ করতে চান। একথা শোনামাত্র আবদুর রহমান বিন আওফ রা. ভীষণ ঘাবড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে নববিতে উপস্থিত হন। রিয়াজুল জান্নাহয় দাঁড়িয়ে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, এমন দায়িত্ব আসার পূর্বে আপনি আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।

এই দোয়ার ছয় মাস পর তার ইনতেকাল হয়ে যায়। তিনি ৭৫ বছর বয়স লাভ করেছিলেন। হজরত উসমান রা. তার জানাজার নামাজ পড়ান। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।[৬৬০] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৬৫৯] আবু নুয়াইম ইসফাহানি কৃত মারিফাতুস সাহাবা, হাদিস ৪৬০

[৬৬০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৮৮

হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা.

হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. প্রথম সারির সে-সকল মুসলমানের একজন, মক্কায় তাওহিদের ধ্বনি উচ্চকিত হতেই যারা লাব্বাইক বলেছিলেন। তিনি কুরাইশের শাখা বনু আদির অন্তর্গত ছিলেন। হজরত উমর রা. এর ভগ্নীপতি ছিলেন। তার পিতা যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল জাহেলিযুগের সেসকল উত্তম গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির একজন ছিলেন, যারা নিজেদের মিল্লাতে ইবরহিমের অনুসারী বলতেন, যারা মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাওহিদের অনুসরণ করতেন এবং মূর্তির নামে জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করতেন না।[৬৬১]

ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই হজরত যায়েদ বিন আমর মৃত্যুবরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালে তার মুক্তির জন্য সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, কেয়ামতের দিন সে একাই এক উম্মত হিসেবে আসবে।[৬৬২]

সাঈদ বিন যায়েদ রা. ইসলাম কবুল করার পর সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকতেন। স্বভাবগতভাবে তিনি নম্র ছিলেন। কম কথা বলতেন। নিঃস্বার্থ ছিলেন। কখনো নিজেকে প্রসিদ্ধ হতে দেননি। তবে বরাবরই তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত উবাই বিন কাব রা. এর সঙ্গে তার দীনী ভ্রাতৃত্ব ছিল।

সকল যুদ্ধে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন। বদরযুদ্ধের পূর্বে কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলার গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও তিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে

---

[৬৬১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১২৭

[৬৬২] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫৮৫৫

পারেননি; তবু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদরি গাজিদের সমান গনিমত প্রদান করেছেন। খেলাফতে রাশেদার সময় শামের বিজয়ে আবু উবাইদা রা. এর সঙ্গী ছিলেন। বিশেষ করে ইয়ারমুকের যুদ্ধ এবং দামেশক বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৬৬৩] হিজরতের পর থেকে মদিনায় বসবাস করেন। আকিক নামক এক জায়গিরের আয় থেকে তার জীবিকা নির্বাহ হতো। পরবর্তীতে হজরত উসমান রা. তাকে ইরাকে জায়গির প্রদান করেন।[৬৬৪]

সাঈদ রা. এর জায়গিরের সাথে উরওয়া নামক এক মহিলার জমিন ছিল। হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে সেই মহিলা দাবি করে যে, সাঈদ তার জমিন আত্মসাৎ করেছেন! মদিনার শাসক মারওয়ান বিষয়টির তদন্ত শুরু করেন। তখন হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. মারওয়ানকে বলেন, আপনি কি মনে করেন আমি এই মহিলার উপর সীমালংঘন করেছি; অথচ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি আত্মসাৎ করবে, কেয়ামতের দিন ওই পরিমাণ সাত স্তরের জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।[৬৬৫]

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা. নিজের জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য তাকে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামাও তাকে এই অসিয়ত করে গিয়েছিলেন।[৬৬৬]

হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. জীবনের অধিকাংশ সময়ই একাকী কাটিয়েছেন। এই বিষয়টি এর মাধ্যমেও বুঝে আসে যে, আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের খুব কম বিষয়ই

---

[৬৬৩] উসদুল গাবাহ, ২/৪৭৬

[৬৬৪] মুসনাদে আহমদ, ১৬৪২

[৬৬৫] সহিহ বুখারি, ৩১৯৮

[৬৬৬] মুসতাদরাকে হাকিম, ৬৭৬৭; কিন্তু ৫৬ হিজরিতে সাঈদ বিন যায়েদ রা. এর ইনতেকাল হয়ে যায়। হজরত উম্মে সালামা রা. এর পরেও কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। তার মৃত্যুর আট বছর পর ৬৪ হিজরিতে উম্মে সালামা রা. মৃত্যুবরণ করেন। (আল ইসাবা, ৮/৪০৭)

ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা খুব কম।

হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা. ৫৬ হিজরিতে মদিনার নিকটবর্তী স্থান আকিকে ইনতেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. তাকে গোসল দেন, সুগন্ধি লাগান এবং তার জানাজার নামাজ পড়ান। হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার কবরে নামেন।[৬৬৭] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

[৬৬৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সাঈদ বিন যায়েদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১২৫-১৪৫

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.

মক্কায় তাওহিদের ধ্বনি উচ্চকিত হওয়ার পর হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী সৌভাগ্যবানদের একজন ছিলেন। ওই সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র সতেরো বছর। তার পিতা আবু ওয়াক্কাসের মূল নাম হলো মালেক। তার মাতার নাম হামনা বিনতে সুফিয়ান।[৬৬৮]

হজরত সা'দ রা. কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা বলা হতো। কেননা কুরাইশের শাখা বনু যুহরার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। আর বনু যুহরা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা হজরত আমেনার বংশ। আরবরা মায়ের বংশের লোকদের মামা বলে থাকে। হজরত সা'দ রা. হজরত আমেনার চাচাতো ভাই ছিলেন। অর্থাৎ হজরত আমেনা ওয়াহাব বিন আবদে মানাফের মেয়ে ছিলেন। এই ওয়াহাবের এক ভাই হলো উহাইব, যে ছিল হজরত সা'দ রা. এর দাদা। এভাবে হজরত সা'দ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার বংশ যুহরার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দরুন সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা হতেন। এই কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে একবার গর্ব করে বলেছিলেন,

هذا خالي فليُرِني امرؤٌ خالَهُ

উনি আমার মামা। কারো এমন মামা থাকলে সে দেখাক।[৬৬৯]

তিনি শুরু থেকেই ইসলামের জন্য কোরবানি করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার মা দানাপানি দেওয়া এমনকি কথাবার্তা বলাও বন্ধ করে দেয়।

---

[৬৬৮] ইবনুল জাওযি কৃত আল-মুনতাজাম, ৫/২৮১

[৬৬৯] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৫২

তার মা বলেন, যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ না করো তা হলে আমি ক্ষুৎপিপাসায় মরে যাব। একজন অনুগত সন্তানের জন্য এটি বড় ধরনের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে অবিচল ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

> যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করার চেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না।[৬৭০]

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বাহাদুর এবং বড়মাপের যোদ্ধা ছিলেন। ইসলামের জন্য প্রথম কারো বিরুদ্ধে হাত উঠানো এবং রক্ত প্রবাহিত করার গৌরব তারই অর্জিত হয়েছে। এটা মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের একেবারে সূচনাকাল ছিল। তিনি গোপন স্থানে লুকিয়ে লুকিয়ে ইবাদত করছিলেন। তখন কিছু মুশরিক ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে যান। কোনো ধরনের ডরভয় ছাড়াই একটি হাড্ডি নিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, সেই মুশরিকটার মাথা ফেটে যায়।[৬৭১]

তার সাহসিকতা এবং সেনাপতিসুলভ যোগ্যতার কারণে হিজরতের পর প্রথমদিকের অভিযানগুলোর নেতৃত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়। এমনিই এক অভিযানে তিনি শত্রুদের উপর তির চালনা করেন। এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রতিপক্ষের উপর ছোঁড়া প্রথম তির।[৬৭২]

তিনি আরবের সর্বমান্য তিরন্দাজ ছিলেন। উহুদযুদ্ধে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার জন্য দক্ষ হাতে তির চালনা করতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করেন,

يا سَعْدُ ارْمِ فِداكَ أبِي وأُمِّي

---

[৬৭০] সুরা আনকাবুত, আয়াত ৮

[৬৭১] সহিহ মুসলিমের সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর ফজিলত অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[৬৭২] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৪০

হে সা'দ, তির নিক্ষেপ করো; আমার মাতাপিতা তোমার উপর কোরবান হোক![৬৭৩]

তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়া ছিলেন। দোয়া করার সাথে সাথেই তার দোয়া কবুল হয়ে যেত। এটা তার জন্য আল্লাহর রাসুলের দোয়ার প্রতিফল ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ রা. এর জন্য দোয়া করেছিলেন,

اللَّهمَّ استَجِبْ لَهُ إذا دعاكَ

হে আল্লাহ, আপনি সা'দ-এর দোয়া কবুল করুন যখন সে আপনাকে ডাকে।[৬৭৪]

বিদায় হজের সময় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁচার সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেন। ভীষণ পেরেশান হয়ে যান। তিনি আশঙ্কা করেন, যে শহর থেকে আল্লাহর জন্য হিজরত করে বের হয়ে গেছেন সেখানে মৃত্যু হলে না জানি হিজরতের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়!

সাথে সাথেই তিনি সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। তাকে বোঝান যে, এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করাটাই যথেষ্ট। পাশাপাশি তিনি তাকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলেন যে, তুমি আরো হায়াত পাবে। মানুষের উপকার করবে।[৬৭৫]

তখন পর্যন্ত হজরত সা'দ রা. এর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তার একটি কন্যাসন্তান ছিল। তার জন্য তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। তখন তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমার সন্তানরা যৌবনে উপনীত হওয়া পর্যন্ত বয়সকে দীর্ঘায়িত করে দিন।

এ দোয়া তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে যায়। হজরত সা'দ রা. অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি এর পরও ৪৫ বছর হায়াত লাভ করেন। তার এক

---

[৬৭৩] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৫৩
[৬৭৪] সুনানে তিরমিজি, ৩৭৫১
[৬৭৫] সহিহ বুখারি, ১২৯৫

ছেলে জন্ম লাভ করে। তিনি স্বচক্ষে তাকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেখে যান।[৬৭৬]

সাধারণত কাউকে বদদোয়া দিতেন না। কিন্তু যখনই কাউকে সাহাবিদের অপমান করতে দেখতেন তখন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তার জবান থেকে যে বদদোয়া বের হতো তা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হতো। একবার তিনি এক লোককে আলি রা. এর নিন্দা জ্ঞাপন করতে দেখলেন। নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন সে বিরত থাকেনি তখন তিনি ধ্বংসের বদদোয়া করেন। কিছুক্ষণ পর একটা উট এসে তাকে পিষে ফেলে।

একবার তিনি এক লোককে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর নিন্দা জ্ঞাপন করতে দেখলে তাদেরকে নিষেধ করেন। তারা বিরত না হলে তার মুখ থেকে বদদোয়া বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এক পাগলা উট লোকটাকে চিড়ে ফেলে।[৬৭৭]

এক ব্যক্তি গণজমায়েতে তার উপর আত্মসাৎ এবং বে-ইনসাফির অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তা হলে তুমি তাকে অন্ধ বানিয়ে দাও। তার হায়াত লম্বা করে দাও। পরবর্তীতে লোকটার ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল।[৬৭৮]

তিনি বেটে ও শক্ত-সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তার চেহারার রং ছিল বাদামি। চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার একজন ছিলেন। ছিলেন বদরি সাহাবি এবং হজরত উমর ফারুক রা. এর গঠিত ছয় সদস্যের শুরা কমিটির একজন। তিনি হজরত উমর ফারুক রা. এর শাসনকালে পারস্য সম্রাটের সাথে লড়াইকারী মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। কাদিসিয়ার ময়দানে পারসিকদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের স্বাদ চাখিয়ে সাসানি সাম্রাজ্যের ভাগ্যের ফয়সালা করে দেন। তিনি কারামতের মাধ্যমে দাজলা নদী পাড়ি দিয়ে পারস্য

---

[৬৭৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১১৭
[৬৭৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১১৬
[৬৭৮] সহিহ বুখারি, ৭৫৫

সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ইরাকে কুফা নামক একটি নতুন শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি সেই শহরে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।[৬৭৯]

তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ইসলামের জন্য কোরবানি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি ছিল অনেক। তিনি খলিফা হওয়ার যোগ্যতা রাখতেন। কিন্তু তিনি কখনো এই দায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা করেননি। হজরত উসমান রা. এর যুগে তাকে কুফার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর তিনি হজরত আলি রা. এর হাতে বাইয়াত হন। এরপর তিনি সারা জীবন রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে ছিলেন। জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন এবং শালিসের ঘটনায় তার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।

সে-সময় হুসাইন বিন খারিজা নামক একজন তাবেয়ি ছিলেন। হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর সৃষ্ট মতবিরোধের ক্ষেত্রে তিনি খুব দ্বিধা-সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করতে থাকেন দুই দলের কোন দলের সহযোগী হবেন? অবশেষে তিনি এ দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হক পথ দেখিয়ে দিন, আমি যা ভালোভাবে আঁকড়ে থাকবো। স্বপ্নে দেখেন দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে একটি দেয়াল রয়েছে। এ দেয়াল পাড়ি দিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে গেলে কিছু মানুষ দেখতে পান। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা?

তারা বলল, আমরা ফেরেশতা।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শহিদগণ কোথায়?

উত্তর দেওয়া হলো, উপরে যাও।

তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলেন। সেখানে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দেখতে

---

[৬৭৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৯৩১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১১/২৮৩

পান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ইবরাহিম আ. কে বলছেন, আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

হজরত ইবরাহিম আ. বললেন, আপনার জানা নেই তারা আপনার পরে কী করেছে? তারা রক্তপাত করেছে। নিজেদের ইমামকে হত্যা করে ফেলেছে। আমার বন্ধু সা'দ যা করেছে, তারা কেন তেমনটা করল না?

হুসাইন বিন খারিজা রহ. হজরত সা'দ রা. এর নিকট গিয়ে তাকে স্বপ্নের কথা বলেন। সা'দ রা. আনন্দিত হয়ে বলেন, যে ব্যক্তি ইবরাহিম আ. এর বন্ধু হবে না, সে ব্যর্থ।

হুসাইন বিন খারিজা জিজ্ঞেস করেন, আপনি এই দুই দলের মধ্যে কোন দলের?

তিনি বলেন, কোনো দলেরই নই।

হুসাইন বললেন, আমাকে আপনি কী পরামর্শ দেবেন?

হজরত সা'দ রা. জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের নিকট কি বকরি আছে?

তিনি বললেন, জি না, নেই।

তিনি বললেন, বকরি ক্রয় করে এই ফেতনা খতম হওয়া পর্যন্ত একাকী জীবনযাপন করতে থাকো।[৬৮০]

মুসলিমবিশ্বে তার বহু ভক্ত ছিল। কিছু সাথি-সঙ্গী বলল, আপনি যদি খেলাফতের আকাঙ্ক্ষী হন তা হলে আপনার সাহায্যে ১ লক্ষ তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যাবে।

তিনি উত্তর দেন, এই ১ লক্ষ তরবারির মধ্যে আমার শুধু এমন একটি তরবারি চাই, যা কাফেরকে কেটে ফেলবে; কিন্তু মুমিনের ক্ষেত্রে সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখাবে না।[৬৮১]

জীবনের শেষ ২০ বছর তিনি একা কাটিয়ে দেন। মদিনা থেকে সাত মাইল (সাড়ে এগারো কিলোমিটার) দূরত্বে অবস্থিত আকিক নামক স্থানে তিনি আপন বাড়িতে বসবাস করতেন। এই সময়ে কত পরিবর্তন এবং

---

[৬৮০] মুসতাদরাকে হাকিম, ৬১২৬
[৬৮১] তারিখে দিমাশক, ২০/২৮৭

বিপ্লব সাধিত হয়েছে! কিন্তু তিনি আপন অবস্থান থেকে সামান্য নড়চড় করেননি।

তার ছেলে উমর বিন সা'দ রা. একবার বলেন, লোকেরা সেখানে খেলাফত এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই করছে আর আপনি এখানে একা বসে আছেন!

তিনি বললেন, বেটা, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে পছন্দ করেন, যে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে, লোকেরা যার পরিচয় জানে না এবং সে একজন খোদাভীরু।[৬৮২]

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. একাকী জীবনযাপন করা অবস্থায় ৫৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে তিনিই সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৬৮৩] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৬৮২] সহিহ মুসলিম, ৭৬২১
উমর বিন সাদের এ কথা বলা সঠিক বলে মনে হয় না। ওই সময় হজরত আলি এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ চলছিল। নিঃসন্দেহে তাদের এই মতবিরোধ আল্লাহর জন্যই ছিল; ধনসম্পদের লোভে নয়। তবে তাদের আশপাশে কিছু ফেতনাবাজ লোক জমা হয়েছিল। হজরত উমর বিন সাদের উক্তি এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সাহাবিদের ক্ষেত্রে কখনো হতে পারে না। স্মরণ রাখতে হবে, উমর বিন সা'দ হজরত হুসাইন রা. এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তাই আসলে তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন না, যার কথা আমাদের সম্পূর্ণ বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করতে হবে। পিতার একাকী বসে থাকার উপর নিন্দা জ্ঞাপন করা তার উদ্দেশ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে হজরত সা'দ রা. অত্যন্ত বিচক্ষণমূলক উত্তর দিয়েছেন।

[৬৮৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/১১৯

কয়েকজন মহান সাহাবির আলোচনা

আশারায়ে মুবাশশারার আলোচনার পর আমরা এখন সুমহান মর্যাদার অধিকারী কিছু সাহাবির আলোচনা করব। ইসলামের জন্য মহান খেদমত আঞ্জামদাতা সাহাবিদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমরা নমুনাস্বরূপ এখানে শুধু পাঁচজন সাহাবির জীবন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আরো কিছু সাহাবির আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মক্কায় ভেড়া-বকরি চড়াতেন। অল্প বয়সে তিনি ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সান্নিধ্য দ্বারা তিনি অফুরান উপকার হাসিল করেন। ওই সময় মক্কায় সামান্য সংখ্যক লোক মুসলমান হয়েছিল। গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হতো।[৬৮৪]

তিনি বনু হুজাইল গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। তার মা উম্মে আবদ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকা হতো।

তার প্রবল ঈমানি সাহস ছিল। সাথি-সঙ্গীরা নিষেধ করা সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করার পর একদিন তিনি মসজিদুল হারামে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেন। তেলাওয়াত শুনে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা তাকে মারধর করে রক্তাক্ত করে ফেলে। তার চেহারা পর্যন্ত ফুলে যায়। তিনি ফিরে যাওয়ার পর সাথি-সঙ্গীরা তার প্রতি সমবেদনা জানায়। তারা আফসোস করতে থাকে। কিন্তু তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, এসব লোক আমার নিকট আজকের মতো এত অসম্মানী ও লাঞ্ছিত কখনো হয়নি। যদি তোমরা বলো তা হলে আগামীকাল আমি পুনরায় তাদের সামনে গিয়ে তাওহিদের ঘোষণা দেব।

সাথি-সঙ্গীরা বলল, অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাদেরকে কুরআনের আওয়াজ শোনানোটাই যথেষ্ট।[৬৮৫]

---

[৬৮৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪২৬

[৬৮৫] উসদুল গাবাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য

তিনি মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে শামিল হয়েছিলেন।[৬৮৬]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এর সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বয়সের দিক থেকে তারা সমান ছিলেন। মক্কায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত যুবাইর রা. এর সাথেই তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন।[৬৮৭]

এক মত অনুযায়ী মুয়াজ বিন জাবাল রা. এর সাথে তার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। মদিনায় হিজরত করে শুরুর দিকে তিনি মুয়াজ রা. এর ঘরেই ছিলেন।[৬৮৮] হিজরতের পর এক মত অনুযায়ী হজরত সা'দ বিন মুয়াজ, অপর মত অনুযায়ী হজরত আনাস বিন মালিক রা. এর সাথে তার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।[৬৮৯]

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. শারীরিকভাবে বেটে, হ্যাংলা-পাতলা ও দুর্বল ছিলেন। কিন্তু তিনি মেধা ও জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত ছিলেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তিনি কোনো গাছে উঠলে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তার চিকন পায়ের গোছা দেখে হেসে ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে নিয়ে কেন হাসছো, যার ওজন মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি!'[৬৯০]

শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বাহাদুর এবং সাহসী ছিলেন। বদরযুদ্ধসহ অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের সবচেয়ে

---

[৬৮৬] তাবাকাতুল কুবরা, ৩/১৫১

[৬৮৭] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫৩৭২

[৬৮৮] তাবাকাতুল কুবরা, ৩/১৫১, ১৫২

[৬৮৯] আল ইসাবা, ৪/২০০

বর্ণনাগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, হিজরতের পূর্বে হজরত যুবাইর রা. এর সাথে, হিজরতের পর-পর হজরত মুয়াজ রা. এর সাথে, এরপর মদিনায় বসবাসের পর হজরত সা'দ রা. এর সাথে তার ভ্রাতৃত্ব হয়। বনু কুরাইজার যুদ্ধে সা'দ বিন মুয়াজ রা. এর শাহাদাত বরণের পর আনাস বিন মালিক রা. এর সাথে তার ভ্রাতৃত্ব হয়। কেননা হিজরতের সময় আনাস ছোট ছিলেন। আর ছোট বালকের সাথে যুবকদের ভ্রাতৃত্ববোধ সাধারণত কম হয়ে থাকে।

[৬৯০] মুসনাদে আহমদ, ৯২০

বড় দুশমন আবু জাহেলকে বদরযুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। কিছু আনসারি বালক আবু জাহেলকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেলেছিল। তখন মাটিতে পড়ে সে কাতরাতে থাকে। তারা আবু জাহেলকে এই অবস্থাতেই ফেলে রেখে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আবু জাহেলের তালাশে বের হন। প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখে তিনি তার দাড়ি ধরে বলেন, তুমি কি সেই গোমরাহ বুড়া আবু জাহেল?[৬৯১]

এরপর তিনি আবু জাহেলের মাথা কেটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করেন।[৬৯২]

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পিছপা হয়ে যাচ্ছিল, তখন যেসকল সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে থেকে লড়াই করেছিলেন, তিনিও তাদের মধ্যে শামিল ছিলেন।[৬৯৩]

খোলাফায়ে রাশেদিনের পর তিনি কুরআন এবং তার তাফসিরের ক্ষেত্রে সে যুগের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন, কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। যদি আমি জানতে পারি কারো নিকট কুরআনের অতিরিক্ত জ্ঞান রয়েছে আর উটে চড়ে সেখানে পৌঁছা সম্ভব তা হলে আমি অবশ্যই সেখানে চলে যাই।[৬৯৪]

একবার তিনি বলেন, এখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে কেউ আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখে না। তবে আমি সবার চেয়ে উত্তম নই।[৬৯৫]

এটা তার ব্যক্তিগত মত ছিল না; বরং আবু মাসউদ বদরির মতো প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিও এই সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, রাসুল

---

[৬৯১] মুসনাদে আহমদ, ১৩৪৭৭

[৬৯২] দালায়িলুন নুবুওয়াত, ৩/৮৬

[৬৯৩] উসদুল গাবাহ, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর জীবনী দ্রষ্টব্য।

[৬৯৪] সহিহ মুসলিম, ৬৪৮৬

[৬৯৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৭৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কুরআন মাজিদ সম্পর্কে তার চেয়ে বড় আলেম দ্বিতীয়জন নেই।[৬৯৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন, কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, যদি কেউ সেভাবে পড়তে চায় তা হলে সে যেন ইবনে উম্মে আবদের (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) মতো পড়ে।[৬৯৭]

তার জ্ঞানগত যোগ্যতা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বালক।[৬৯৮]

আর এমনই হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি সরাসরি সত্তরের অধিক সুরা শিখেছিলেন। এটি তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনি।[৬৯৯]

তার জ্ঞান শুধু কুরআন মাজিদের শব্দমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ নিজেই বলেন, আমরা দশটি করে আয়াত শিখতাম। এরপর এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা ব্যতীত সামনের দশ আয়াত পড়তাম না।[৭০০]

তার তেলাওয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতই পছন্দ ছিল যে, তিনি নিজেই আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে বলেন, আমাকে আল্লাহর কালাম শোনাও। তিনি বললেন, আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আমি আপনাকে কীভাবে তা শোনাবো!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারো কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনতে মন চাচ্ছে।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তেলাওয়াত শুরু করেন। পড়তে পড়তে তিনি এ আয়াতে পৌঁছেন,

---

[৬৯৬] সহিহ মুসলিম, ৬৪৮৪
[৬৯৭] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৩৮
[৬৯৮] মুসনাদে আহমদ, ৩৫৯৮
[৬৯৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৭৩
[৭০০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯০

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

আর তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে সাক্ষীদের উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করব![৭০১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে থামিয়ে দেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তাকিয়ে দেখেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[৭০২]

তার কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর ছিল। আগ্রহের সাথে চমৎকার কণ্ঠে অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করতে পারতেন। রাতের বেলা মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নফল নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। দুনিয়ার সবকিছু থেকে তিনি বেখবর হয়ে সামান্য আওয়াজে তেলাওয়াত করতেন। মনে হতো যেন মৌমাছি ভনভন করছে।[৭০৩]

তিনি সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই থাকতেন। সারাজীবন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাটিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘরে তার যেকোনো সময় আসা-যাওয়ার অনুমতি ছিল। একারণে মদিনায় আগন্তুক অতিথিরা শুরুতে তাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোক মনে করতেন।[৭০৪]

সাধারণত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হলে তিনি সকল খেদমত আঞ্জাম দিতেন। বিছানা বিছিয়ে দেওয়া, মেসওয়াক, পবিত্রতা এবং অজুর পানির ব্যবস্থা করা, জুতা এগিয়ে দেওয়া প্রভৃতি খেদমত তিনি আঞ্জাম দিতেন।[৭০৫]

---

[৭০১] সুরা নিসা, আয়াত ৪১
[৭০২] সহিহ বুখারি, ৫০৫৫
[৭০৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯৪
[৭০৪] সহিহ মুসলিম, ৬৪৮০
[৭০৫] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৫৩

ইসলামধর্মের এক বিশাল অংশ, বিশেষ করে মাসআলা-মাসায়েলের এক বিরাট ভাণ্ডার মুসলিম উম্মাহ্ তার থেকে গ্রহণ করেছে। ফিকহে হানাফির দলিলের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিনের পর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর বর্ণনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে তিনি মদিনাতেই ছিলেন। তখন দিকে দিকে মানুষ মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মদিনায় বিপদের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই সময় মুরতাদ এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিভিন্ন সময় তাকে মদিনা সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[৭০৬]

উমর ফারুক রা. এর যুগে শামের বিজয়সমূহ তার জিহাদের স্পৃহাকে প্রজ্বলিত করে তোলে। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শরিক হয়েছিলেন।

হিজাজের লোকেরা তার ইলমের মজলিস থেকে উপকৃত হতে থাকে, যাদের মধ্যে হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবের বিন আবদুল্লাহ, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো নওজোয়ান সাহাবায়ে কেরাম শামিল ছিলেন। পরবর্তীতে তারা শরিয়তের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন। আবু হুরাইরা ও আবু মুসা আশআরি রা. এর মতো বড় বড় সাহাবিও তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। কেননা তারা খাইবার বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. তাদের তুলনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়েছিলেন।[৭০৭]

তার উপর হজরত উমর রা. এর অত্যন্ত আস্থা ছিল। তিনি বেঁটে হওয়ায় কেউ কেউ তাকে নিয়ে মশকরা করলে হজরত উমর বলতেন, সে তো ইলমভর্তি ছোট্ট গুদাম।[৭০৮] হজরত উমর রা. স্বভাবগতভাবে গম্ভীর

---

[৭০৬] তারিখে খলিফা, ১১ হিজরি।

[৭০৭] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৬১

[৭০৮] ইমাম আবু ইউসুফ কৃত কিতাবুল আসার ১৩৩; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৫৬

ছিলেন। কিন্তু যখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর সাথে তিনি কথা বলতেন, তার চেহারায় হাসিভাব ফুটে উঠত। তিনি মুচকি হাসতেন।[৭০৯]

যেহেতু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর পায়ের গোছা অস্বাভাবিক চিকন ছিল, যাতে দেখতে কারো নিকট খারাপ মনে না হয় এজন্য তিনি টাখনুর খুব বেশি উপরে লুঙ্গি বাঁধতেন না। একদিন তিনি কাউকে নিজের মতো লুঙ্গি পরতে দেখে তাকে লুঙ্গি উপরে বাঁধতে বলেন। লোকটি তখন বলে, নিজেকে সংশোধন করুন, আপনার লুঙ্গি উপরে বাধা উচিত।

তিনি বলেন, আমার পায়ের গোছা খুব সরু। ইমামতি করতে হয় এজন্য এটা নিচু করে বাঁধি।

হজরত উমর রা. এই লোকের আপত্তির কথা জানতে পেরে দোররা নিয়ে তাকে বলেন, তুমি ইবনে মাসউদের সাথে টক্কর দিচ্ছ![৭১০]

তার জ্ঞানগত উঁচু স্থান, দূরদর্শিতা এবং চিন্তার গভীরতার কারণে উমর ফারুক রা. তাকে নিজের কাছেই মদিনায় রাখতে চাইতেন। কিন্তু ইরাকের নবনির্মিত কুফা নগরীর আর্থিক বিষয় দেখাশোনা এবং লোকদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক ও ফকিহর প্রয়োজন দেখা দিলে হজরত উমর ফারুক রা. কুফাবাসীর নামে নিম্নোক্ত পয়গাম লিখে তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেন, 'আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে তোমাদের শিক্ষক এবং গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আমার উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।'[৭১১]

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ১৪ বছর কুফাতে কাটান। এটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ পরিচালনার কেন্দ্র ছিল। সমস্ত অফিসার, সৈনিক, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন দায়িত্বপালনকারী লোকেদের সকল হিসাবনিকাশ তার জিম্মায় ছিল। গণিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো

---

[৭০৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৫৬

[৭১০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯২

[৭১১] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৩

ক্লাসে অংশগ্রহণ ব্যতীত কুরআন মাজিদের একজন কারি ও ফকিহ্ এত বিশাল বড় দায়িত্ব এত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, চৌদ্দ বছরে একটি পয়সাও হেরফেরের আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। এটাকে কুদরতের কারিশমাই বলা যায়। কুফা নগরীতে তিনি কুরআন মাজিদের তাফসির এবং ইসলামি বিধান প্রচার-প্রসারের মহান খেদমত আঞ্জাম দেন। কুফার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তিনি ভালোভাবেই তা আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন। বড় বড় বিচক্ষণ তাবেয়িগণ তার থেকে ইলম অর্জন করেন, যাদের মধ্যে হজরত আলকামা বিন কায়েস, মাসরুক, আসওয়াদ, উবাইদা সালমানি, কায়েস বিন আবু হাযেম, জার বিন হুবাইস, তারেক বিন শিহাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা পরবর্তীতে কুফায় ইলমে তাফসির এবং ইলমে ফিকহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন।[৭১২]

২৪ হিজরিতে হজরত উমর রা. এর মৃত্যুর পর হজরত উসমান রা. খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এর মধ্যে কুফানগরীর বিভিন্ন দায়িত্বে রদবদল ঘটে। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. কে তার দায়িত্বে বহাল রাখা হয়।

৩২ হিজরিতে হজরত উসমান গনি রা. তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি তাকে মদিনায় ডেকে আনেন। অব্যাহতি প্রদানের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে অধিকাংশ বর্ণনায় হজরত উসমান-সহ কিছু সাহাবির প্রতি তার অসন্তোষের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এসব বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অব্যাহতি ও অপসারণ এক সাধারণ বিষয়। কেবল অসন্তুষ্টির কারণেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। উপরন্তু ওই সময় তিনি ষাট বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। তাকে আরাম-আয়েশের সুযোগ করে দেওয়াটাও অব্যাহতি প্রদানের এক যৌক্তিক কারণ।

---

[৭১২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৬১, ৪৬২

এটা তো অবশ্যই সঠিক বিষয় যে, কুফায় তার বহু ভক্ত-অনুরাগী ছিল, যারা তার এই অব্যাহতিপ্রদানের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা তাকে মদিনায় না যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. উসমান রা. এর নির্দেশ অমান্য করে মতানৈক্যের কারণ হতে চাচ্ছিলেন না। এজন্য তিনি বলেন, আনুগত্য করা আমাদের দায়িত্ব। আমি কোনো ফেতনার দরজা খুলতে পছন্দ করি না।[৭১৩]

তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে হিজাজের দিকে রওনা হয়ে যান। রাস্তায় রাবযা নামক স্থানে হজরত আবু জর গিফারি রা. এর জানাজার নামাজে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। উমরা করার পর তিনি মদিনায় অবস্থান করেন। এর কয়েক মাস পরই তার মৃত্যু হয়ে যায়।[৭১৪]

প্রসিদ্ধ আছে যে, হজরত উসমান রা. দুই বছর পর্যন্ত হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর ভাতা বন্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাটি দুর্বল। অন্যান্য বর্ণনার সাথে এটি সাংঘর্ষিক। হাফেজ জাহাবি প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদসহ কয়েকজন সাহাবি উমর ফারুক রা. এর যুগে জীবিকানির্বাহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত এবং নির্ভার ছিলেন। এজন্য হজরত উসমান রা. এর খেলাফতকালে তারা স্বেচ্ছায় সরকারি ভাতাগ্রহণ বন্ধ রেখেছিলেন। তাই তাদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।[৭১৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর বিন আওয়াম রা. এর সঙ্গে আবদুলল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর ভ্রাতৃত্বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। দুধভাইয়ের চেয়েও তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ছিল। এমনকি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. মৃত্যুর সময় অসিয়তসহ সকল আর্থিক জিম্মাদারি এবং আপন পরিবার-পরিজনের দেখাশোনার জন্য তাকে নির্ধারণ করে যান। তার মৃত্যুর পর যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. হজরত উসমান রা. কে পরামর্শ দেন যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নিজের

---

[৭১৩] আল ইসাবা, ৪/২০১

[৭১৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯৮, ২/৭৭

[৭১৫] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯৮

পক্ষ থেকে যে ভাতাগ্রহণ বন্ধ রেখেছিলেন, সেটা একত্র করে যেন তার স্ত্রী-সন্তানদের দিয়ে দেওয়া হয়। হজরত উসমান রা. তার সকল ভাতা একত্র করে উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করেন, যার পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার দিরহাম (বর্তমান হিসাবে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ রুপি)।[৭১৬]

হজরত আলি রা. যখন কুফাকে রাজধানী বানান তখন সেখানে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ একত্র হন। আলি রা. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা ওস্তাদের গুণাবলি উল্লেখ করেন। হজরত আলি রা. বলেন, তিনি এরকমই ছিলেন; বরং এর চেয়েও উত্তম ছিলেন। তিনি কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতেন। কুরআনে নির্দেশিত হালাল-হারাম জানতেন। ইসলামধর্মের একজন ফকিহ এবং সুন্নাহর আলেম ছিলেন।[৭১৭] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৭১৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৪৯৮

[৭১৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩/১৫৬

হজরত উসমান বিন মাযউন রা.

তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য পাহাড়সম বিপদ-মুসিবত সহ্য করেছেন। তার উপনাম আবু সায়েব। মায়ের নাম সাখিলা বিনতে আমবাস। যখন মাত্র তেরো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, সেসময় তিনি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্পর্কে হজরত উমর ফারুক রা. তার ভগ্নীপতি। অর্থাৎ তিনি হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা. এর মামা। জাহেলিযুগেও তিনি মদপান থেকে দূরে থাকতেন। তিনি বলতেন, 'এমন কাজ কেন করব, যার দ্বারা বিবেকবুদ্ধি হ্রাস পায়, নির্বোধ লোকেরা আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে!'[৭১৮]

ইবাদত-বন্দেগি এবং দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি দুনিয়া পরিত্যাগ এবং যৌবনশক্তি রহিত করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি।[৭১৯] বরং তিনি তাকে বেশি বেশি রোজা রাখার পরামর্শ দেন।[৭২০]

হজরত উসমান বিন মাযউন মক্কাবাসীদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেন। এক সময় তিনি জানতে পারেন মক্কার কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী এসে পৌছলে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত হন। জানতে পারেন এখনো তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। পুনরায় হাবশায় সফর করা মুশকিল ছিল। এজন্য প্রসিদ্ধ মুশরিক সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরা থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করে নেন। এভাবে তিনি কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

---

[৭১৮] উসদুল গাবাহ, ৩/৫৮৯

[৭১৯] সহিহ বুখারি, ৫০৭৩

[৭২০] আবদুল্লাহ বিন মুবারক কৃত আয যুহদ ওয়ার রিকাক, হাদিস ১১০৬

এইদিকে মুসলমানদের উপর কঠোর নির্যাতন চলছিল। তিনি দিবারাত্রি শান্তিতে থাকবেন আর অন্যান্য মুসলমান নির্যাতন সহ্য করে যাবে– তিনি এটা বরদাশত করতে পারেননি। তাই তিনি বলেন, 'আমার বন্ধুরা কষ্ট-মুসিবতের মধ্যে জীবনযাপন করবে আর আমি এক কাফেরের নিরাপত্তায় আনন্দের সাথে জীবন কাটিয়ে দেব! আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমার মধ্যে কোনো সমস্যা রয়েছে।' এই বলে তিনি ওয়ালিদের নিকট গিয়ে তার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন। কিছুদিন পর আরবের প্রসিদ্ধ কবি লাবিদ বিন রাবিয়া (সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি) মক্কাবাসীদের এক সমাবেশে কবিতা আবৃত্তি করে বলে,

الاكل شيء ما خلا الله باطل

জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল।

উসমান বিন মাযউন রা. তখন বলেন, সত্য বলেছ।

লাবিদ এর পর পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় অংশ বলল,

وكل نعيم لامحالة زائل

এবং অবশ্যই সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল।

হজরত উসমান রা. তখন উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠেন, ভুল, জান্নাতের নেয়ামত কখনো ধ্বংস হবে না।

এটা শুনে লাবিদ উপস্থিত লোকদের বলে, আল্লাহর শপথ, আপনাদের মাহফিলে তো আগে এই ধরনের কথাবার্তা হতো না। কবে থেকে এই পরিবর্তন শুরু এলো?

এক ব্যক্তি তখন বলল, এটা এক বোকার কাজ। তার সাথে এ ধরনের আরও কিছু লোক রয়েছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

লাবিদ দ্বিতীয়বার পূর্বের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে। হজরত উসমান বিন মাযউন রা. পুনরায় তার উত্তর দেন। এবার বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে যায়। পূর্বের ব্যক্তিটি উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে আসে। হজরত উসমান রা. এর

চেহারায় সে প্রচণ্ড শক্তিতে চড় মারে। যার ফলে তার চোখ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। তার চেহারায় থাপ্পড়ের চিহ্ন বসে যায়।

এক ব্যক্তি বলল, তুমি তো ওয়ালিদের আশ্রয়ে ছিলে, তখন তোমার চোখ নিরাপদ ছিল। এখন ভুল করে তার নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে গেছ!

হজরত উসমান রা. তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, আমি তো দীনে ইসলামের জন্য অপর চোখ কোরবানি করে দিতেও প্রস্তুত আছি। আল্লাহর আশ্রয় আমার জন্য অধিক শক্তিশালী।[৭২১]

হজরত উসমান রা. হাবশায় হিজরতের পর মদিনায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। এরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় হিজরিতে তার মৃত্যু হয়ে যায়। মুহাজিরদের মধ্যে ইনতেকাল-করা প্রথম ব্যক্তি তিনি। জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃতদেহে তিনবার চুমু খান। তখন তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।[৭২২]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উসমান, তুমি দুনিয়া থেকে চলে গেলে। দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই তুমি সম্পর্ক করোনি।[৭২৩]

হজরত উসমান রা. এর মৃত্যুতে তার স্ত্রী নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন,

يا عين جودي بدمع غير ممنون* على رزية عثمان بن مظعون

على امرئ بات في رضوان خالقه * طوبى له من فقيد الشخص مدفون

হে চক্ষু, তুমি উসমান বিন মাযউনের মৃত্যুতে ক্রমাগত ক্রন্দন করতে থাকো। এমন ব্যক্তির উপর তুমি ক্রন্দন করো, যে আপন

---

[৭২১] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১০৩; উসদুল গাবাহ, ৩/৫৮৯

[৭২২] সুনানে তিরমিজি, মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন অধ্যায়; আল ইসতিয়াব, ৩/১০৫৪

[৭২৩] উসদুল গাবাহ, ৩/৫৮৯

রবের সন্তুষ্টির জন্য রাত্রিযাপন করত। সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য,
যার দেহ মোবারক কবরের নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরটি চিহ্নিত করার জন্য সেখানে একটি পাথর রেখে দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সেখানে যেতেন। এক মহিলা সাহাবি স্বপ্নে দেখেন উসমান বিন মাযউন রা. এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত হচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললে তিনি বলেন, এটা তার আমলের ফল। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা.

হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা. এর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। ইসলামগ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন মক্কার শান-শওকতে প্রতিপালিত এক নওজোয়ান। খুব উন্নত পোশাক পরিধান করতেন।[৭২৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দারুল আরকামকে ইসলাম প্রচারকেন্দ্র বানাচ্ছিলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। সে-সময় গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হতো। যারা ইসলাম গ্রহণ করত তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করা হতো। পরিবারের লোকেরা তার ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পেরে তাকে বন্দি করে রাখে। মুসলমানরা হাবশায় হিজরত শুরু করলে তিনি পালিয়ে হিজরত করতে সক্ষম হন।[৭২৫]

কিছুকাল পর তিনি ফিরে আসেন। তখন মদিনায় ইসলাম প্রসার লাভ করছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আনসারদের শিক্ষাদান এবং নামাজের ইমামতির জন্য সেখানে পাঠিয়ে দেন। তার প্রচেষ্টায় সেখানে ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে থাকে। তিনি সর্বপ্রথম মদিনায় হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মক্কার এ শাহজাদা সেখানে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মাঝে জীবনযাপন করেন।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসছিলেন। হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা. তখন উপস্থিত হন। তার দেহে একটি ছোট্ট চাদর ছিল। তাও ছিল চামড়ার তালিযুক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[৭২৪] আল ইসাবা, ৬/৯৮

[৭২৫] আল ইসতিয়াব, ৪/১৪৭৪

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিগত জীবনের অবস্থা স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।[৭২৬]

হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা. বদরযুদ্ধে সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার হাতেই এই যুদ্ধের পতাকা ছিল। এ যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। এতেই একসময় তিনি শহিদ হয়ে যান। তার গঠনাকৃতি ছিল অনেকটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ। তাই তার শহিদ হওয়ার কারণে ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদ হয়ে গেছেন।

মৃত্যুর সময় মাত্র একটি চাদর তার মালিকানাধীন ছিল। যখন সেই চাদর দ্বারা পা আবৃত করা হতো তখন মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। আর যখন মাথা আবৃত করা হতো তখন পা অনাবৃত হয়ে যেতো। অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করে দাও আর পায়ে ইযখির (ঘাস) রেখে দাও।[৭২৭] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৭২৬] উসদুল গাবাহ, ৫/১৭৫
[৭২৭] আল ইসাবা, ৬/৯৮

হজরত সা'দ বিন মুয়াজ

হজরত সা'দ বিন মুয়াজ রা. আনসার গোত্র আওসের শাখা আবদুল আশহালের সরদার ছিলেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং প্রতিভার কারণে জাহেলিযুগ থেকেই মক্কার কুরাইশ এবং ইহুদিদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। আনসারি সাহাবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত নিকটবর্তী। তার মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধের তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শারীরিকভাবে লম্বা-চওড়া এবং শক্তিশালী ছিলেন। বাগ্মিতা ও অলংকারপূর্ণ বক্তৃতাপ্রদানে তার খুব খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল। মদিনায় ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তার অসাধারণ অবদান রয়েছে। তিনি হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা. এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর গোত্রের লোকদের বলে দেন,

كلام رجالكم و نساءكم علي حرام حتى تسلموا

> ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষদের সাথে আমার কথাবার্তা বলা হারাম।

তার এ কথা শুনে গোত্রের প্রায় সকলেই ঐদিন ইসলাম গ্রহণ করে।[৭২৮]

ইসলামগ্রহণের পর তিনি মাত্র ছয় বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার কীর্তি এবং উত্তম কার্যাবলির কথা হাদিস এবং ইতিহাসের কিতাবাদিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি আনসারদের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। বদরযুদ্ধের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কর্মপন্থার ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন তখন তিনি আনসারদের

---

[৭২৮] আল ইসাবা, ৩/৭১

সরদার হিসেবে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এক ভাষণ প্রদান করেন। ইতিহাসের পাতায় তা চির ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি বলেন,

> لَئِنْ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرْكَ الْغِمَادِ مِنْ ذِي يَمَنٍ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى من بني إسرائيل : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون... فصِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَسَالِمْ مَنْ شِئْتَ وَعَادِ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ
>
> যদি আপনি বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যান তা হলে আমরা আপনার সাথে যাব। আমরা বনি ইসরাইলের মতো নই, যারা তাদের নবী মুসাকে বলেছিল, আপনি এবং আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলি, আপনি এবং আপনার প্রতিপালক লড়াই করুন। আমরাও আপনার সাথে আছি। আপনি যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক করুন, যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন। যার সাথে ইচ্ছা সন্ধি করুন, যার সাথে ইচ্ছা যুদ্ধ করুন। যত খুশি তত আমাদের সম্পদ গ্রহণ করুন।[৭২৯]

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর উপর অপবাদ আরোপকারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন সর্বপ্রথম হজরত সা'দ বিন মুয়াজ দাঁড়িয়ে যান। তিনি আত্মমর্যাদামূলক কথা বলেন। তিনি বলেন, আমার মত হলো, আপনি এই লোকগুলির গর্দান কেটে ফেলুন। তারা যদি আওস গোত্রের হয়ে থাকে, তা হলে আমরাই তার গর্দান কেটে ফেলবো। আর যদি তারা আমাদের খাযরাজি ভাই হয় তা হলে আপনি যে নির্দেশ দেবেন আমরা সেটা পালন করব।[৭৩০]

খন্দকযুদ্ধে তার ঘাড়ে একটি তির বিদ্ধ হয়। যার ফলে তার শাহরগ কেটে যায় এবং এতেই একসময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭৩১]

---

[৭২৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ৩৬৬৬০; সহিহ মুসলিম, ৪৭২১

[৭৩০] মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৪৯৩১; সহিহ বুখারি, ২৬৬১

[৭৩১] আল ইসতিয়াব, ২/৬০৩

তির বিদ্ধ হওয়ার পর অঝোরধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রক্ত আর থামছিল না। তখন হজরত সা'দ রা. দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, বনু কুরাইযার পরিণতি দেখে চক্ষু ঠান্ডা করা পর্যন্ত আপনি আমার রুহ অবশিষ্ট রাখুন।'

তার দোয়া কবুল হয়। রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। সা'দ বিন মুয়াজ রা. এর প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারুণ মহব্বত ছিল। সা'দ রা. এর রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তিনি নিজেই তাকে কোলে করে নিয়ে যান। যাতে সা'দ রা. এর খোঁজখবর নেওয়া যায় এবং তার দেখাশোনা করা যায়, এজন্য তিনি তাকে মসজিদের নিকটস্থ একটি তাঁবুতে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন।[৭৩২]

বনু কুরাইযার ইহুদিরা খন্দকযুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করেছিল। এর শাস্তি দেওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন। জাহেলিযুগে হজরত সা'দ বিন মুয়াজ রা. এর সঙ্গে তাদের পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। তাই তারা তাকে বিচারক নির্ধারণ করে। হজরত সা'দ রা. আহত শরীর নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তাদের পুরুষদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। নারী এবং শিশুদের বন্দি করা হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা যে সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছেন, তুমি সে সিদ্ধান্তই দিয়েছ।[৭৩৩]

এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর পুনরায় তার রক্তপ্রবাহ শুরু হয়ে যায়। তিনি মদিনায় পৌঁছেন। খন্দকযুদ্ধের এক মাস পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাদের জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য আকাশ থেকে ৭০ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছে, যারা ইতিপূর্বে কখনো জমিনে অবতরণ করেনি।

হজরত সা'দ রা. দীর্ঘদেহী ছিলেন। তার শরীর বেশ ভারী ছিল। কিন্তু তার মৃতদেহ অত্যন্ত হালকা মনে হচ্ছিল। লোকেরা তাই হতবাক হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতারা তার

---

[৭৩২] উসদুল গাবাহ, ২/৪৬১

[৭৩৩] সহিহ বুখারি, ৩৮০৪

জানাজা বহন করেছে। তার মৃত্যুর পর জিবরাইল আ. আরজ করেন, তিনি কোন ব্যক্তি, যার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আরশ কেঁপে উঠেছে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় তার এই প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবির কথা স্মরণ করতেন। একবার তার নিকট রেশমের মোলায়েম কাপড় এল। সাহাবায়ে কেরাম সে কাপড় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এ কাপড় দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? সা'দ বিন মুয়াজের একেকটি জান্নাতি রুমালও এর চেয়ে উৎকৃষ্ট, কোমল ও মোলায়েম।[৭৩৪] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৭৩৪] সহিহ মুসলিম, ৬৫০২

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মহান সেনাপতি গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি আল্লাহ তায়ালার একটি নিদর্শন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মুজিযা ছিলেন। তিনি মানব-সভ্যতার ইতিহাসের একমাত্র সেনাপতি, যিনি অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন; কিন্তু কখনো পরাজিত হননি। তিনি কুরাইশ গোত্রের শাখা বনু মাখযুমের সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরার সন্তান ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা. এর ভাতিজা ছিলেন। অষ্টম হিজরিতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ওই সময় তার বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৪৫ বছর।

ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পর শামের মুতা নামক স্থানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে মুসলমানদের তিনজন সেনাপতি শহিদ হওয়ার পর তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি মুসলমানদের চেয়ে শতগুণ বড় রোমান বাহিনীর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন। তার হাতেই একের পর এক নয়টি তরবারি ভেঙ্গে যায়।[৭৩৫]

অবশেষে তিনি বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে মুজাহিদ বাহিনীকে রক্ষা করে পিছনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই কীর্তির কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেন।[৭৩৬]

হজরত খালিদ সাইফুল্লাহ রা. মক্কাবিজয়, তায়েফ, হুনাইন ও তাবুকের যুদ্ধে আপন নেতৃত্ব-গুণের যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[৭৩৫] সহিহ বুখারি, ৪২৬৫

[৭৩৬] সুনানে তিরমিজি, ৩৮৪৬; আল ইসাবা, ২/২১২

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর শাসনামলে তিনি মুরতাদ এবং নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দমন করেন। ইরাক-বিজয়ের সূচনালগ্নে তার অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল। তার বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলতেন, কোনো নারী খালিদের মতো সন্তান জন্ম দিতে পারে না।[৭৩৭]

হজরত উমর রা. এর যুগের শাম বিজয়ে তিনি প্রতিপক্ষের উপর আপন যুদ্ধ কুশলতার প্রমাণ রাখেন। তার কুশলতা দেখে তৎকালীন বিশ্ব তাকে অপরাজেয় মনে করতে থাকে। তিনি আপন টুপিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল সংরক্ষণ করেছিলেন। এই চুলের বরকতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি এই টুপি পড়ে যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তার প্রত্যেকটিতেই আমি বিজয় অর্জন করেছি।[৭৩৮]

তিনি ভালো বক্তা ছিলেন। অলংকারপূর্ণ ভাষায় ভাষণ প্রদান করতেন। রণক্ষেত্রে তার বক্তৃতা-ভাষণ মুজাহিদদের মধ্যে নব চেতনা তৈরি করে দিত। তার হুংকারে শত্রুপক্ষ কেঁপে উঠত। পারসিকদের মুখোমুখি হলে তিনি পয়গাম পাঠান যে, আমার সাথে এমন সম্প্রদায় রয়েছে, তোমরা মদকে যেমন পছন্দ করো, তারা মৃত্যুকে তেমন পছন্দ করে।[৭৩৯]

তার রগ-রেশায় জিহাদের চেতনা এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বর্ম পরিধান করতে করতে তার জামা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় কোমরের সাথে তরবারি বাঁধা থাকত। শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জন্য কখনো রক্তমিশ্রিত তির নিজের পাগড়িতে বেঁধে নিতেন।[৭৪০]

তিনি বলতেন, কোনো নব দুলহানের সাথে রাত্রি যাপন করার চেয়ে পুরো রাত মুজাহিদদের সাথে বরফের পাহাড়ে সফর করে সকালবেলা শত্রুর উপর আক্রমণ করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।[৭৪১]

---

[৭৩৭] যিরিকলি কৃত আল আলাম, ২/৩০০
[৭৩৮] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫২৯৯
[৭৩৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৭৪
[৭৪০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৭৮
[৭৪১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস ১৫৮৮৫

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করাটা তার নিকট অতি সাধারণ বিষয় ছিল। শাহাদাত তার সবচেয়ে বড় তামান্না ছিল। এই তামান্না পূরণের জন্য তিনি সারা জীবন যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটেননি। তিনি বলেন, আমি সবসময় মনে করতাম আল্লাহ্ আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন কিংবা বিজয়দান করবেন। এই ভেবে আমি কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতাম না।[৭৪২]

আল্লাহর উপর তিনি অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। একবার তার নিকট বিষ নিয়ে আসা হয়। তিনি বিসমিল্লাহ বলে নির্ভয়ে সেটা পান করে ফেলেন। এতে তার শরীরের একটি পশমও উপরে যায়নি। তার দোয়া কবুল হতো। এক লোক তার নিকট মদের মশক নিয়ে এলো। তিনি তখন মধু খেতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, হে আল্লাহ, একে মধু বানিয়ে দিন! মুহূর্তেই সেই মদ মধু হয়ে যায়।[৭৪৩]

গোটা জীবন তিনি জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দিয়েছেন। এটাই তার আত্মার খোরাক ছিল। তিনি এটাকে পরকালের নাজাতের পুঁজি মনে করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়ার পর আমার নিকট এর চেয়ে কোনো উত্তম এবং আল্লাহর নিকট আশাবাদী আমল নেই যে, একবার সারারাত বৃষ্টি হচ্ছিল আর আমি মাথায় ঢালকে আশ্রয় বানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শত্রুর উপর আক্রমণের জন্য আমরা প্রভাত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম।[৭৪৪]

ইলমের প্রতি তার অগাধ অনুরাগ ছিল। তার থেকে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুযোগ লাভ করেননি বিধায় অত্যন্ত আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, যুদ্ধ আমার জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭৪৫]

হজরত উমর রা. আশঙ্কা করলেন, আল্লাহর পরিবর্তে মুসলমানরা খালিদ সাইফুল্লাহ রা. এর উপর ভরসা করে বসতে পারে। এজন্য তিনি তাকে

---

[৭৪২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৭৫
[৭৪৩] আল ইসাবা, ২/২১৮
[৭৪৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৮১
[৭৪৫] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস ১৫৮৮৬

সেনাপতি পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রণক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন করে গেছেন।[৭৪৬]

হজরত উমর রা. তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন। তাই কিছুকাল পর তাকে আলজাজিরার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এক বছর পর এটা থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিয়ে তিনি চলে আসেন। ২২ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শামের হিমস শহরে তার কবর বিদ্যমান রয়েছে।[৭৪৭]

মৃত্যুর সময় বিশ্বজয়ী এ বীর সাহসী সেনাপতির চোখ অশ্রুসজল ছিল। তিনি বলছিলেন, যেখানে মৃত্যু থাকা সম্ভব আমি সেখানেই মৃত্যু অনুসন্ধান করেছি। আমি এই পরিমাণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি যে, আমার শরীরের এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে তরবারি অথবা বর্শার আঘাত লাগেনি। কিন্তু আফসোস তা সত্ত্বেও আমি আজ বিছানায় মারা যাচ্ছি।[৭৪৮]

তিনি সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। হাতে যা আসত তিনি সেটা মন খুলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে আপন অস্ত্র ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়ার অসিয়ত করে যান।[৭৪৯]

তার মৃত্যুতে গোটা মুসলিমবিশ্ব অত্যন্ত মর্মাহত হয়। শুধু পুরুষরাই নয়; বরং নারী এবং বাঁদিরা পর্যন্ত অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মদিনার এক বাঁদি নিজের অজান্তেই নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিল,

أنت خير من ألف ألف من* القوم إذا ما كبت وجوه الرجالِ

---

[৭৪৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১৩৫

[৭৪৭] মুসতাদরাকে হাকিম, ৫২৮৬

এক বর্ণনা অনুযায়ী ২১ হিজরিতে মদিনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন (মুসতাদরাকে হাকিম, ৫২৮৭)

তবে জাহাবি রহ. বলেছেন, তিনি হিমসে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেখানেই তাকে দাফন দেওয়া হয়েছে। আমরা তার এই বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৮৪)

[৭৪৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৭৯

[৭৪৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৮১

> হে খালিদ, যখন বীরপুরুষদের চেহারার রং পালটে যায় তখন
> তুমি একাই ১০ লক্ষের চেয়ে অধিক কার্যকর প্রমাণিত হতে।

হজরত উমর ফারুক রা. এই পঙ্ক্তি শুনে বলেন, সে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছে। আসলে খালিদ এমনই ছিল।[৭৫০] রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[৭৫০] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৮২

خطاب بہ نو جوانان اسلام

মুসলিম যুবসমাজের প্রতি

ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল রহ.

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبّر بھی کیا تُو نے
وہ کیا گردُوں تھا تُو جس کا ہے اک ٹُوٹا ہوا تارا
হে মুসলিম যুবক, কখনো কি দেখেছ ভেবে,
কোন্ সে আকাশ, তুমি যার এক ঝরা তারা?

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبّت میں
کُچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرِ دارا
স্নেহ-মায়ার কোলে করেছে লালন তোমায় সেই সে জাতি,
রাজা মহারাজার মুকুটও দলেছিল পায়ে যারা।

تمدّن آفریں، خلاّقِ آئینِ جہاں داری
وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوار
যারা সভ্যতার স্রষ্টা, পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের আইনপ্রণেতা,
সেই যে আরবের মরুভূমি, উষ্ট্রারোহীদের দোলনা।

گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
کہ مُنعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا
অভাবের মাঝেও যারা ছিল খোদাপ্রেমী আর আত্মমর্যাদা এতই যে,
অভাবীর ভয়ে দানশীলেরও কিছু দেওয়ার সাহস হতো না!

غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے
جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا

কী করে বোঝাবো তোমায়, কী যে ছিল সেই মরুবাসী,
এককথায়- বিশ্বের শাসক, রক্ষক, নির্মাতা ও অধিপতি,

ا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

کہ تُو گُفتار وہ کردار، تُو ثابت وہ سیّارا

কিন্তু এ মহান পূর্বসূরিদের সঙ্গে আজ তব সেতুবন্ধন হতেই পারে না; কারণ, তুমি চেঁচাও, তারা ছিলেন কর্মঠ, তুমি থাকো ঝিমিয়ে, তারা ছিলেন ছুটন্ত,

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

ثُریّا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا

এই ছিল সেই উত্তরাধিকার, যা পেয়েছিলাম আমরা মহান পূর্বসূরিদের থেকে। হায়, তারার মেলা থেকে যেন মর্তের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলেছে আকাশ আমাদেরকে।

اہل نظر صحابہ

প্রজ্ঞাবান সাহাবায়ে কেরাম

জনাব আসর জৌনপুরী

اہل ہنر صحابہ اہل نظر صحابہ * شبہائے تیرگی میں نور سحر صحابہ

গুণের আধার সাহাবা, জ্ঞানের সাগর সাহাবা, অন্ধকার রজনীতে ভোরের আলো সাহাবা

اغیار کے مقابل سینہ سپر صحابہ * آپس میں رحمدل اور شیر و شکر صحابہ

বিজাতির মোকাবেলায় বুক পাতানো সাহাবা, পরস্পর দয়াশীল, যেন দুধে-চিনি সাহাবা

سائے میں جس کی اب تک بستے ہیں اہل ایمان * ہی گلستان حق کا ایسا شجر صحابہ

যার ছায়া-নীড়ে আজো বেঁচে আছে মু'মিন, হকের বাগিচার এমনই বৃক্ষ সাহাবা,

تب جاکے آج تک ہی بیدار نور سنت * مثل چراغ جلتے تھے عمر بھر صحابہ

তাদেরই বদৌলতে জ্বলছে আজো সুন্নতের আলো, প্রদীপের মতো সারা জীবন জ্বলতেন সাহাবা

اے کروان باطل تو کیوں بھٹک رہا ہے * ہی آسمان حق پر روشن قمر صحابہ

হে বাতিলের গোলামরা, কেন তোরা আজে বাজে বকছিস, হকের আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র হলেন সাহাবা

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদকে আল-মানহালের অনুমতিপত্র

Ref: AMP-107

Date: 10-Feb-2021

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Permission

for the publication of the Book.

Peace be upon you and Allah's mercy and blessings be upon you!

Name: Maktabatul Ettihad,
Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh.

We allow Maktabatul Ettihad, Bangladesh to publish the Bengali translation of our famous book, "Tareekh E Ummat E Muslima (4 volumes per now)" by Molana Ismail Rehan Sahib.

No person / institution other than Maktabatul Ettihad is allowed to copy or translate the contents of the said book. Otherwise Maktabatul Ettihad (NID: 151375926893) will take strict legal action.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت کتاب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بنام: مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ بازار، ڈھاکہ، بنگلہ دیش

ہم مکتبۃ الاتحاد، بنگلہ دیش کو اپنی مشہور و معروف کتاب بنام "تاریخ امت مسلمہ (چار جلدیں)" مؤلف حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب مدظلہ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

نیز مکتبۃ الاتحاد کے سوا کسی اور شخص / ادارے کو مذکورہ کتاب کے مواد کی نقل یا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بصورت دیگر مکتبۃ الاتحاد کو مجوزہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی اجازت ہے۔

والسلام

المنہل پبلشرز

کراچی، پاکستان

حامد علی کھوکھر

جنرل منیجر

المنہل پبلشرز، کراچی

92 321 2855000
92 321 3135009
92 213 4914596

St# 4 & 5, Block: 1/A,
Near Shaikh Zaid Islamic Centre,
Gulistan-e-Johar, Karachi, Pakistan.

www.almanhalpublisher.com
admin@almanhalpublisher.com
web.facebook.com/almanhal.publisher
@almanhalpublish

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

Cover : Kefayat 01712-813999